units. To regard the rights of others as being inherent in them, and not as mere compromises for the benefit of the mass-unit, is to enunciate a principle hostile to life itself.

প্রকৃতপক্ষে ক্ষতি, বলাৎকার, (পারিভাষিক অর্থে নহে) লুণ্ঠন বা শোষণ অথবা সর্ব্বোচ্ছেদে পাপ নাই—অধর্ম্ম নাই; কারণ মূলতঃ জীবন অর্থেই ত ঐ সকল ক্রিয়া বুঝায়। বাঁচিতে হইলে অন্যের ক্ষতি করিতেই হইবে, অন্যের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে, অন্যের সম্পত্তি লুণ্ঠন বা শোষণ করিয়া লইতেই হইবে,—যদি এ সকল কার্য্য করিয়াও বাঁচিয়া থাকার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, তবে তেমন ব্যাঘাতকে সমূলে উন্মূলিত করিতেই হইবে। কারণ এই সকল কার্য্য ছাড়া জীবনের পরিস্ফুরণ—সজীবতার বিকাশ, অন্য কোন পদ্ধতিক্রমে সম্ভবপর নহে। জীবতত্ত্বের দিক্ হইতে বিচার করিতে হইলে, বলিতে বাধ্য হইব যে, যে সকল অবস্থায় জীবকে অন্যের কোন অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, সে সকল অবস্থা অস্বাভাবিক বা উদ্ভট। কারণ ব্যষ্টি বা ব্যক্তির শক্তিসঞ্চয়ের বা শক্তিপ্রয়োগের যে লিপ্সা প্রকৃতিগত—মজ্জাগত, তাহা যখন ব্যাহত হয়, বা বাধা পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যাঘাত সংহতির প্রবলতর শক্তির দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে; একের প্রভাব সমষ্টির প্রভাবের দ্বারা পরাজিত বা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই হেতু শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলি বিরাট সংহতি সৃষ্টির জন্য নষ্ট করিতে হয়। সুতরাং অন্যের অধিকার, যাহা অবস্থাগতিকে বাধা বলিয়া মান্য হইয়াছে, তাহা তাহার সহজাত বা নিত্যকালের বলিয়া মনে করা ঠিক নহে, জীবতত্ত্বের অনুকূল নহে। তোমার ক্ষমতা বা অধিকারকে আপাততঃ আঁটিয়া উঠিতে পারি না বলিয়াই আপোষের হিসাবে কিছু-দিনের জন্য তাহাকে মানিয়া চলি। চিরকাল যে মানিয়া চলিব, এমন কোন কথা নাই। আমি যখন বুঝিব যে, আমি তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী

হইয়াছি, তখন তোমার অধিকার মান্য করিব না, প্রয়োজন হয় ত তোমাকে আমার অধীন করিয়া লইব। ইহাই জীবতত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত, ইহাই প্রাণী-জগতের সার সত্য। যে এই সত্য সিদ্ধান্তের অনুকূল সাধনা করিয়া শক্তিশালী হইতে পারিবে সেই বাঁচিবে, যে ইহার বিপরীত আচরণ করিবে সেই মরিবে।

নীজ্‌শ্‌ খৃষ্টান ধর্ম্মের সন্নীতিসকলকে slave-morality বা গোলামের ধর্ম্ম বলেন। ক্ষমা দুর্ব্বলতার নাম মাত্র। তিনি বলেন কার্য্যের কেবল ফলাফল দেখিয়া তাহার ভালমন্দের বিচার করিতে হয়। কার্য্যের সূচনা দেখিয়া তাহাকে পাপজ কি পুণ্যাত্মক বলা, নানা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পরে, গত দশ হাজার বৎসর সংসারে প্রচলিত হইয়াছে। ইহা জীবতত্ত্বের বিরোধী। স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহাও নিজ্‌শ্‌ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"What is Freedom ? The will to be responsible for oneself. The will to keep one's distance. The will to become indifferent to hardship, severity, privation, to life itself. The will to sacrifice men to one's cause—and oneself too. Freedom implies that the manly instincts which delight in war and victory, have domain over all other instincts—including the instinct to be "happy" * * * * The free man is a warrior ! How is freedom to be measured in individuals, as well as in nations ? By the resistance which has to be overcome, by the effort which it costs to preserve autonomy."

স্বাধীনতা কাহাকে বলে ? নিজের কাছে নিজের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার মানস-চেষ্টা ; অর্থাৎ আমি যাহা করিব তাহার জন্য অন্য কাহারও কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, এমন অবস্থা। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াস, অর্থাৎ আমি গাদার মানুষ নহি, ভেড়ার পালের একজন নহি, আমি স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্ত। কষ্ট, দুঃখ, অভাব

কাঠিন্য—এমন কি জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা; অর্থাৎ যে কষ্টে টলে না, দুঃখে বিচলিত হয় না, অভাবে অস্থির হয় না, কঠোর দুর্দ্দশায় আত্মহারা হয় না—এমন কি মৃত্যুকে সম্মুখীন দেখিলে বিভ্রান্ত হয় না, সেই স্বাধীন। যে হেলায় উদ্দেশ্যসাধন জন্য শত শত মনুষ্যকে বলিদান করিতে পারে, সেই সঙ্গে নিজের জীবনকেও বিলাইয়া দিতে পারে সেই স্বাধীন। যে পুরুষকারের সংস্কার যুদ্ধে এবং জিগীষায় উন্মেষ লাভ করে, সেই সংস্কার যখন অন্য সকল দেহগত সংস্কারের উপর প্রাধান্য লাভ করে, এমন কি সুখী হইবার—আনন্দ উপভোগের বৃত্তিকেও প্রশমিত রাখিতে পারে, সেই পুরুষকারই স্বাধীনতার দ্যোতক। স্বাধীন পুরুষ সদাই যোদ্ধা—অহরহই যুযুৎসু। ব্যক্তিবিশেষে এবং জাতিবিশেষের মধ্যে কতটা স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে তাহার যাচাই করিবে কেমন করিয়া? ব্যষ্টি এবং সমষ্টির স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য, স্বায়ত্ত শাসনের অবাধ গতি প্রশস্ত রাখিবার জন্য যে যতটা বাধা উত্তীর্ণ হইতে পারে, যে যতটা প্রয়াস প্রয়োগ করিতে পারে, সে ততটা স্বাধীন।

ইহাই স্থূলতঃ নিজ্‌শের মূল সূত্র। নিজ্‌শ্‌ জীবতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনটাই মিথ্যা নহে। কিন্তু নিজ্‌শ্‌ আত্মশক্তির কোন বিচার করেন নাই। যে সকল শক্তির দ্বারা জীবদেহের উত্তরোত্তর উন্মেষ ঘটে, নিম্নস্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, সে সকল স্থূলশক্তির আলোচনা নিজ্‌শ্‌ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থূলশক্তির অন্তরালে যে আত্মশক্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে পঙ্গুতে গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, বামনে চাঁদ ধরিতে পারে, পথের ভিখারী সম্রাট্‌ হইতে পারে, সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী আত্মাশক্তির কোন হিসাব, কোন খবর নিজ্‌শ্‌ লইতে পারেন নাই। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির হিসাব-নিকাশের অতীত আর একটা সর্ব্বব্যাপিনী ধী-বুদ্ধি-মেধা-মনীষা-প্রতিভা যে নিত্য বিরাজ করিতেছে তাহা নিজ্‌শ্‌ ধরিতে পারেন নাই। মুরারেস্তৃতীয়ঃ

পন্থা—তোমার-আমার বুদ্ধিবিবেচনার অতীত আর একটা যে তৃতীয় পন্থা আছে বা থাকিতে পারে, তাহা নিজ্‌শ্‌ ভাবিতে পারেন নাই। মানুষ ত কেবল বুদ্ধিজীবী নহে, কেবল সায়ান্সের গণ্ডীর ভিতরে মানুষের মনুষ্যত্ব মাপিয়া পাওয়া যায় না। ধী-বুদ্ধি-মেধা-মনীষা ছাড়া মানুষের আসক্তি-অনুভূতি-প্রবৃত্তি সকল আছে, মানুষের মধ্যে কত লুপ্ত, কত সম্মূঢ়শক্তি সমাহৃত রহিয়াছে। কখন্ যে কোন্‌টা ফুটিয়া উঠে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই হিসাবে নিজ্‌শ্‌ যে ফিলজফি (Philosophy) বা শক্তিবাদ রচনা করিয়াছেন, তাহা নাস্তিকের শক্তিবাদ, জড়শক্তির ফিলজফি। কিন্তু এই শক্তিবাদের উপর বর্ত্তমান ইউরোপের গতি-তত্ত্ব বা Progress প্রতিষ্ঠাপিত। /এই শক্তিবাদের প্রথম অগ্নি-পরীক্ষা ইউরোপের বর্ত্তমান অতিভীষণ মহারণে আরব্ধ হইয়াছে। মনে হয়, এই অগ্নি-পরীক্ষায় ইউরোপের গতিতত্ত্ব বা শক্তিবাদ টিকিবে না। কারণ, আমাদের পুরাণ কার্ত্ত্য-বীর্য্যার্জ্জুনের সময় হইতে, পরশুরামের উদ্ভবের কাল হইতে বৌদ্ধ-যুগ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে দেখাইয়াছেন, এবং যুগে-যুগে শক্তি-তান্ত্রিকদিগের উত্থান-পতনের ইতিহাস কথা শুনাইয়া, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্য-কশিপু, রাবণ, কংস, শিশুপাল, যাদব—কৌরবগণের নাশের সমাচার শুনাইয়া বুঝাইয়াছেন যে, এমন জড়শক্তির উন্মেষ, এমন অহমিকার বিকাশ চূর্ণ হয়ই,—একেবারে সঙ্কোচ লাভ করেই। কেবল ক্ষমতায়, কেবল ঐশ্বর্য্যে, কেবল অপরাজেয় শক্তির বাহ্বাস্ফোটে মানুষ চিরদিন তুষ্ট থাকিতে পারেনা। বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য-ক্ষমতা-বৈভব-অহমিকা-দর্প-দম্ভ ছাড়া মানুষ আরও কিছু চায়। সে পিপাসা ধন-দৌলতে মিটে না, সে পিপাসা জগৎকে লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিলে পরিতৃপ্ত হয় না, সে পিপাসা জগতের—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবীকে রাক্ষসের মত গ্রাস করিলে উপশান্ত হয় না। কেবল ইহাই নহে; বিধাতার বিধানে সে পিপাসা অব্যাহত থাকিতে পারে না। অতিক্ষুদ্রের ভিতর হইতে এমন শক্তির উদ্ভব হয় যে,

তাহার প্রভাবে পিপাসার্ত্ত প্রবল শক্তিশালীকেও ধূলায় লুটাইতে হয়। একা জামদগ্ন্য পরশুরাম একবিংশতি বার ধরাধামকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিল; জীর্ণ-শীর্ণ দধীচির অস্থি হইতে বজ্রের নির্ম্মাণ হইয়াছিল; নরবানরে রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিল;—সামান্য, ক্ষুদ্র বেলজিয়মের বীরত্বে জর্ম্মণজাতির অব্যাহত গতি ব্যাহত হইয়াছে; ক্ষুদ্র সর্বিয়া অষ্ট্রীয়াকে চূর্ণ করিয়াছে। ইতিহাসের পত্রে-পত্রে, ছত্রে-ছত্রে এই নিত্যসত্যই বিঘোষিত হইতেছে—"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং; যৎকৃপাত্মহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

আমাদের শাস্ত্র বলেন, বিশেষতঃ পুরাণ একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, জগতের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমনই জড়শক্তি সাধকের উদ্ভব হইবেই—এমনই যাদব, কৌরব, জর্ম্মণ জাতির প্রাবল্য ঘটিবেই। তখন যাহার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিব, তাহাই স্থিতি—তাহাই Conservation। কেবল ইহাই নহে; আস্তিক জাতিসকলও শক্তি ও সামর্থ্যের আস্বাদ পাইলে ধীরে ধীরে বিলাসের পঙ্কেতে ডুবিতে থাকে, তখন তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে স্থিতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মসিয়ে রেণান্ ইহুদীজাতির ইতিহাস লিখিতে যাইয়া এই স্থিতির আলোচনা ভাল রকমে করিয়াছেন। নিজ্শ্ ইহুদীদের কথায় বলিয়াছেন—

The Jews will either become the masters of Europe or lose Europe as they once lost Egypt. And it seems to be improbable that they will lose again. * * * * The Jews have hid their bravery under the cloak of submissiveness; their heroism in facing contempt surpasses that of the saints.

অর্থাৎ ইহুদীগণ হয় পরে ইউরোপের রাজা হইবে, নহিলে ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইবে, যেমন পূর্ব্বে মিশরদেশ হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মতিগতি দেখিয়া

মনে হয় যে এবার আর তাহারা হারিবে না। গত দুই হাজার বৎসরকাল তাহারা যে অপমান, যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে—স্বীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে; তাহাতে ত মনে হয় না তাহারা আর পতিত ও পদদলিত হইবে। তাহারা তাহাদের মজ্জাগত সাহস ও তেজস্বিতা আনুগত্যের ও গোলামীর আবরণে বেশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অন্যের ঘৃণা এবং উপেক্ষাকে তাহারা যেরূপ বীরত্বের সহিত সহ্য করিতে পারে, তেমন বীরত্বব্যঞ্জক সহিষ্ণুতা বুঝিবা সিদ্ধসাধকে—সাধু-সন্তে নাই।

এই সহিষ্ণুতাই স্থিতির নামান্তর। রেণান এই অপূর্ব্ব এবং অদ্বিতীয় সহিষ্ণুতার বিশ্লেষণ করিয়া স্থিতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল অবস্থাতে বাঁচিয়া থাকাই—স্বীয় বিশিষ্টতাসমেত হইয়া বাঁচিয়া থাকাই একটা বড় পুরুষকার। যে বাঁচিতে জানে সে বড় হইতেও জানে। ইহুদী বাঁচিয়া আছে, বাঁচিয়া থাকিবে, সুতরাং পরে আবার বড় হইবে। নিজ্‌শ্‌ এ সিদ্ধান্তটা অস্বীকার করেন না। তাই তিনি বলেন, মানুষ তুমি বাঁচিতে শিখ; তুমি বাঁচিয়া থাকিলে অতিমানুষের (super-man) উদ্ভব সম্ভবপর হইবে। এই জন্য তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

Man is a rope connecting animal and superman—a rope over a precipice.

The greatness of man lies in this : that he is a bridge and not a goal. The thing that can be loved in man is this : that he is a transition and an exit.

অর্থাৎ পশু এবং অতিমানুষের মধ্যে মানুষ যেন একটা দড়া—সে দড়া যেন একটা কাছাড়ের উপর টানিয়া বাঁধা আছে।

মানুষের মহত্ব ইহাতেই—সে সাঁকো মাত্র—উপায় মাত্র সিদ্ধি নহে, সাধনার ধন নহে। মানুষের মধ্যে ভালবাসিবার এইটুকুই আছে যে সে একটা বিবর্ত্তন মাত্র—একটা নিষ্ক্রমণ—পরিণতি নহে।

স্থিতি-তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, অতিমানুষ বা অবতারের সম্ভাবনায় বিচার করিতে যাইয়া, নিজ্‌শ্‌ এতদূর পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছিলেন। ইহার বাড়া কিছু বলিতে পারেন নাই। তিনি আর একপদ অগ্রসর হইলে নাস্তিকতা বর্জ্জন করিয়া আস্তিক-পরমাত্মাবাদী হইতে পারিতেন। মনে হয়, খৃষ্টান ধর্ম্মের জমীর উপর তন্ত্রোক্ত শক্তিবাদের আস্তিকতা ঠিকমত ফুটিয়া উঠে না। এই যুদ্ধে জর্ম্মণী বা জর্ম্মণ জাতি পরাজিত হইলে হয় ত বা জর্ম্মণ শক্তিবাদের মধ্যে আস্তিকতা ফুটিয়া উঠিবে। কথায় আছে শিখেছ কোথায়? না—ঠেকেছি—ঠকেছি যথায়! না ঠেকিলে, না ঠকিলে আস্তিক্য শিক্ষা মজ্জাগত হয় না। পড়া পাখীর বোল ত শিক্ষা নহে।

গতি ও স্থিতির যতদূর সম্ভব বিশদ ব্যাখ্যা বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত করিয়া দিতে আমি চেষ্টা পাইয়াছি। গতি স্থিতির বিপরীত ব্যাপার; স্থিতিও গতির বিরোধী। সুতরাং ভারতবর্ষের স্থিতির আদর্শ, ইউরোপের গতির আদর্শের পূর্ণ বিরোধী; উভয়ের মধ্যে আপোষ হয় না, একটা সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করা যায় না। কারণ আদর্শের বিরোধ থাকিলে, একপক্ষকে আদর্শ পরিহার করিতেই হইবে, নহিলে অপর পক্ষের সহিত মিশিতে-মিলিতে পারা যাইবে না। গতির চূড়ান্ত করিয়া নিজ্‌শ্‌ যে ফিলজফি বা দর্শনসূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, যাহার সাধনায় জর্ম্মণজাতি গত চল্লিশ বৎসরকাল একনিষ্ঠ হইয়া কাটাইয়াছেন, সেই গতি-তত্ত্বের ও শক্তিবাদের পরীক্ষা চলিতেছে। এ পরীক্ষার কাল শেষ না হইলে এখনও বলা যায় না কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। মনে হয় দুইটাই সত্য ও স্বাভাবিক; জাতির অবস্থাবিশেষে যেটা যখন উপযোগী হয়, তখন সেই আদর্শটাকেই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হয়। যে জাতি নূতন উঠিতেছে, নূতন ঘর-সংসার পাতাইয়া, দশজনের একজন হইয়া বসিতেছে, সে জাতির পক্ষে গতি বা Progress, development অথবা evolution উপযোগী। যে জাতির সমাজ-শরীরে প্রৌঢ়তার

ছুয়া. অ সিয়া পড়িয়াছে, সে জাতি স্বতঃএব স্থিতির দিকে অগ্রসর হইবে। কারণ, সেই জাতিই বুঝিতে পারে যে, লীলাময়া প্রকৃতির নিত্য পরিবর্ত্তনের ঘোর আবর্ত্তের মধ্যে একটা স্থিতির ভাব, একটা অপরিবর্ত্তনীয় সত্বার ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে। এইটুকু বুঝিলেই স্থিতির দিকে প্রাণ টানিবেই, অনিত্য ছাড়িয়া নিত্য পদার্থের অন্বেষণে সাধ হইবে।

তন্ত্র কিন্তু এক হিসাবে কথাটাকে ঠিক বলেন না। মানুষ অমর হইতে চাহে, নিজে না পারে পুত্রপৌত্রাদির সাহায্যে স্বীয় বিশিষ্টতাকে অমর করিয়া রাখিতে চাহে। এই লিপ্সা হইতেই স্থিতিশীলতার উদ্ভব। সুতরাং স্থিতি স্বাভাবিক এবং সকলের সেব্য। যে বালক বা উদ্ধত যুবক মরণভয় জানে না, মৃত্যুর সম্মুখীন হয় নাই, সেই গতি ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে, নিত্য নূতন রসাস্বাদনে ভরপুর থাকিতে চাহে। উহা স্বাভাবিক নহে, সহজ নহে, ক্ষণেকের উন্মত্ততা মাত্র। জীবসৃষ্টির মধ্যে স্থিতিশীলতাই প্রবল, স্থিতিই সর্ব্বব্যাপী; গতি বা উন্নতি ক্ষণেকের চটক্ মাত্র। স্থিতির পেষণে গতি টিকিতেই পারে না, গতি বা উন্নতিকে পরাজিত হইতেই হয়।

এই সকল সিদ্ধান্তের বিচার করিয়া শেষে বুঝিতে হইবে যে, আমরা ইংরেজিশিক্ষিত ভারতবাসী ভারতবর্ষের স্থিতির আদর্শকে পরিহার করিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি। এই মূল আদর্শ পরিহারের হেতু আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতার কতটা অপচিত হইয়াছে, সেজন্য আমাদের সংহতি-শক্তির হ্রাসই বা কতটুকু হইয়াছে। এই সঙ্গে ইহাও ভাবিতে হইবে যে Nation-building বা জাতিসৃষ্টি কতকটা স্বভাবের নিয়মবলে হয়। অথবা মানুষ কি স্বীয় মনীষাপ্রভাবে একটা নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে পারে? এই সকল প্রশ্নের বিচার, গোড়ায় গোটাকয়েক সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধির ন্যায় গ্রাহ্য না করিলে, সম্ভবপর নহে বলিয়াই, গতি এবং স্থিতির সম্বন্ধে এত কথা কহিতে হইল।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[৭]

মহাযান কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জ্জুনই মহাযানমত চালাইয়া দেন। তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। তিনিই পাতাল হইতে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্য্যদেব এই মত চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীনেরা বলে "আর্য্যদেব অধ্যাত্ম বিদ্যার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন"। এই দুইজনই মহাযানের আদি-গুরু। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে নাগার্জ্জুনের পূর্ব্ব হইতেই মহাযানমত চলিতেছিল। নাগার্জ্জুনের দুই পুরুষ পূর্ব্বে অশ্বঘোষ 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযানমতে ভরপুর। 'শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' তর্জ্জমা করিতে করিতে জাপানী পণ্ডিত সুজুকী বলিয়াছেন অশ্বঘোষেরও পূর্ব্বে মহাযানমত চলিত। 'লঙ্কাবতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন।

বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা, বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাৎ হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল। বারটার পর কেহ আহার করিবে না। তাহারা বলিত এক আধ ঘণ্টা পরে খাইলে দোষ কি? বুদ্ধদেব ভিক্ষু-দিগকে কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না। তাহারা বলিত সিংএর

ভিতর যদি একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কি দোষ হইতে পারে। এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু অধি-কাংশ বৌদ্ধ স্থবিরের দল হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ-দিগের মধ্যে দুইদল হইল,—স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাঙ্ঘিক। একে ত মহাসাঙ্ঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল। অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কি হইল? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশী কড়া হইতে লাগিল। দুইদলে যে আর কখনও মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজার সময়ে পাটলি-পুত্রে যে মহাসভা হয়, তাহাতে মহাসাঙ্ঘিকেরা কেহই স্থান পায় নাই। সকল বৌদ্ধেরা সে সভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে। মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানদিগের মতে সে সভার কোন অস্তিত্বই নাই। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধিকপরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ

চলিয়া যায় ও এখনও চলিতেছে। মগধ ও বাঙ্গালায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পঞ্জাবে মহাসাঙ্ঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানতঃ দুই শাখা হয়,—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুইভাগ হয়,—'সর্ব্বথবাদী' ও 'ধর্ম্মগুপ্তিক'। সর্ব্বথবাদ ক্রমে কশ্যপীয়, সংকান্তিক, ও সুত্তবাদ হইয়া যায়। 'বজ্জিপুত্তকদের চারি শাখা হয়,—'ধম্মথানীয়' 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও সম্মতীয়।

মহাসাঙ্ঘিকদিগের দুই দল হয়,—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়,—'পণ্ণত্তিবাদ', 'বাহুলিক' ও চেতিয়বাদ। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়,—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধথক', 'পূর্ব্বশেলিয়' 'অপরশেলিয়', 'বাজিরীয়'। কিন্তু কি লইয়া যে এই সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনও জানিতে পারি নাই।

এইসকল ভিন্নশাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ছিল। বিবাদ বিসম্বাদ হইলেই লোকে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেই সামবেদী সুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহারা বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তিন চারিবার বৌদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনও অনেক বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। অশোকরাজা ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের রাগ যে বেশী ছিল, তাহা

অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তাহা হইলেই বুঝা যায় স্থবিরবাদীরাই পুষ্যমিত্রের কোপে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদেরই উপর তাঁহার অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যমিত্রের রাজধানীর নিকট বাস করিতেন। মহাসাঙ্ঘিকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে পঞ্জাব প্রভৃতি যবনদিগের রাজ্যে পড়িয়াছিলেন। একে ত নানাশাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা-আপনিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,—পুষ্যমিত্রের নির্যাতনে তাহাদের দুর্ব্বলতা আরও বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাঙ্ঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য্য হইতে প্রায় দুইশত বৎসর লাগিয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাঙ্ঘিকেরা কণিষ্ক রাজার সময় জলন্দরে একটি মহাসভা করে। সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড় স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্ম্মমত স্থির করিয়া লন। অনেকে বলেন এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহারা বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কণিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই মহাযানমতের পোষক ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সভারই মহাসাঙ্ঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাঙ্ঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাঙ্ঘিকেরাও বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। মহাসাঙ্ঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাঙ্ঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক মতের পক্ষ-

পাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাঙ্ঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই,—করুণাবাদের ত নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু 'মহাসাঙ্ঘিক' হইতে মহাযানমতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিবার যো নাই, কারণ মহাসাঙ্ঘিকদিগের একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে;—সেখানি "মহাবস্তু অবদান"। বইখানিতে লেখা আছে "আর্য্য-মহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন" অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাঙ্ঘিকদিগের এই পুস্তক। এইখানি যে কি ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে ভাষায় 'ললিতবিস্তারের' অধ্যায়ের শেষের গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের' গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্ন-সঞ্চয় গাথা' লেখা, এও সেই ভাষায়। মথুরার ছোট ছোট শিলা-লেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় নাসিক, কার্লি, প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন 'গাথাভাষা'। সিনার সাহেব এ ভাষার নাম দিয়াছেন (mixed Sanskrit) মিক্সড্ সংস্কৃত। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারইজড্ সংস্কৃত (vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যান্স্ক্রি-টাইজড্ ভারনাকুলার (Sanskritized vernacular),—যেমন আমাদের পণ্ডিতী বাঙ্গলা। কাব্যাদর্শকার ভারতবর্ষে চারিভাষার উল্লেখ করিয়াছেন,—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র, কিন্তু তিনি মিশ্র-ভাষার উদাহরণ দিয়াছেন "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং"। তাঁহার এ উদা-

হরণটি ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়া সাহিত্যের উদাহরণ দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন একটি প্রাচীন কারিকায় ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় মিশ্র ভাষা চলিত না, তাই 'মিশ্রস্তু নাটকাদিকং' বলিয়া একটা যা তা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা বাস্তবিকই মিশ্রভাষা। এ ভাষায় 'বাস্তু' 'বস্তু' হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' 'কপিলবস্তু' লেখা আছে। এরূপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়া ফেলা বাঙ্গলায় বিরল নহে,—যেমন আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় 'সমভিব্যাহার' শব্দ 'সমিভ্যার' হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

মহাসাঙ্ঘিক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহা জানার এই একখানি বই আর পুস্তক নাই। কণিষ্কের সময় যে সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনও পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জ্জমা আছে। শুনিয়াছি সক্‌ডিয়ানায় মহাসাঙ্ঘিকদিগের এক শাখা চলিত,—শুনিয়াছি মধ্য এসিয়ায় মহাসাঙ্ঘিকদিগের আর এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারও কোন পুস্তক এ পর্য্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। 'মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগার্জ্জুনের পূর্ব্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। মহাবস্তু অবদানে দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও কথা আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ত্ববাদ সামান্যভাবে আছে। অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দে আছে, তোমার নিজের উদ্ধার হইলেই নিশ্চন্ত থাকিও না, পরকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার কর ইত্যাদি। এ সকলেই আমরা মহাযানমতের মূল দেখিতে পাইতেছি। লঙ্কাবতারে কথা তুলিয়াছে 'তথাগত' কি অবিনশ্বর?

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জ্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে বুদ্ধদেবের পর কোন মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি "ভগবদ্গীতা" রচনা করেন। ভগবদ্গীতার মত মহাসাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে। একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার এবং সে বাজে কথা কহার দরুণ কেহ যেন কিছু মনে না করেন।

নেপালীরা বলে ধর্ম্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম্ম দুরকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম্ম,— (১) দেবভাজু (২) গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা কর, না হয় গুরুকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুইই গুভাজু, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোন দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব? বরঞ্চ হীনযানে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে বলে, কিন্তু মহাযানে সেটুকু বড় দেখা যায় না। একজন আচার্য্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত "মহাশয়, আমার এখনও সময় হয় নাই"। কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য্য মহাশয় আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি।" আচার্য্য বলিলেন, "কিসে

এমন হইল ?” সে বলিল, “এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি।” আচার্য্য বলিলেন, “তবে ঠিকই হইয়াছে।” ইহার উপরেও কি বলিব, যে মহাযান হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য মাত্র। তবে এক কথা,—একদেশে যদি দুই তিন ধর্ম্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়। আমাদের দেখাদেখি ভদ্রঘরের মুসলমানের মেয়েরা বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি আমরাও পীরের শিরণী দিই। ফিরিঙ্গীরা কালীর কাছে মানত করে। এই মানতের দৌলতে কলিকাতার বহুবাজার ষ্ট্রীটে ফিরিঙ্গীকালীর মন্দিরে মার্ব্বেলের মেজে হইয়া গিয়াছে। এসকল গৃহস্থের মধ্যে চলিতে পারে; কিন্তু যাহারা ধর্ম্মের কর্ত্তা তাদের ভিতর এসব করিলে চলে না। তাহাদের আপন আপন ধর্ম্মের মত ঠিক মানিয়া চলিতে হয়, নহিলে গৃহস্থেরা তাহাকে মানিবে কেন ?—তাহার কথাই বা শুনিবে কেন ?

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরী আছে। যতদিন মহাসাঙ্ঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড় দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোন বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি ? আমার বোধ হয় মহাযান-ধর্ম্মের উদারতাই ইহার কারণ। জগৎ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে প্রকারই করুক্ না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বই ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদবিসম্বাদ কেন ? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা

কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন ?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাঙ্ঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত উহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি হয় নাই; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্ম্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হাসির দাম

[কথা-নাট্য]

প্রথম দৃশ্য।

[চন্দনার বাসগৃহ···পথের উপরেই রোয়াক, রোয়াকের ধারে জানালা...জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে...পথে সারি সারি লোক চলিতেছে—বৃদ্ধ বালক অপেক্ষা প্রৌঢ় ও যুবার দলই বেশী...তাহার মধ্যে কেহ কেহ সেই জানালার দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিয়াছে...কেহবা ইঙ্গিতে রহস্য করিয়া চোখ ঠারিয়া চন্দনার পানে হাসিয়া চাহিতেছে। চন্দনা দেখিতে অনিন্দ্যা সুন্দরী...কিন্তু রোগক্লিষ্টা, মুখে চোখে কালি পড়িয়া গেছে...চন্দনা কাঁদ কাঁদ মুখে জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল...বসিয়া পড়িয়া নিজের পেট টিপিয়া ধরিতে লাগিল...চন্দনা একবার করিয়া অঞ্চলকোণে চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছে, আর একবার করিয়া পথের দিকে তাকাইয়া ঠোঁটের হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। একটি ছোট ছেলে মলিন বস্ত্রপরা একটি অন্ধ বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়াছে...]

চন্দনা। (পেট টিপিতে টিপিতে) মাগো তুই কোথায় মা—মাগো... আর যে হাস্‌তে পারিনে মা—উঃ...

(অন্ধের হাত ধরিয়া বালকটি সেই জানালার ধারে আসিয়া হাত পাতিল ও চন্দনার মুখের পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল)...

বালক। বাবা...এই কাণার হাতে একটি পয়সা দাও বাবা...বাবা! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করবেন; আপনি অন্ধকে দেখ্‌লে নারায়ণ আপনাকে দেখ্‌বেন।

চন্দনা। আমার কাছে ত কিছু নেই...আমায় ত একটি পয়সাও দেয় না—(কাঁদ কাঁদ ভাবে) আমি কোথা পাব...ওহো দাঁড়াও

দাঁড়াও—সে দিন একটা পয়সা সেই কে ফেলে রেখেছিল ..আমি কুড়িয়ে গদির নীচে লুকিয়ে রেখেছিলাম... দাঁড়াও দাঁড়াও...দেখি. আমি এনে দিচ্ছি...এই নাও বাবা...

(তাড়াতাড়ি পয়সা আনিয়া বালকের হস্তে দিল...বালক সেই অন্ধের হাতে পয়সাটি দিল; অন্ধকারে স্পষ্ট করিয়া চন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না...শুধু যেন কেমন চম্‌কাইয়া উঠিল)...

বালক। জয় হোক্ রাণী মা,...জয় হোক্...

চন্দনা। এটি কি তোমার ছেলে বাবা...(অন্ধ মাথা তুলিয়া... সর্ব্বাঙ্গ নাড়িয়া...লাটিটা ঠুকিয়া—চম্‌কাইয়া কাঁপিয়া উঠিল)...

অন্ধ। আঁ এ্যাঁ...কে কে...জয় হোক্ মা জয় হোক্...

(অন্ধ ও বালক চলিয়া গেল)...

(দূরে নেপথ্যে শোনা গেল..."বাবা এই কাণার হাতে একটি পয়সা দাও বাবা...বাবা! নারায়ণ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন...আপনি এক-গুণ দিলে নারায়ণ আপনাকে দশগুণ দেবেন"—)

চন্দনা। (কাঁদিতে কাঁদিতে পেট টিপিতে লাগিল)...উঃ! বাবা, বাবা, আর যে যাতনা সইতে পারিনে মা...

[চন্দনা 'বাবা'...'বাবা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল]

(চন্দনার বাড়ীওয়ালী বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। অ গতরখাগি! আমার আড়াই শ টাকা গুণে দে...তারপর খুব কাঁদিস্—বটে আমার পয়সা বুঝি গতরের নয়—মার্‌ব মুড়ো খেংরা ..আ মর্ মুখ দেখ না যেন তোল হাঁড়ী—যেন তিনটে ঝিঁক্ উঠেছে। হাস্ বল্‌ছি হাস্...অত ক'রে শিখিয়ে দিই, চোখ ট্যার্‌ছা করে ঘুরিয়ে তাকাবি, ঠোঁটে একটু হাসি টেনে হাসি হাসি মুখ করে রাখ্‌বি। তাকাবি এম্‌নি করে যেন তাকান না বুঝতে পারে, তাকিয়েই অম্‌নি একটু হেসে চোখ ফিরিয়ে মুচ্‌কে হাস্‌বি...তা নয়, কেবলই পেট টিপ্‌ছে

...আ মর্ মার্‌ব পেটে এক লাথি ..হাস্ বল্‌ছি হাস্...আ মর্ মুখে যেন নুড়ো জ্বেলে দিয়েছে। হাস্ বল্‌ছি হাস্...

(চন্দনা জড়সড় হইয়া বুকের কাপড় একটু সরাইল, আর জোর করিয়া মুখ হাঁ করিয়া হাসিতে চেষ্টা করিল)

চন্দনা। এই যে (হাসিয়া) মা...এই যে আমি হাস্‌ছি ত...মের না মা এই আমি হাস্‌ছি...

বিরাজ। হ্যাঁ অম্‌নি করে বোস্...আজ রাত্তির দুটোই বাজুক আর চারটেই বাজুক, এখন বারটা। দশ টাকা আজ রাতে চাই ..মনে যেন থাকে...বুঝ্‌লি গতরখাগি ? নইলে আজ আর ভাত দেব না...মনে যেন থাকে আ মর্ গতরে যেন শুঁয়োপোকা ধরেছে !

(বিরজা ঝঙ্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিল...নেপথ্যে..."রাম-কিষণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিল)—"লোক এলে আমায় ডাকিস্... বুঝ্‌লি—নইলে দেখ্‌বি"...

চন্দনা। (জানালার গরাদে ধরিয়া টানিতে লাগিল)...ভেঙে বেরিয়ে যাব, ছুটে পালাব...উঃ এ লোহা যে ভাঙা যায় না গো... মা...মা...নারায়ণ ! তুমি মিথ্যে—নেই নেই...চোখ্‌খেগো সবাইকে দেখ্‌তে পাও, কেবল আমায় দেখ্‌তে পাও না... চোখ্‌খেগো আমায় গঙ্গা নাইতে নিয়ে এসে—এই চোখের মাথা খেয়ে এই গঙ্গায় নাওয়ালে...চোখ্‌খেগো, তুমি সব দেখ্‌তে পাও—তুমি ঠাকুর...কেবল আমায় পাও না—আমি কখন এখানে থাক্‌ব না (চন্দনা নিজের হাত কামড়াইতে লাগিল)। এই হাত দিয়ে হবে না...হবে না ? (আবার হাত কামড়াইতে লাগিল)।

[একটি লোক জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে অতি কুৎসিত...মুখে বসন্তের দাগ, তাহার উপরে আবার ব্রণ ঠেলিয়া উঠিয়াছে...চক্ষু মদ্যপানে রক্তবর্ণ—মাথার চুলগুলো পোড়া কোঁক-

ড়ান, মুখে বর্ম্মা চুরুট ..কর্কশ স্বরে কাশিতেছে]...চন্দনাকে দেখিয়া —বাঃ বাঃ পরীজান ওঃ কেয়া সুরৎ—আরে মেরা জানি—কি মেয়ে-মানুষ! বলি—বলি ক্যা সুরৎ (চন্দনা তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল —জানালা হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল)।

চন্দনা। না আমি পার্‌ব না, আমার অসুখ কর্‌ছে।

লোক। অসুখ কি চাঁদ...অমন টুক্‌টুকে, দুধে আল্‌তায় ধোয়া... তায়

চন্দনা। না আমি পার্‌ব না।

লোক। খুব পার্‌বে মাণিক মাইরি, কি ঠোঁট মাইরি, মাইরি, বুকের কাপড়টা একটু সরাও না, উঃ! মাইরি মাইরি...

(চন্দনা বুকের কাপড় টানিয়া আরো জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল)

চন্দনা। না যাও...যাও...আমি পার্‌ব না।

লোক। আরে শোন্—একটা টাকা দেব, লে শোন্—মদ খাবি?— এই ছ্যাখ্,—বিলিতী—বিলিতী—ধেন নয়—প্যাঁজ চচ্চড়ী আর ধেনো খেয়ে মরিস্, আজ বিলিতী খাবি এখন...

চন্দনা। না-না যাও, আমার অসুখ কর্‌ছে—

লোক। আলবৎ পার্‌বে...জান্‌লায় দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন, টাকা নেবে...পার্‌বে না কি—চল্,...শালি...চল্...(লোকটা হাতের লাঠি দিয়া চন্দনার বুকের কাপড় খোঁচা দিয়া সরাইয়া দিল—চন্দনা—'মাগো' বলিয়া চাৎকার করিয়া উঠিল...আর সেই লোকটার গায়ে থুথু দিল)।

লোক। তবে রে হারামজাদি (লোকটা লাঠি তুলিয়া মারিতে গেল— লাঠিটা জানালার গরাদে লাগিয়া তাহারই কপালে ফিরিয়া আঘাত করিল...লোকটা আরো রাগিয়া উঠিল...এমন সময় বাড়ীওয়ালী বিরজার প্রবেশ)...

বিরজা। কি হয়েছে, কি হয়েছে...

লোক। আমার গায়ে থুথু দিয়েছে—হারামজাদি, আমি আজ মেরেই

ফেল্‌ব...পার্‌বিনি কি . টাকা দেব...মেরেই ফেল্‌ব...গায়ে থুথু দিয়েছে।

বিরজা। থুথু কি ইচ্ছে করে দিয়েছে বাছা, অসাবধানে গায়ে পড়ে গেছে বাবু—আ মর্ হতচ্ছাড়ি চোখের মাথা খেয়েছিস্...আহা আমি জল এনে দিচ্ছি.. কত টাকা দেবে?—কুড়ি টাকা দেবে ত বল...

চন্দনা। (স্বগতঃ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া) কখন না—আমি আঁচ্‌ড়ে ছিঁড়ে খাব।

লোক। কুড়ি নয়, দশ টাকা দেব...

চন্দনা। দশে হবে না—অমন সোন্দর—তায় হুঁ অমন ডব্‌কা কাঁচা .. না বাপু...কুড়ির কম হবে না...

লোক। আচ্ছা পনের টাকা দেব।

বিরজা। যাক্ আপনার কথাও থাক্ আমার কথাও থাক্, ষোল টাকা দিন্—আসুন...

লোক। এই নাও (টাকা দেওন)। ষোল টাকা নিলে—আচ্ছা...

বিরজা। (টাকা আঁচলে গেরো দিতে দিতে) আসুন,—আপনার দিল মস্ত হ'য়ে যাবে...একেবারে নতুন...(লোকটা ঘরের মধ্যে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল) বস্‌রাই গুল্ দেখুন দেখি...(চন্দনার মুখ ধরিয়া আদরছলে দেখাইল)।

বিরজা। ওমা—আপনি—রামরাখালবাবু—আগে বল্‌তে হয় ছাই—আপনি বাড়ীর ভেতর আগে এলেই পার্‌তেন। দেখুন দেখি—ছিঃ ছিঃ একি কষ্ট বাছা, ছ্যা ছ্যা কি ঘেন্না...এ ত ঘরের কথা...আহা! এ ত ঘরের কথা গা...

রাম। দেখ্‌ছিলুম তোমার পোষা মেনীর ঝাঁজ কত...ওঃ একেবারে ফ্যাঁস্—তা দেখ বিরজা, একটু ঝাঁঝাল মেয়েমানুষ আমি ভালবাসি—ডুবার ফড়্‌কে দূরে সরে না গেলে রস জমে না ...জান ত'...একটু ঝাল না হলে তরকারী মজে না...

বিরজা। তা যা বলেছেন, আমি ত আর আজকের নই...কত রকমই দেখ্‌লুম আপনার ..

রাম। আচ্ছা কোথা থেকে এ আমদানী কর্‌লে...

বিরজা। ঘাটাল—ঘাটাল...আর বলেন কেন, মানুষের দুঃখ দেখ্‌তে পারি নে। কি করি এসে পড়্‌ল আছে, দুঃখ কষ্ট পাবে, তাই দেখ্‌তে হয়—এই দুধরে, ছানারে, মিহিদানারে—সিঁদুর পড়ারে—যাতে স্বস্তি হয়—যাতে ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে, দু'পয়সা হয়, দু'খানা পরে এই নিয়েই আছি, আর কি করি ...হরি তুমিই সার...আর এমনি করে যে কটা দিন যায় —ভাব্‌ছি বামুনবোষ্টম দু'চারজন, আর ভাগবৎ সেবা দেব, কি বলেন ? তা গোবিন্দের কৃপা সকলি, তিনি করাচ্ছেন... গোবিন্দ হে !

(রামরাখাল মদের বোতল খুলিয়া গেলাসে ঢালিয়া বিরজাকে দিতে গেল—)

রাম। হয়ে যাক্ পেসাদী—আর কি ?

বিরজা। রাম রাম ! সেসব দিন আর নেই—তায় হায় রে ! আজ আবার হরির তলায় লুট দিতে হবে...না মাপ্ কর্‌বেন, —এই যে আয়্‌না লো, বোস্‌, রামরাখালবাবুর মত দেল খোলসা ইয়ার আর দুটি নেই। আয় লো, বোস্‌, লজ্জা কি—(রামরাখালের প্রতি) নতুন কি না, এইসবে দুটো হপ্তা হয়েছে—হ্যাঁ (হাসিয়া) একেবারে তাজা...ফোটা। ...বাবুর নজর খুব উঁচু...

রাম। কি পরীজান এস, টুক্‌টুকে ঠোঁটে একবার গেলাসটা ছুঁয়ে দাও . হো-হো এস।

চম্পা। কখন না, আমি আঁচড়ে ছিঁড়ে খাব—কখন না—সরে যাও বল্‌ছি...যাও।

বিরজা। কি হারামজাদি পার্‌বি নি কি ? থেংরে সিধে কর্‌ব না—

তোর ভাগ্যি ভাল যে রামরাখালবাবুর তোর ওপর নজর পড়েছে...উনি কি একটা হেঁজি পেঁজি লোক ?

চন্দনা। আমার সাম্‌নে এসোনা বল্‌ছি—আমি কামড়ে ছিঁড়ে দেব ..

বিরজা। তবে রে ..দাঁড়ান্ ত একটু সরে মশায়, আপনি ভাল হয়ে গদির উপরে উঠে বসুন দিকি, আমি ওকে ঢিট কর্‌ছি —এখনি সোজা কর্‌ব এখন—

(বিরজা খেংরা হাতে করিয়া চন্দনাকে মারিতে গেল—রামরাখাল চন্দনার হাত ধরিল—)

চন্দনা। আমি কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে দেব—সরে যাও, সরে যাও,—ছেড়ে দাও——

(চন্দনা রামরাখালবাবুর হাতে কামড় দিল—বিরাজের গালের কাছে কামড় দিল—তাহারাও চীৎকার করিয়া তাহাকে মারিতে লাগিল—)

বিরজা। তবে রে হারামজাদি...

চন্দনা। ওগো কে আছ আমায় রক্ষে কর গো—ওগো কে আছ গো .

বিরজা। হারামজাদি ! তুই ঢাট্ হবি নি...দেখি তোর কোন্ বাবা রক্ষে করে...

রাম। হাহা-হাহা (সজোরে হাসিতেছিল)

(অকস্মাৎ পথ হইতে একটি যুবক বেগে প্রবেশ করিয়া রামরাখালের পৃষ্ঠে ও মুখে মুষ্টাঘাত করিল। রামরাখাল ‘বাপ্‌রে’ বলিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল—বিরজাকে এক ধাক্কা দিল, বিরজা ছিঠ্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। লোক’টি চন্দনাকে বুকে করিয়া তুলিয়া বিছানায় শয়ন করাইল—চন্দনা তখন হাঁফাইতেছে—)

চন্দনা। এ্যাঁ...এ্যাঁ...কে তুমি ! আমায় বাঁচাও—কে তুমি, আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও !...

বিরজা। কে মশায় ; আপনি কেমনতর নোক্ ? ভারি ভদ্দর ত

দেখ্‌ছি—আমার টাকা মাটি কর্‌তে এয়েছেন, জানেন না ও বড় বেয়াড়া মেয়েমানুষ...

লোক। কত টাকা তোমার মাটি হয়েছে বাপু...মার্‌ছ কেন আহা!

বিরজা। ত্রিশ টাকা—দেবেন?

লোক। এই নাও (টাকা দেওন), তোমরা একে এমন করে মার্‌ছ কেন, আহা!

রাম। তবে আমার ষোল টাকা ফিরিয়ে দাও।

বিরজা। আপনি ত ঘরে বিছানায় বসেছিলেন, মদ খেলেন আপনার সঙ্গে বসে দুটো কথা ক'য়েছি—আচ্ছা পাঁচটাকা কম নিয়ে যান্‌। কাল একটু সকালে আস্‌বেন, আমি সব ঠিক করে রেখে দেব রামরাখাল বাবু...

রাম। (লোকটার প্রতি তাকাইতে তাকাইতে) আচ্ছা শালা তুম্‌ রহো—

(রামরাখালের প্রস্থান)

বিরজা। কি করি মশায়, কাল সকালে আমার বাড়ী ভাড়া দিতেই হবে। আমার ত আর জমিদারী নেই। একটা ছেলেও নেই যে রোজগার করে এনে খাওয়াবে—দেখুন ও মেয়েটি,—আমার চয়না, বড় ভাল মেয়ে, মাঝে মাঝে কেবল গোলমাল করে—ওই দোষ। আপ্‌নি বসুন না। নে বাপু হ্যাঁ সে লোকটা ত গেছে—এ বাবু খুব ভদ্দর—দেখুন লোকটা বড় গুণ্ডা তাই ডরাতে হয়, কি করি বলুন?—মেয়েমানুষ...পাঁচজন নিয়ে কারবার...ভয় ডর কর্‌তে হয় বৈ কি?

(বিরজা প্রস্থান করিতে করিতে পিছন ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল)

বিরজা। কে জানে বাপু...দেখ্‌তে যেন আকাশের চাঁদ—উঃ মাইরি—কি রঙ্‌রে—ছুঁড়ী এখন আর কথাটি কয় না। রূপের

মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে ইচ্ছে করে। (স্বগতঃ) কে জানে কেমনতর লোক—সদরে চাবি দিই।

(বিরজার প্রস্থান)

চন্নুনা। তুমি কি নারায়ণ! ঠাকুর! তবে তুমি সত্যি শুনতে পাও—তাই এয়েছ বল...আমি বড় দুঃখী ঠাকুর! ঠাকুর!

লোক। (কাঁদিয়া ফেলিল) এখন একটু সুস্থ হয়েছ

চন্নুনা। এ্যাঁ...হ্যাঁ...তুমি আগে কে বল...নারায়ণ নও—বল ঠাকুর আমার সঙ্গে ছলনা কর না—আমি যে বড় দুঃখী, বল বল, আমায় মারবে না এখানে ত কেউ 'আহা' করে না...

লোক। সত্যি বলছি আমি মানুষ—নারায়ণ নই, তুমি অমন করছ কেন?...

চন্নুনা। তুমি ছলনা কর না—আমি দুঃখী ছেলে-মানুষ, আমার সবে এই সতের বছর বয়স, আমার সঙ্গে ছলনা কর না।

লোক। সত্যি বলছি চন্নুনা, আমার নাম মন্মথ...আমি মানুষ...

চন্নুনা। না না, তুমি নারায়ণ, তুমি আমার দুঃখ শুনেছ, তাই ত ছুটে এসেছ। আমার দুঃখের হরি কাঙালের ঠাকুর—আমার সঙ্গে ছলনা কর না।

মন্মথ। চন্নুনা সত্যিই বলছি আমি মানুষ, আমার রক্ত মাংসের শরীর।

চন্নুনা। তুমি মানুষ, তুমি মানুষ? অ্যাঁ! তবে কি করে আমার দুঃখ বুঝতে পারলে?

মন্মথ। মানুষ বলেই ত তোমার দুঃখ বুঝতে পেরেছি।

চন্নুনা। মানুষে কি আমার দুঃখ বুঝতে পারে—না না তুমি ঠাকুর, তুমি ত মানুষ নও, মানুষে ত আমার দুঃখ বুঝে না...আমি যে মানুষ—মানুষের দুঃখ ত মানুষে বোঝে না...

মন্মথ। না চন্নুনা সত্যিই আমি মানুষ...

চন্নুনা। তুমি মানুষ? তুমি আমার কাছে হাসি চাইবে না?—বল

আমি যে আর হাস্‌তে পারিনে, তুমি...আমি একটু তবে কাঁদি তুমি কিছু বল্‌বে না, তোমার পায়ের উপর মুখখানি রেখে একটু কাঁদি, তুমি হাসি চাইবে না ত' ?

মন্মথ। না আমি হাসি চাইব না...কাঁদ অভাগিনী খুব কাঁদ (স্বগতঃ—পথের পানে চাহিয়া)—মন কেন উদ্ভ্রান্ত হও, এ ত সে নয়, সে নয়, কেন উন্মত্ত হ'চ্চ ? সেই রূপ, সেই আঁখি সেই স্বর, হায় অভাগিনী ! কেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল ! (মন্মথ কাঁদিয়া ফেলিল)।

চন্ননা। ওকি তুমি আমার দুঃখে কাঁদ্‌ছ ! আমার দুঃখে ত কেউ কাঁদে না, সবাই হাসে...সবাই হাসি চায় আর বলে 'হাস্‌' ...আমার দুঃখের ডাক্‌ কি এতদিন পরে তোমার ওখানে পৌঁছল, এতদিন তবে কোথায় ছিলে—আজ তবে কেন কাঁদ্‌ছ, কেঁদনা আমি হাস্‌ব, আমি হাস্‌ছি, তোমার পায়ে পড়ি কেঁদনা, এই আমি হাস্‌ছি... (চন্ননা হাসিতে চেষ্টা করিল) আর আমি কাঁদ্‌ব না। তোমায় যে এত কাছে পাব সে আশা ত আমার কখন স্বপ্নেও আসে নি...আমার দুঃখও যে ভাববার জন্যে আছে, কাঁদে, এ কথা ত আর কখন মনে হয় নি...এতদিন তবে কেন ভুলে ছিলে ঠাকুর ?

মন্মথ। কেন চন্ননা, কেন, আমায় 'ঠাকুর, ঠাকুর' বল্‌ছ ?...

চন্ননা। তবে কি বল্‌ব বল, তুমিই শিখিয়ে দাও কি বলতে হয়, তুমিই তবে বলিয়ে দাও।

মন্মথ। তবে যা ইচ্ছে, আমার নাম ধরে ডাক্‌তে পার।

চন্ননা। তবে অ্যাঁ—মন্‌-মথ মন্‌...মন্‌...মোনা...মোনা বলি, তুমি মোনা না ?—বাঃ...তুমি মোনা, বাঃ তুমি মোনা...তুমি ঠাকুর নয় মানুষ বাঃ...বাঃ...

মন্মথ। হ্যাঁ আমি মোনা, এখন বল...

চন্ননা। কি বল্‌ব, না দেখ, তুমি আমায় গঙ্গা নাইয়ে, বাড়ী দিয়ে

আসবে—উঃ! না বাড়ীতে ত আর আমায় নেবেনা...আর ওই বাড়ীওয়ালী যেতে দেবে কেন...কি করব তুমি বল...

মন্মথ। দেখ চন্দনা আমি যাই এখন (স্বগতঃ) না, বলব না সে কথা বলব না, সে ত এ নয়।

চন্দনা। কেন, তুমি আর আসবে না? আসবে...হ্যাঁ আসবে... আমাকে যে এরা আবার তেমনি করবে...না না, তুমি যেয়ো...না...না ছিঃ তুমি এখানে থাকতে যাবে কেন? লোকে কি বলবে?—কেন লোকে কি বলবে...না যদি বলে...না-না তুমি এসনা...না-না-না লোকে বলুক, তুমি আসবে। লোকে জানলে মেয়েমানুষেরই ক্ষতি, পুরুষের ত কিছু নয়। তাদের কি...তুমি আসবে না?...পুরুষের কি?

মন্মথ। দেখ আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে...এখন আমি চল্লুম, আমার মাথা কেমন করছে...আমার মাথার ভেতর যেন আগুন জ্বলছে।

চন্দনা। তুমি আবার আসবে? না তুমি আসবে ..না—এখানে কেউ দু'বার আসতে পায় না—ওকি তুমি অমন করছ কেন... তোমার...তোমার...

মন্মথ। (কি বলিতে গিয়া ভয়ে দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইয়া রাগে দুঃখে কম্পিতস্বরে) না-না কিছু হয়নি, কিছু হয়নি... ওঃ তিন বছর পরে কেন তোমার সঙ্গে এমন অবস্থায় এখানে দেখা হল...না না, ভ্রম ভ্রম,...তুমিও ভুল, আমিও ভুল...

(মন্মথ ছুটিয়া ঘর হইতে প্রস্থান করিল...)

(চন্দনা অবাক হইয়া মন্মথের পথের পানে চাহিয়া রহিল...তাহার পর দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ—গ্যাস নিভাইয়া দিয়াছে—ভোরের হাওয়া চলিয়াছে—একজন বৈষ্ণব নাম গান করিতে করিতে চলিয়াছে...

"হরি পতিতজন পাবনম্ অধম জনং
(ওহে) তারণম্ দেহি মে শ্রীপাদপদ্মে"...

চন্দনা। হে অনাথ নাথ...দীনবন্ধু...শ্রীপাদপদ্মে এ হতভাগীকে স্থান দাও...কিন্তু উঃ...মোনা—মোনা...

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশ ঘোর করিয়া আসিতেছে...কালবৈশাখীর সময়—ধূসর পাটল মেঘের উপর কাল ঘোর নীলাভ মেঘ হু হু শব্দে ঝড়ের বেগে উঠিয়া আসিতেছে...মন্মথ তাহার ঘরের মধ্যে বেড়াইতেছে—মন্মথের হাতে একখানি ফটো...মন্মথ উন্মত্তের মত একবার করিয়া সেই ছবির পানে চাহিতেছে আর এক হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া শূন্যে ছুঁড়িতেছে...একবার করিয়া সেই চিত্র চুম্বন করিতেছে, একবার করিয়া ঊর্দ্ধে বাহিরের আকাশপানে চাহিয়া বেদনাপরিপ্লুত যাতনায় কাঁদিয়া উঠিতেছে...]

মন্মথ। ছবি! ছবি! তুই জীবন্ত হয়ে বল্ সে নয়...সে নয়... ছবি তুই মুর্ত্তি নিয়ে প্রাণ নিয়ে রক্তমাংসের ভিতর দিয়ে আমার প্রাণের ভাষায় এসে কথা ক'—বল্ সে নয়। উহু সুভা! সুভা! তুমি বেশ্যা...পথের লোকের কাছে তোমার এই দুর্দ্দশা—না-না এ হতেই পারে না...তোমার উদ্ধার চাই...ছবি! কথা কও, জীবন্ত হয়ে বল্, নইলে গুঁড়িয়ে ফেল্‌ব। বল্ তুই সুভা কি না, বল্...বল্...বল্?...তুই সুভা বল্...(চিত্রকে চুম্বন করিল)...বল্...কিন্তু না কি ভুল তুমি ত সুভা নয়, এটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তবু মনকে বোঝাতে পাচ্ছিনি কেন...আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মানুষের সর্ব্বাঙ্গই ঠিক আর একজনের মত হয়, কে জানে আমায় যে অবাক্ করে দিলে! সেই নয় কি...যাকে আজ এত বছর ধরে মনে মনে গড়ে তুল্‌ছি, এত বছর ধরে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বনে বনে খুঁজেছি—সে কি এই না...তার কথার ভাবও এম্‌নি, তার গলার স্বর ত

এম্‌নি...সেই যেন মনে পড়ে। এম্‌নি তার চোখ ঢলুঢলু, তারও নাক অম্‌নি বাঁশীর মত, তারও ঠোঁট অম্‌নি পলার মত, তারও কটী অম্‌নি ক্ষীণ, তার পায়ের চেটোও অম্‌নি পাতা, অম্‌নি পায়ের নখও লাল, অম্‌নি তাকানি, আমায় সে পাগল করে দিলে, আমায় সে পাগল করে দিলে... উঃ আমি কি কর্‌ব! ওঃ সুভা! সুভা! তুমি কেন এমন হলে, ওঃ সুভা, সুভা, সুভা,...যাই একবার দেখা করে আসিগে, না না সে বেশ্যা—সে তার সেই বরাঙ্গ-বিক্রয় কর্‌ছে, ইচ্ছা করে কি কেউ বেশ্যা হয়—না যাব না, যাব না, উঃ অসহ্য ...অসহ্য...প্রাণ স্থির হও...না না সে বেশ্যা হয়ে গেছে...ইচ্ছা করে কি কেউ দেহ বিক্রয় করে? —না, কিন্তু কার দোষ? সে আমার নয় কি, আমারি দোষ, আমারি দোষ, না—সমাজের...সমাজ-ধর্ম্মে মন বলি দিতে হয়...সমাজ-ধর্ম্মে মানুষ-ধর্ম্মে গোল বেধেছে...সুভা! সুভা! সে আমারি দোষ, আমি তোমায় ত্যাগ করেছি, তাই তুমি বেশ্যা হয়ে পথে দাঁড়িয়ে...না-না কখন নয়, ও ত সুভা নয়, সুভা নয়, মন, উঃ যদি সুভা হয় (নিজের বক্ষে সজোরে আঘাত করিল)—না, যদি সুভা হয় গুলি কর্‌ব—না— বুকের ভিতর থেকে হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে উপড়ে শকুনিকে ফেলে দেব, যেন মাটিতে সে বুকের রক্ত একটি ফোঁটাও না পড়ে—না-না উঃ (বক্ষে সজোরে আঘাত করিল)। কোথা যাব...না না তাকে উদ্ধার কর্‌তেই হবে, সে যে রুগ্না, সে যে ক্লিষ্টা—সে যে বেঁচে মরে আছে...না তাকে উদ্ধার কর্‌তেই হবে—সে যে অপূর্ণ—তাকে পূর্ণ কর্‌তেই হবে. যাব সুভাকে দেখ্‌ব, সুভাকে দেখ্‌ব, দেখব, দেখ্‌ব। আমার শাস্তি আমি বহন কর্‌ব...না যাব না, না যাব—ওঃ সুভা (বক্ষে সজোরে আঘাত করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল

আর সেই ফটোখানা কুড়াইয়া লইয়া মেঘের অস্পষ্ট আলোকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল—তাহার পর)—না-না এ ত সেই! যাব না—না সে নয়, তারি মত বুঝি, কিন্তু আমি যে তার মোনা, আমি যে তার ঠাকুর, আমি যে তার দেবতা...আমি যে তার নিয়তি...তাকে গড়ে তুল্‌তেই হবে, সে অপূর্ণকে পূর্ণ কর্‌তেই হবে, সেই ত মানুষের ধর্ম্ম, ফোটানই ত কাজ, সেই মানুষের ধর্ম্ম...সমাজধর্ম্মে তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি, মানুষধর্ম্মে তাকে হাতে ধরে তুল্‌ব, যাব—যাব—সুভা...সুভা...না সুভা নয়, চন্দনা—তবু ত সে নারী—আমি পুরুষ, নারীকে পুরুষ রক্ষা কর্‌বে না...তবে সুভা সুভা! যাব, সুভাকে দেখ্‌ব, তারি মানে যে আমার সুভা রয়েছে—যাব সুভা! সুভা!

(বাহিরে তখন ভীষণ জোরে মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল—ঝড়ও গর্জ্জিয়া উঠিয়া বৃক্ষশীর্ষে তুমুল ঝাপ্‌টা মারিতে লাগিল—গাছের ডাল মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। দম্‌কা হাওয়ার ঝাপটে কতকগুলা কাক ধাক্কা খাইয়া উড়িতে উড়িতে পড়িয়া যাইতেছে...মুষলধারে বৃষ্টি—তাহার সঙ্গে শিলাপাত হইতে লাগিল। অন্ধকার যেন অন্ধকারের উপর রোল করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে...মন্মথ সেই ফটোখানা হাতে তুলিয়া ধরিয়া অন্ধকারে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে...মাঝে মাঝে যেই বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে আর গৃহের ভিতর চপলার সেই চঞ্চল আলোর দীপ্তি হাসিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে সেই ছবির পানে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে...)

মন্মথ। এই সেই ওঃ ওঃ এই সেই ..

(মন্মথ সেই ছবিখানা হাতের মধ্যে গুঁড়াইয়া ফেলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, দেখিল পশ্চাতে কড়্ কড়্ করিয়া বজ্র পড়িল, তারপর অন্ধকার ঘন ঘোর!)

তৃতীয় দৃশ্য।

[চন্দনার গৃহের সম্মুখস্থ পথ...রাজপথ জলে জলময়...বৃষ্টি পড়িতেছে। গ্যাসের লণ্ঠনগুলা বৃষ্টির জলের ধারায় অস্পষ্টভাবে আলো দিতেছে...কোন কোন স্থানে গ্যাস নিভিয়া গেছে...চন্দনার বাড়ীর সম্মুখে রোয়াক ডুবাইয়া জল দাঁড়াইয়াছে...চন্দনা সেই সময় জানালার ধারে তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া কপোলের উপর ধারা বহিয়া পড়িতেছে। চন্দনা একবার করিয়া চক্ষু মুছিতেছে আবার চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না...]

চন্দনা। আমার কান্নায় কি সমস্ত আকাশও আজ কাঁদ্‌ছ...তোমরা এতদিন পরে আমার কান্নায় কাঁদ্‌ছ তাই এত জল, চোখের জলে আমি আলো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—চোখের জলে আকাশের তারাও নিভে গেছে...ঠাকুর! তুমি যে আস্‌বে বলে চলে গেলে...তবে আর এলে না কেন? তুমি যখন আসনি তখন সেই বাড়ীর কথা, মা'র কথা, বাবার কথা মনে পড়্‌ত, এখন আবার একি নতুন! একবার করে মন সেই পুরোণ কথা ভাবে আবার নতুনের মুখের পানে চাইতে হয়, এ ত বড় জ্বালা—তিন দিন কি করে এমন করে রইলে বল, কোথায় তুমি, আমি যে আর পারিনে, এস, এস, ওগো এস, আমার যে আর প্রাণ বাঁচে না। এস, এস, আর আমি কাঁদ্‌ব না, আর চোখের জল ত ফেল্‌ব না, তুমি এস...আমি এবার থেকে খুব হাস্‌ব, হাসিতে তোমায় ভরিয়ে দেব, হাসি মাখিয়ে দেব...এস আমার প্রাণের ঠাকুর, আমার জীবনের সর্ব্বস্ব একবার ফিরে এস, আমি যে তোমার জন্যে জেগে কেঁদে তিন দিন তিন রাত কাটালাম...এ আমার আবার নতুন কি হল...বাড়ীর কথাও ভুলে

যাচ্ছি, কেবল মোনা...মোনা...মোনা...এস আমার প্রাণের ঠাকুর! এ আবার আমার নতুন কি হল? তুমি যাবার পর আর বাড়ীওয়ালী আমাকে কিছু বলে নি, বরং আদর করেছে; আবার ঝাঁটা না মারলে কি তুমি ফিরে আসবে না? কই তুমি, এ জীবনে এ কি নতুন ডাক দিলে, আমায় যে পথের পানে টেনে নিয়ে চলেছ—এ আবার কার ডাক্ তোমার...তুমি আমায় কি করে গেলে বলে যাও, একবার এসে বলে যাও, তুমি ঠাকুর নয় মানুষ আজ বুঝতে পারছি...তাই তুমি আর এলে না আমার দুঃখও বুঝলে না ..কি করি কোথায় যাই...আর যে পারিনে। মোনা...মোনা...নারায়ণ! নারায়ণ! আর যে নারায়ণ বলে ডাকতে সাধ হচ্ছে না...মোনা মোনা...

(তখন বৃষ্টি একটু কমিয়াছে, রাস্তার জল ঠেলিতে ঠেলিতে... চেরাক-বাতি হাতে মুস্কিলাসান ফকির অগ্রসর হইল...মুসলমানের মত গোঁফ ছাঁটা লম্বা দাড়ি তালি দেওয়া লুঙি পরা—)

মুস্কিলা। ইয়া পীর মৌলা মুস্কিলাসান...ইয়া পীর (সুর খুব উচ্চ পর্দায় তুলিয়া) ইয়া পীর...মৌলা মুস্কিল আসান—যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান...

চন্দনা। আজ কদিন ধরে এই মুস্কিলাসানটা এখানে ঘোরে কেন কই এই তিন দিনই আমার নতুন মুস্কিল জুটেছে তার ত আসানের কোন উপায় নেই...আমারই জানালার কাছে ঘোরে কেন? ভাল মুস্কিল ..ও ফকির বাবা এই দিকে এস—এই নাও...

মুস্কিল। পীর সাহেবের দোয়া দিব মা ঠাকরেণ...ছেলেপিলে সব ভাল রাখেন...ইয়া পীর...(একটু অগ্রসর হইয়া, স্বগতঃ)—এই জলে কাদায় কার মুস্কিল আমার মত কাঁদে চেপেছে বাবা...না হায় রে পয়সা...তোর লোভে পড়ে ত...জেলে

তিন তিনবার ঘুরে এলুম.. শেষ হিঁদুর ছেলে কলমা পড়ে ফতিমার নাকের বেসর পীরিতের ধোঁকায় মারলুম, এখন এই মুস্কিলাসান সেজে চেরাকবাতি হাতে নিয়ে ঘট্টে বাট্টে বারাণ্ডার কাপড়খানা চোপড়খানা যা হোক সরান যেত, এ বাবা আবার নতুন লোভে লোভে কোথায় গিয়ে পড়লুম...শালার ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, চেরাকবাতি নিয়ে মুস্কিলাসান করে বেড়াচ্ছি—এদিকে যে বাবা সাত শ মুস্কিল কাছায় বাঁধা, কাছা খুলেও তাকে ফেল্‌তে পারি নি...না কই লোকটা ত আজও দেখা দিলে না, ছুঁড়ে ত অম্‌নি দাঁড়িয়েই থাকে...এ তিন তিন দিন কেটে গেল বাবা, আর ত এ মুস্কিলাসানী চলে না...শেষটা কি হরতু-কীর লাঠির ঠ্যালায়...জ্যান্ত কলমা পড়া ভোলাবে? ওহো ফতিমা রে...না শালী কোথায় সট্‌কেছে রে সেই অবধি সট্‌কেছে...ফতিমার পিরীতও এই পয়সার ঠেলায়, বাবা সে ঠেলার নাম বাবাজী এখন ঠেলায় পড়ে বাবাজী পীরবক্স মুস্কিলাসান ..কিন্তু এ মুস্কিলাসানীতে আর চল্‌ছে না, এখন কিছু খুঁজে নিতে হবে...ইয়া পীর মৌলা মুস্কিলাসান ..(পুনরায় ফিরিয়া জানালার ধার দিয়া যাইতে যাইতে) জয়নাল ফকিরে বলে পানি মেলে না...ইয়াপীর মৌলানা...(উচ্চৈস্বরে)...মুস্কিলে আসান করুণ গো .. ওই যে জল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে কে আসছে না সেই ত, সেই না, যা থাকে কপালে বাবা টাকা বড় চিজ্‌ বাবা এই টাকার জন্যে শালার শ্বশুর বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে গেল মাগের কোল থেকে...ইয়া পীর মৌলা মুস্কিলাসান ..ইজ্জৎ গেল।

চন্দনা। আচ্ছা ও লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবে রোজ? ...লোকটাকে দেখলেই কেমন ভয় করে...ওকি

ওখানে...মুস্কিলাসান যদি তবে রোজ ওইখানে দাঁড়ায় কেন...

মুস্কিল। ইয়া পীর...ইয়া পীর...চলে এস বাবা চলে এস, আজ তোমায় ঠিক নেব—জয়নাল ফকিরে বলে পানি মেলে না ...চলে আয়, আয়, চলে আয়...বেঁচে থাক্ আমার রামরাখালবাবু আজ ঠিক দুপয়সা কামাব...ওই যে এসে পড়্‌ল (জল ঠেলিতে ঠেলিতে মন্মথের প্রবেশ) বেঁচে থাক্ আমার রামরাখালবাবু...

মন্মথ। ওই যে সুভা...সুভা নয় সুভার ছায়া···সুভার কায়া...ওই ত সেই...না না ওযে দুঃখী...ওর দুঃখ মোচন করতেই হবে...সুভা। সুভা! রূপ...রূপ...ওঃ!

মুস্কিল। ইয়া পীর...(চেরাক নিভাইয়া, চাপা গলায়) ইয়া পীর... ইয়া পীর...তাগ শির্ ইয়া পীর...ইয়া পীর...ওঃ কি খাপ-সুরৎ ..অমন হলে কত ফতিমা উঃ ..উহুঁ মাইরি ইয়া পীর ..

চন্দনা। (মন্মথকে দেখিতে পাইয়া উল্লাসে হাত বাড়াইয়া) এসেছ ...এসেছ...

(মন্মথ যেমন সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে গেল, মুস্কিলাসান পিছন হইতে সজোরে এক লাঠি মারিল...মন্মথ মুখ থুব্‌ড়াইয়া সেই চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল।)

চন্দনা। ওগো কি হল গো (বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, আর মুস্কিলাসান "ইয়া পীর" "ইয়া পীর" করিতে করিতে দূরে গিয়া চেরাক জ্বালিয়া এক একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দ্রুত চলিয়া গেল।)

(চন্দনা মন্মথকে কোন রকমে তুলিয়া বুকে করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঘরের মধ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে টানিয়া তুলিল...দেখিল মন্মথের কাঁধ খানিকটা কাটিয়া ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে...ডানদিকের কাঁধ থেঁতো হইয়া গেছে)...

চন্দনা। হে ঠাকুর! হে ঠাকুর! একি কর্‌লে...ওমা একি কর্‌লে আঃ অ মোনা। অ মোনা! তুমি কেন এলে...ওমা আমি কি করব...মোনা, মোনা, মোনা...

(পার্শ্বের বাড়ীর দ্বিতলে তখন কলকণ্ঠে গান উঠিতেছিল...সারেঙের মধুর স্বরে স্বর মিশাইয়া নর্ত্তকী গান গাইতেছিল ..

ছাড় ছলা, তোমার ও পায়ে ধরি বলনা,
কেন জানাতে এসে প্রেম, কর ফিরে ছলনা—
আমি ত হেসেছি, হেসে ফেলেছি
কি ভুলে এ বিজনে কি মালা গেঁথেছি—
নিভে যে বাতি, আঁধার রাতি
প্রাণ নিয়ে এ খেলা যে চলে না গো চলে না
ছাড় ছলা, তোমার ও পাযে ধরি বলনা,
কেন জানাতে এসে প্রেম, কর ফিরে ছলনা।

—চন্দনা শীতল জলে সেই ক্ষত ধৌত করিতে লাগিল ও কাঁদিতে লাগিল)

চতুর্থ দৃশ্য।

[চন্দনার ঘর...শয্যায় মন্মথ শায়িত...কাঁধের ক্ষত বাঁধা রহিয়াছে। গৃহকোণে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে, ঘরের দেয়ালে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, সেই আযনায় ল্যাম্পের আলোর ছায়া পড়িয়াছে তাহার উপর একটা উইচিঙ্‌ড়ে লাফাইয়া উঠিয়া বসিতেছে, দূরে একটা টিক্‌টিকী সেই উইচিঙ্‌ড়েকে খাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। চন্দনার আলুলায়িত কুন্তলরাশি খাটের উপর ও মাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ...চন্দনা কাঁদিতেছিল...আর মন্মথের পায়ের বুড় আঙুলের ডগায় ধীরে ধীরে চুম্বন করিতেছিল...]

চন্দনা। চার দিন চার রাত ত কেটে যায় (চন্দনা আবার পায়ের বুড় আঙুলের ডগায় অধর ছোঁয়াইতে লাগিল।)

মন্মথ। (নিদ্রা হইতে চক্ষু খুলিয়া) সুভা! সুভা! সুভা!

(চন্দনা কান খাড়া করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল...)

মন্মথ। সুভা! সুভা!

চন্দনা। সুভা? সুভা কে?

মন্মথ। সুভা কাছে এস তোমায় দেখি!

চন্দনা। (কাছে গিয়া) কাকে ডাক্‌ছ, সুভা কে?

মন্মথ। সুভা কে জান না, সুভা যে তুমি...নিজেকে ভুলে যাচ্ছ।

চন্দনা। তোমার কথা কিছু বুঝতে পার্‌ছি নি।

মন্মথ। তুমি যে সুভা, সুভা নও, তুমি নিজেকে চিন্‌তে পাচ্ছ না —তুমি নিজেকে ভুলে গেছ...তুমি যে আমার সুভা... আমার সুভা...

চন্দনা। (অবাক হইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে) মোনা মোনা...সুভা, আমি সুভা কি...মোনা মোনা...

(বাড়ীওয়ালী বিরজার প্রবেশ)

বিরজা। (নেপথ্যে কাশিয়া—স্বগতঃ) রাধা গোবিন্দ। আঃ বেটীর সোন্দর মুখ্‌রে...দুটোই সমান...এইবারই মজালে দেখ্‌ছি... (প্রকাশ্যে) কিগো দরের মেয়েমানুষ, মুখোমুখী করে খুব যে পীরিত হচ্ছে...বাঃ খুব পীরিত জমাচ্ছ...এদিকে কি করে পেট চল্‌বে তার কি বল্‌তে পার? দে দে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দে...রাজভোগে আছ বুঝ্‌বে কেমন করে...কে জানে বাপু কোথাকার রাস্তার হুজ্জুত আমার ঘরে কেন? হ্যাঁ, গতর না খাটালে কেউ একমুঠো ভিক্ষেও দেয় না। (মন্মথের দিকে চাহিয়া) ওমা জেগে যে লো...আহা বাপু দেখদিকিনি কোথাকার বিপদ...হ্যাঁগা ভালমানুষের ছেলে দেখদিকিনি আজ একটু ভাল আছ বাবা...আহা চন্দনার আমার চার দিন আহার নিদ্রে বন্ধ, মা মা ঘুম পর্য্যন্ত নেই...কি করে যে সেই দুর্য্যোগের রাত কেটেছে সে

মধুসূদন জানেন...আর কি কইব বাবা ভাগ্যিস্ চন্ননা তখন দাঁড়িয়েছিল...

মন্মথ। আপনারাই আমায় বাঁচিয়েছেন...

বিরজা। ও কথাটি বলনি বাছা...গোবিন্দ, গোবিন্দ...হরি .মধুসূদন... তবে কিনা আমরা উপলক্ষ্য বটে, তা বাবা মনে রেখ আর কি এই কটা দিন যে কি করেই কেটেছে...আর বাবা সেই রাতে বৃষ্টির সময় ঝড়ের মত কোন আবাগে অলপ্পেয়ে মড়া নিমতলার ঘাটে থাক্—বুকশূল হোক. ফিরে যেন সে যমের কোলজোড়া পো হয়ে চুলিতে শুয়ে থাক্, বাবা তুমি ত বেঁচে গেছ, এই আমার চন্ননার ভাগ্যি, নইলে কি হ'ত বাবা .. (কাঁদ কাঁদ স্বরে) বাবা তোমার জন্যে রোজ ঠাকুরতলায় সন্ধ্যা জ্বালি, বলি হরি ! আমি সাত সিকের হরির লুট দেব, মা চিত্তেশ্বরী করুক, আহা বাছারে আজ এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে বাবা ! এই চার দিনে সোয়া শ টাকা বেরিয়ে গেছে বাবা...কি করি তোমার বাড়ী জানিনে ঘর জানিনে, রাস্তায় ত আর ফেলে দিতে পারিনে...মানুষের চামড়া ত বটে ...তারপর ঐ চন্ননার কান্না, কি করি এই অষুধরে, বিষুধরে, ডাক্তাররে, বদ্দিরে, গরম জলরে...ইস্যের ব্যাগরে...কি করি ভদ্দর লোকের ছেলে শেষ মারা যাবে...তারপর ওই মেয়ের কান্না দেখ্‌তে পারিনে...হাতে গড়ে মানুষ করেছি...আর আজ এই চার দিনে প্রায় পঞ্চাশটা টাকা ক্ষতি করে এই কি করি বল...আমি বাপু কেমন পরের দুঃখ সইতে পারিনে, ভাবি আহা আমার কাছে এসেছে, খাগ্ মাক্ স্বচ্ছন্দে গায়ে ফুঁদিয়ে বেড়াক্...রাধাগোবিন্দ...আহা বাবা...

মন্মথ। দেখ, আমার ওই জামার ভেতর টাকা ছিল...

বিরজা। কই...কই...কই...অ্যাঁ...আগে বল্‌তে হয়, হায় ! হায় ! আগে বল্‌তে হয় !

চন্দনা। কে বল্‌বে মা...তুমি ত বেশ—

বিরজা। তাই ত বল্‌ছি, তাই ত বল্‌ছি মা, তাই ত বল্‌ছি...এই যে রয়েছে। (নোটগুলা গণিয়া) ওমা এ যে আড়াই শ টাকা... আ পোড়াকপালী, তুই একবার দেখিস্‌ও নি। যদি খোয়া যেত বাছা...ছিঃ ছিঃ আমি ভাল করে সাম্‌লে রাখিগে তবে...

চন্দনা। অ্যাঁ আড়াই শ টাকা চন্দনার দাম...মোনা...

বিরজা। বাবা একটু গরম দুধ দেব, আহা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছ বাবা...আহা বাছা রে, আমি সব গুছিয়ে সাম্‌লে রাখ্‌ব...বাবা একটু বেরাণ্ডি আনিয়ে দেব...হ্যাঁ বাবা···আহা বাছা রে...

(বিরজা প্রস্থান করিতে করিতে সেই নোটের তাড়া নাড়িতে নাড়িতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল ও পিছন দিকে ফিরিয়া স্বগতঃ... "হুঁ ছোঁড়াটা ত খুব লট্‌পটে... কিন্তু ছুঁড়েড্‌ও যেন হাতছাড়া না হয়" বলিয়া চলিয়া গেল)।

(চন্দনা দুই হাতে মন্মথের পা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর তুলিয়া আবার পায়ের আঙুলের ডগায় চুম্বন করিল)

চন্দনা। মোনা...মোনা ··(চন্দনা কাঁদিয়া ফেলিল আবার হাসিল) না আর কাঁদ্‌ব না, আর কাঁদ্‌ব না, এইবার আমি খুব হাস্‌ব।

মন্মথ। ওকি কি কর্‌ছ, আমার মাথা কেমন করছে—মাথার ভেতর আগুন জ্বল্‌ছে...সুভা, সুভা!

চন্দনা। তুমি আমায় অমন করে সুভা সুভা বলে ডাক্‌ছ কেন... সুভা তোমার কে?

মন্মথ। ঠিক বলেছ, সুভা আমার কে, কেউ নয়—কেউ কি...কি জানি, দেখ সব মনে পড়্‌ছে। দেখ বল তুমি মনে কিছু কর্‌বে না বল···

চন্দনা। অমন কর্‌ছ কেন, তোমার মনে যেন কষ্ট হচ্চে, আমায় বল্‌বে না?...

মন্মথ। বল্‌ব, বল্‌ব, মনে করে বল্‌ব, মন দিয়ে বল্‌ব, মন ভুলে

নিয়ে বল্‌ব—মনের ভুলকে মনের চাবুকেই ক্ষত বিক্ষত করব। কিন্তু তুমি ত সুভা নও—তুমি কি...

চন্দনা। (দুঃখ ও অভিমানের সুরে) আমি কি তোমার কেউ ? আমায় বল্‌বে কেন বল...

মন্মথ। তুমি আমার কেউ কিনা তা জানি না...যা কখনও কাকেও বলিনি—তা তোমাকে বল্‌তে এসেছি, তুমি আমার কেউ নও ··তবু তোমার ওই মূর্ত্তিই আমার সব। তুমিই আমার সুঁভা, বল তুমি আমার সুভা হবে, সত্যি করে বল তুমি আমার সুভা...বল বল, না না শোন আমার ভুল হয়ে গেছে ..না না সে ভুল বিধাতার, নইলে এমন হবে কেন··· তুমি কেন আমার সুভা হলে না ? ওঃ তুমি কেন আমার সুভা হলে ?

চন্দনা। তুমি কি বল্‌ছ, সুভা সুভা...আমি ত সুভা নই ! বল ত তোমার সুভা হই...কিন্তু আমায় এরা চন্দনা বলে—আমি সুভাও নই, চন্দনাও নই। আমি বর্ণবালা !

মন্মথ। নও তা বুঝেছি—নও তা জেনেছি ..কেবল তাই শান্তি—তাই আবার জ্বালা, তাই তৃপ্তি, তাই আবার যন্ত্রণা ..তাই মনে করেছি—তাই ভুলতে চাইছি...উঃ কি করে হবে সব ভুল—বল্‌তে পার,—ওঃ তাই শান্তি, তাই জ্বালা, দেখ আমি উন্মাদ, তুমি মনে কিছু কর না।

চন্দনা। আমি আর কি মনে করব...মনে করাকরি কি...আমার আমার আমার ত বল্‌বার মনে কর্‌বার কিছু নেই—কই আমিও সব ভুল্‌তে চাইছি (চন্দনা আবার মন্মথর পায়ের বুড় আঙুলের ডগায় আবার চুম্বন করিল)।

মন্মথ। (শিহরিয়া উঠিয়া) কি কর, কি কর...সব ভুল সব ভুল—

চন্দনা। ভুল নয় প্রভু ! এখন তোমার সুভার গল্প বল। আমি তোমার সুভা হব।

মন্মথ। সে অনেক দিনের কথা...আজ সাত বছর হ'য়ে গেল...এই সাত বছর অহর্নিশি পলে পলে মরে মরে মরে আছি। কেন তা বুঝাতে পারব না...সে আমার ..আমার সে হারিয়ে গেছে...ছেলেবেলা থেকে দুজনে বড় ভালবাসতুম . ঘুম থেকে উঠেই দুজনে দুজনকে দেখতাম্ আর হাস্তাম, আমি অঙ্ক কস্তাম, সে হিজিবিজি কাট্‌ত, আমি ছবি আঁক্‌তাম, সে ছবি চুমু খেয়ে ছিঁড়ে ফেল্‌ত, সে মালা গাঁথ্‌ত, আমি মালা ছিঁড়ে দিতাম—আমি সাঁতার কাট্‌তাম, সে হাঁসের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ত···এমনি করে...তারপর মা বল্‌লে 'গরিবের ঘরে আমি ছেলের বিয়ে দিতে দেব না'...আমার আর একটি বন্ধুর সঙ্গে তার বিয়ে হয় ..সুভা ফুলশয্যার রাতে কোথায় পালিয়ে গেল ..তারপর জীবনটা ওলট পালট হয়ে গেছে ..পাহাড় পর্ব্বত গুঁড়া হয়ে গেছে, সুভার দেখা মিলিল না, স্বপনের দেশে কত কল্পনার রঙের তুলিতে তাকে গড়ে এঁকে তুল্‌তাম, সব স্বপ্নভাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার দেশে উবে যেত—তবু তার দেখা পেলাম না, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলালাম, আঁখির পথ থেকে সে স্বপ্নের ছবি নড়্‌তে চাইলে না ..অকস্মাৎ সেই রাত্রে তোমার ওপর যখন সেই অত্যাচার হয়, তখন সেই গলার স্বর মনে করে ছুটে এলাম—এসে দেখ্‌লাম—সেই ত...সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই সব, সেই সুর, সেই হাসি, সেই রূপ—মাথা কেমন হয়ে গেল.. দেহের রূপে মন এমনি পাগল হয় উঃ···সুভা, সুভা, না না, তারপর বুঝ্‌লাম সে নয়...এ ভুল...ভুল মিষ্টি লাগল, আবার ভুল বুকের উপর হাতুড়ির সজোর আঘাত দিলে। শুন্‌লে আমার সুভার কথা ? এখন তোমার কথা বল...এখন তাই ভাবছি—এখন তাই ভাবছি কেন তুমি সুভা

হলেনা...আবার ভাবি কেন তুমি আমার সুভা হলে ?

চন্দনা। আমার সে অনেক দিনের কথা, বল্‌লে কার'ত মিষ্টি লাগ্‌বে না...আমার নাম বর্ণবালা, আমারও মা বাপ ভাই বোন সবই ছিল—বিয়ে হল, বিধবা হলুম, বিয়েই বা কি বিধবাই বা কি তাও জান্‌লুম না—বাপের আদুরে মেয়ে খেলে খেলে বেড়াতাম—একাদশীর দিন উপবাস করে না থাক্‌লে পাপ হয় বলে খেতে দিত না—বাবা কাঁদ্‌ত—খেত না—অ্যাঁ খেলে পাপ হয় ? তা হবে...মা আমায় দেখ্‌ত আর চোখের জল মুছ্‌ত, আমি ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকাতুম্‌, বুঝ্‌তুম না...আমাকে যে ঝী মানুষ করেছিল, সে রাক্ষুসি, আমি তাকে বড়-মা বল্‌তুম্‌—সে গঙ্গা নাইতে এসে আমায় এখানে বেচে যায় এই বিরজার কাছে, এখানে আমাকে মেরে ভাঙ খাইয়ে, জোর করে মদ খাইয়ে আমার সব নিয়েছে...(নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল)। আজ তিন বছর হয়ে গেল আমি ঘুমুইনি...পেটের ভিতর কি হয়েছে -সেটা ঠেলে ঠেলে ওঠে, আমার ভয়ানক যাতনা হয়, কেউ শোনেনা কেউ শুন্‌তে চায় না—প্রাণ বেরিয়ে যায় তবু বিরজার টাকার কিনারা কর্‌তে পারলাম না। আমি এখানে এলে তারপর অনেকদিন বাদে আমার দেশের একটা লোক এসেছিল, সে বল্‌লে আমার মা কলেরায় মরে গেছে, আমার ছোট ভাইটি গেছে, আমাদের বাড়ী ঘর দোর সমস্ত দামোদরের বানে ধুয়ে পুঁছে মুছে গেছে, বাবা কেঁদে কেঁদে কাণা হয়ে গেছে ..শুনেছি কলিকাতায় আছে, ভিক্ষা করে খায় ; আমার বাবার বাড়ীর অত মান সম্ভ্রম সব আমারই এই পাপে গেছে ..দামোদর সবাইকে নিলে—আমায় ত নিতে পার্‌লে না...তা ঠাকুর ! না না

মোনা আমার এ কি পাপ আমি কেবল মর্‌তে পারি নে—সেই টুকুই পাপ বুঝি...না হলে আমার এতে কি সুখ বল—আমি ত জ্বলে জ্বলে পুড়ে মর্‌ছি, আচ্ছা তুমি আমায় গঙ্গায় নাইয়ে আন্‌বে ? গঙ্গায় নাইলে কোটী জন্মের পাপ কেটে যায়...আচ্ছা আমি ত এখন তোমার সুভা... আমিও তোমাকে তোমার সুভার মত ভালবাস্‌ব, তুমি আমায়, আমায়, আমায় দেখাবে ? সেই কুচ্‌কুচে কাল জলে তালগাছের কালো ছায়া পড়ে, দীঘীর পাড়ে হাওয়ায় জল চল্‌কে ওঠে, তাই আবার দেখ্‌তে সাধ হয়—আর এ কেরাসিন আর গ্যাসের আলো ভাল লাগে না তুমি তুমি আমার আমায়...মোনা ! মোনা ! তুমি যে সত্যি ভালবেসে ফেলেছ... তুমি দূরে সরে যেয়ো না ··আমি তোমারি আমি তোমারি...তোমার বুকে ফুলের মত রাখ থাক্‌ব—না হয় কাঁটার মত নরকের আগুনে ফেলে দাও জনম ভোরই পুড়্‌ব...

(চন্দনা মুখ তুলিয়া মন্মথের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, তাহার অধরে হাসি, চোখে জল...মন্মথ দুই হাতে চন্দনার মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া চুম্বন করিতে গেল...চন্দনা হাসিয়া ফেলিল, শিহরিয়া উঠিল, তাহার চক্ষে জল আসিল .)

মন্মথ। (চন্দনাকে ঠেলিয়া দূরে সরিয়া গেল) না...না...না ..এত তার খোসা, এত তার খোলস, সে নয়, সে নয়...ওঃ সুভা সুভা...সুভা ..এ যে আমার মৃত্যুতুল্য...এর চেয়ে আমার মরণ যে ভাল ছিল...না না সুভা...সুভা...

চন্দনা। মোনা...মোনা...মোনা...আমি তোমার সুভা...মোনা... মোনা...মোনা...কই আমায় গঙ্গায় নাইয়ে নিয়ে যাবে না ...না...না...আর নয়...আমার সব তীর্থ গয়া গঙ্গা বারাণসী তোমার ওই টুকটুকে পায়ে···মোনা আমি কখন যা পাইনি

আজ তাই যে পেয়েছি...যা পেয়েছি তাতে আমার সব দিক যেন ভরে উঠ্ছে...কেমন যেন কি...যেই রাতে আমার মুখের পানে চাইলে, সে চোখের তাকানি আর কারো চোখে কখন দেখিনি—আমি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠ্লুম ...আমার জীবনটা ত এই আরম্ভ হয়েছিল...তবে তাকে নিভাচ্ছ কেন? সেই রাত্তিরে যেন আমার ভোর হয়েছিল...আচ্ছা রাত্তিরের সেই অন্ধকার সকালবেলার ফুল দিয়ে হাসান যায় না? দেখ আমার প্রাণের ভেতর একটা লুকানো কথা ছিল—সেই লুকানো কথাটা আমিও জান্তাম না—সেই লুকানো কথাটাই কিন্তু সব চেয়ে সাত্যি। সে সত্যিটাও তুমি নিয়ে গেলে ভাল...ঠাকুর! না-না-মোনা মোনা না-না আমায় মর্তে দাও, মর্তে? না—সেই স্বর্গের সুখ এনে দাও, তুমি যে আমায় বড় ভালবাস...আমি যে তোমায়...আমি তোমার সুভা নই...সুভা...বল বল আমার সব এখন হারায় নি যদিও হারিয়ে গেছে···তবে আর আমাকে এই অন্ধকারে রেখো না...প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠ্ছে...বেঁধে রেখো না,—সে পুরাণ জীবনটা যা আমার বলে মনে হ'ত সেটা... সেটা যেন আর নেই, তার ভেতর একে আর জড়িয়ে রেখ না...মোনা! হোক্ অন্ধকার, হোক্ দুঃখ, হোক্ কষ্ট, হোক্ যন্ত্রণা, হোক্ পেটের ভাতের জন্য এমন করে দেহটা বেচা, তবু আমায় আজ এগিয়ে যেতে দাও—আমার হাত ধর, অন্ধকারে কাণার মত হাঁত্ড়ে মর্ছি—এগিয়ে যেতে দাও... রোজ সন্ধ্যের পর অন্ধকার আসে, যাতনা বাড়ে—একদিন সন্ধ্যের পর আলোর দেশে যাব—হাত ধর এগিয়ে যেতে দাও...

মন্মথ। সর···সর...সরে যাও...না না তুমি বেশ্যা, না না তুমি নয়, তুমি সুভা নয়...সর সর।

চন্দনা। ঠিক বলেছ...সে আমি নয়...দেখ বাঃ বেশ বলেছ মোনা মোনা আর জলের ঢেউ চোখে উথ্‌লে উঠ্‌বে না। এখন আমি খুব হাস্‌তে পারি...হাস্‌ব...যত খুসি হাসি দিতে পারি...আমার হাসির দাম আড়াই শ টাকা...সে ত দেওয়া হয়ে গেছে. এ হাসি এখন তোমার...হাসিও সরিয়ে নেব।

মন্মথ। না না সর...সর...দেখ, না সরে যাও...আমিও তোমার... না না তোমার হাসি চাইনি...দাম দিয়ে কেনা জিনিসের আদর দামের সঙ্গেই মিটে যায়...

চন্দনা। ঠিক বলেছ তবে...ঠিক বলেছ...ঝাড় লণ্ঠন, আরশী, পালঙ, ফুলদানীর মত বিরজা আমায়ও ঘর সাজাবার জন্যে কিনে এনেছিল, ঠিক বলেছ, কেনা জিনিস চেনা যায়—খুব চেনা যায়...দেখ, না না...

নেওয়া দেওয়ার দাম মিটেছে, তবু তোমায় একটা জিনিস দিলাম নিয়ে যাও সে আমার এই পাঁজরা ঢাকা বুকের ভেতরের ধড়ফড়ানি নয়, নিজের সঙ্গে ঝগড়া করে রাত্তিরে যখন জেগে কাঁদি সে কান্না নয়, বুকচেপে বুকফাটা নিশ্বেস নয়, মনের ভেতরে যে জড়িয়ে ধ'রে শপথ দিব্যি করি তা নয়, আমি যে গালে মুখে চাপ্‌ড়ে মরি তা নয়, মনের ভেতর কত তেষ্টা পায় তাও নয়—একলা পড়ে লোক-দের ঠেলে কান্না নয়—কামড়ানি নয়—হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত দিয়ে যে হাঁপিয়ে উঠি গলার স্বর বেরোয় না তাও নয়, শুধু আমার এই কেনা বেচার শুখনো এই নেঙড়ান মড়ার মত হাসিটা...

মন্মথ। তবে আমি চল্লুম...

চন্দনা। যাবে...হাসি কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছ কিন্তু যাতে হাসি ছিল তাকে ফেলে দিলে, হাসিই চায় হাসি, যাতে থাকে তা বুঝি চায় না...যাবে আচ্ছা এস...কতদূরে যাবে সে কতদূর দাঁড়াও, সব হাসি তবে তোমার কাপড়ের খুঁটে গেরো দিয়ে বেঁধে

নিয়ে যাও, তবে আর কি নিয়েছ ? নাও...কি ? আঃ আমার হাসির দাম বিরক্তা পেয়েছে...তুমি কিনেছ আর আমি আঃ .. আমি কেনা বেচা বেশ শিখেছি, ফুলের বাজ্‌রা ওজন ধরে দরে বিকিয়েছি...হাসির দাম আছে, তবে হাসির দাম আছে···তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে, ধর্ম্মের দোরে আমার মত মেয়েমানুষের কি কোন দাবী নেই...শুধু এই কেনাই লাভ, তবে নারায়ণ এ দেহ দিলে কেন ? এ দেহের মধ্যে প্রাণ দিলে কেন···যদি যাবে তবে ঘা মেরে জাগালে কেন ? উঃ যাবে ? চলে যাবে তারপর কি ভগবান ? সে কই ? (চন্দনা বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল... তাহার পর জোরে নিশ্বাস ফেলিল .)

(তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেছে...পার্শ্বের বাড়ীর দ্বিতল কক্ষে সারেঙের সঙ্গে গান হইতেছিল—

এস হে প্রাণ এ পরাণ রতন
কি ভুলে গাঁথি মালা বেড়িছে ও চরণ
কি দুঃখ দিয়েছি
কি সুখ কিনেছি
যতনে অযতনে রতন চিনেছি
রাখিব গোপনে মরমে মরম যেন।—

—মন্মথ অনেক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া, তার চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতে লাগিল ; মন্মথ ধীরে অন্ধকারে নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল ।)

চন্দনা। চলে গেলে ? আর ওই যে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে... এক...দুই তিন...

(নেপথ্যে সেই বালক ও অন্ধ বৃদ্ধ চীৎকার করিতেছিল— 'বাবা এই কাণার হাতে একটি পয়সা দিয়ে যাও বাবা'—বালক ও অন্ধের প্রবেশ)

বালক। ওগো এই কাণার হাতে একটি পয়সা দিয়ে যাও বাবা, বাবা নারায়ণ তোমার মঙ্গল করবেন— আপনি অন্ধকে দেখলে নারায়ণ আপনাকে দেখবেন।

চন্দনা। সেই কি অ্যাঁ আমার আমার...আমার কি—বাবা এদিকে এস...বাবা বাবা!

অন্ধ। (উন্মত্তের মত হস্ত প্রসারণ করিয়া) কই...কই—কই— সেই—সেই—কই—বর্ণমালা বর্ণা—মা— মা—কই— কই— আর যে চোখে...চোখে দেখতে পাইনে, কানে শুনি— আর যে চোখে দেখে চিনে নিতে পারি নে—বর্ণ! বর্ণ! বর্ণ! বর্ণ!—একবার যদি দেখতে পেতুম, কাছে আয় ত দেখি হুঁ হুঁ—

চন্দনা। এই যে বাবা! বাবা! এই যে আমি—এই যে তোমার বর্ণ—এই যে বাবা।

অন্ধ। আয়! আয়! আয়! মা আমার বুকে আয়—মা মা মা আমার বুকে আয়—

(চন্দনা বাহিরে আসিয়া রোয়াক হইতে ঝাঁপাইয়া অন্ধ বৃদ্ধের বুকের উপর পড়িল ..অন্ধ দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—)

চন্দনা। বাবা ..বাবা...

অন্ধ। (উন্মত্তের মত অট্ট হাসি হাসিয়া) হাহা হাহা হাহা... পেয়েছি ..পেয়েছি...এইবার রাক্ষুসি (চন্দনার গলা টিপিয়া ধরিয়া) রাক্ষুসি.. তুই তোর মাকে খেয়েছিস্, কুল খেয়ে মাকে খেয়েছিস্ ভাইকে খেয়েছিস্...আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেছি...তোর সেই একটা পয়সা না জেনে বাতাশা কিনে ভিজিয়ে খেয়েছি...তখনই গলায় বাদ্‌ছিল তবু খেয়েছি, আমার গলা তখন শুখিয়ে যায়নি কেন ..মান গেছে, ঘর গেছে, সব গেছে, চোখ গেছে...তবু...তবু...শুধু তোকে

তোকে এমনি করে (চন্নার গলা আরো সজোরে টিপিয়া ধরিল)

চন্না। বাবা আমি ইচ্ছে করে এ করিনি বাবা...

অন্ধ। চুপ্ চুপ্ রাক্কুসি রাক্কুসি! ইচ্ছে কি

চন্না। উঃ বাবা ..বাবা...মো...না (চন্না চক্ষু উল্টাইয়া কাঁপিয়া উঠিল)

বালক। কি করছ ..বাবা কি করছ...মরে যাবে ও বাবা ..মরে যাবে...ওযে দিদি...ঘাড়টা যে ভেঙে গেল...

অন্ধ। চুপ্...চুপ্...আমি গড়েছিলুম, আমি ভাঙ্ছি—চুপ আমারই গড়া আমারি ভাঙা চুপ্...হাহা . হাহা...এইবার...এইবার

চন্না। অস্ফুট স্বরে...মো...না...(শেষ সজোরে) মো...না...

(চন্না মরিয়া গেল—নেপথ্য হইতে 'যাই যাই' বলিতে বলিতে বেগে মন্মথর প্রবেশ—)

মন্মথ। সে যেন আমায় ডাক্‌লে...সে যেন আমায় ডাক্‌লে, আকাশ যেন ফেটে গেল...বুড়ো বুড়ো...কি কর্‌লি কি কর্‌লি... চন্নন...চন্নন...

(বৃদ্ধ চন্নাকে বুকে করিয়া বসিয়া পড়িল...একটা নিশ্বাস ফেলিল...চন্নার মস্তকে চুম্বন দিল ..বৃদ্ধ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল...)

অন্ধ বৃদ্ধ। কে তুমি দেখ ত...আমি কাণা, চোখ নেই, ভাগ্যটাকে আর দেখ্‌তে হয় না ভালই...শুধু শব্দ শুনি ··এ ঠিক মরেছে কি না দেখ ত...কুলের ভুল বেশ মুছে দিয়েছি...মরেছে... (চন্নার বুকে মাথা রাখিয়া) আঃ প্রাণটা জুড়িয়ে গেল... আঃ এখন যেন বুকটা টিপ টিপ্ করছে না...না মরেছে মরে গেছে...(বৃদ্ধ জোরে হাঁপাইয়া নিশ্বাস ফেলিইয়া মরিয়া গেল)

(তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গেছে...ঠাকুরবাড়ীতে নহবতে

কানাড়া রাগিণীতে বাঁশী বাজিতে বাজিতে হঠাৎ থামিয়া খ্যাঁৎ করিয়া উঠিল...বাজনা থামিয়া গেল।)

বালক। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বর্ণী দিদি! বর্ণী দিদি! আমি যে তোর ধম্ম-ভাই, আমায় নিয়ে যা আমি যে তোর ধম্ম-ভাই!

মন্মথ। চন্নন, কোন পূর্ব্ব জন্মের ঋণ ছিল...চন্নন...চন্নন আমার চন্নন আমি ঠাকুর তুমি মানুষ...তুমি মানুষ হয়ে আমায় ফেলে গেলে...কোথায় আলো, কোথায় আলো আমায় এ অন্ধকার রচে দিয়ে গেলে কেন আলো! আলো! কার ভুল চন্নন কার ভুল চন্নন আমার চন্নন...চন্নন আমার চন্নন না না তুমি...হাস্‌বারও নেই মানুষ, মুখ সেট্‌কাবারও নেই মানুষ...চন্নন আমার চন্নন, আমায় কি ফেলে দিয়ে গেলে? কি হাসি কিনলাম চন্নন!...আমার জন্যে কি রচে গেলে ...সবাই আসে সৃষ্টি করতে ..আমার জন্যে তবে কি সৃষ্টি করে গেলে...শুধু স্মৃতি . কার স্মৃতি...যে দান করলে বুঝি তার...তাই ত...তাই ত...এই তোমার সবটা হাসি আমার কাপড়ে গেরো বাঁধা, তাই দিয়ে কি সৃষ্টি কর্‌ব? সব যে মিশিয়ে গেল...ভগবানের পায়ের শব্দর সঙ্গে তোমার বুকের শব্দও মিলিয়ে গেল...

(দূরে পথে একটা বাউল গান গাইতে গাইতে চলিয়াছে...তাহার মাথায় ও গায়ে ফুল পরা, ফুলের মালা মাথায় জড়ান...দূর হইতে মন্মথ সেই গান শুনিতেছিল—)

বাউল। —(গাহিতেছিল—)

ওরে মন তোর দিশা পেলাম না
তুই কখন হাসিস্ কখন কাঁদিস্
নিজেই জানিস্ না...(মরি হায় হায় রে)

দিলের মাঝে বসে আছে
পাখী প্রাণারাম…
ওরে কেউ জানে না বরণ কেমন,
কি যে সে তার নাম
কখন আলো কখন আঁধার
তারি হাসির দোলনা…(মরি হায় হায় রে)

মন্মথ। চন্নন্ আমার চন্নন্ (মন্মথের চক্ষু ছাপাইয়া জল কপোল বহিয়া পড়িতে লাগিল। তখন সেই গান চলিতেছিল—)

রূপের পানে চেয়ে ও মন,
ফেলিস চোখের জল,
রূপসাগরে ডুবলে তখন
শুখিয়ে যাবে জল
তোর হাসি কান্না হীরে পান্না
রূপের বায়না রবে না…(মরি হায় হায় রে)
ফুল দিয়ে সব মালা গেঁথে
পৈরেছিস গলে
ওরে জনম ভোরে ভুলে ধরে
চলেছিস ভুলে,
তোর পথের ধূলায় মন যে মরে
(ভোলা—ও ভোলা মন) তুই চেয়ে দেখ্‌লি না
…(মরি হায় হায় রে)

(যবনিকা পতন)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

[৭]

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (২)

পুরুষ ও পুরুষোত্তম।

বলিয়াছি যে ভগবদ্গীতায় আমরা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব ছাড়া আর একটা নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাই। এটি পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। উপনিষদের সাধ্য যেমন ব্রহ্ম, গীতার সাধ্য সেইরূপ এই পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম কথাটি গীতার নিজস্ব। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে ইহা খুবই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে ইহা পাওয়া যায় বলিয়া শুনি নাই। গীতা যদিও নিজে বলিতেছেন যে—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

—"লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ"; কিন্তু আমরা যে বেদ পাইয়াছি তাহাতে এ কথা আছে বলিয়া শুনি নাই। যে কয়খানি উপনিষদ সচরাচর প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতেও পুরুষোত্তম কথা আছে বলিয়া এখনও জানি না। বেদান্তসূত্রে বা ব্রহ্মসূত্রে এ-কথা নাই। ভারতের মোক্ষ-শাস্ত্রে, গীতাতেই এই কথাটি প্রথমে আসিয়াছে।

তবে পুরুষ শব্দ বেদে এবং উপনিষদে আছে; গীতাতেও আছে। আর গীতাতে যে কোনও কোনও স্থলে পুরুষ শব্দ পুরুষোত্তমের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু এ সত্ত্বেও বেদের বা উপনিষদের পুরুষ আর গীতার পুরুষোত্তম যে ঠিক একই বস্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না।

ঋগ্বেদের পুরুষ-দেবতা।

ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের কথা অনেকেই জানেন। দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষ-সূক্ত বলে। পণ্ডিতেরা বলেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এমন সকল কথা আছে, যাহার দ্বারা এই মণ্ডলের রচনাকালকে অন্যান্য মণ্ডলের রচনাকাল অপেক্ষা অনেক অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে হয়। আর এই পুরুষ সূক্তটি এই মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীনতার একটা প্রধান প্রমাণ। এখানে বেদের পূর্ব্বতন ইন্দ্রাদি দেবতার স্বতন্ত্রতা এক মহান বিশ্ব-দেবতার অনুভূতিতে সংহত ও সমন্বিত হইয়াছে। এই সূক্তের দেবতার নাম পুরুষ, নারায়ণ ইহার ঋষি। এই পুরুষ-দেবতা সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ। যাহা হইয়াছে বা যাহা হইবে, সকলই এই পুরুষ। এই বিশাল পুরুষ দেবতা আপনার এক-চতুর্থাংশ দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন। অপর তিন-চতুর্থাংশ বিশ্বের অতীতে আছে। পুরুষ-দেবতার এই সকল বর্ণনা দেখিয়া, ইনিই যে পরে উপনিষদে ব্রহ্মরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। উপনিষদের ব্রহ্ম জগৎ-কারণ। বেদান্ত সর্ব্বোপনিষদের সমন্বয় করিতে যাইয়া, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে এই কারণ-ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু; বিশ্বের অভি-ব্যক্তির পূর্ব্বে এই সদ্ বস্তুই কেবল ছিলেন, অপর কোনও কিছুই ছিল না। তিনিই যাহা কিছু আছে সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া তিনি এ-সকলেতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ, আশ্রিত অনাশ্রিত, চেতন অচে-তন, সত্য ও অসত্য যাহা কিছু আছে,—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হইলেন (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। আবার এই ব্রহ্ম যেমন সমগ্র বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সেইরূপ এসকল বস্তুকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছেন। ব্রহ্মের এই বিশ্বরূপত্বই সগুণ-ভাব; আর এই বিশ্বের অতীত ভাবই নির্গুণ। ব্রহ্ম সগুণ

এবং নির্গুণ, জগদ্ব্যাপ্ত ও জগদাতীত, দু-ই। ঋগ্বেদের পুরুষেও এই দুই ভাবই আছে, এক-চতুর্থাংশে তিনি জগদ্ব্যাপ্ত, তিন-চতুর্থাংশে জগদাতীত। ব্রহ্মেতে যাহা নাই, এমন কোনও কিছু ঋগ্বেদের পুরুষ-দেবতায় পাওয়া যায় না। গীতার পুরুষোত্তমের বিশিষ্টতাই এই যে তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ।

উপনিষদের পুরুষ।

উপনিষদেও পুরুষ কথা আছে। উপনিষদ নানা স্থানে, নানা প্রসঙ্গে, নানা অর্থে এই পুরুষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ পুরুষ শব্দে মানুষাকৃতি বুঝাইয়াছেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য যে শ্রুতির অন্তর্গত, তাহাতেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণনা করিতে যাইয়া "পুরুষ" শব্দে মনুষ্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ

এই পুরুষ অন্নরসের বিকার। এই অন্নরসময় কোষের অন্তর্গত প্রাণময় কোষ। আর

স বা এষ পুরুষবিধ এব

আর এই প্রাণময় কোষও মনুষ্যাকার। এইরূপে, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষও মনুষ্যাকারেই উপলব্ধ হইয়াছে। এখানে "পুরুষ" শব্দ বলিতে "মনুষ্যাকার" বুঝাইতেছে। ঐতরেয়োপনিষদেও নরাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ডকে পুরুষ বলিয়াছেন। এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনাপ্রসঙ্গে পুরুষ শব্দের একটা অতি নিগূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এটি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, পরে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিবার পথ অত্যন্ত সোজা হইয়া যায়। এই জন্য এই অধ্যায়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব। ঐতরেয়োপনিষদের প্রথম শ্রুতি—

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।

অর্থাৎ—এই জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিলেন। নিমেষ-ক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন—"আমি কি লোক-সকল সৃষ্টি করিব?"

তারপর তিনি এইসকল লোক সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তিনি ভাবিলেন, এই লোকসকল ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি, এই সমুদায়ের রক্ষণার্থে লোকপাল সৃষ্টি করিব কি? এইরূপ আলোচনা করিয়া, তিনি জল (অর্থাৎ কারণ-জল) হইতে এক পুরুষের উপাদান গ্রহণ করিয়া গঠন করিলেন। তিনি এই পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা বা মনন করিলেন, চিন্তা করাতে তাহার মুখ ফুটিয়া বাহির হইল, যেমন পক্ষীর ডিম্ব ফুটে। মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইল। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রথমোৎপাদিত পুরুষকে স্রষ্টা ক্ষুৎ-পিপাসাবিশিষ্ট করিলেন। তখন সেই ইন্দ্রিয়েরা তাঁহাকে অর্থাৎ স্রষ্টাকে বলিলেন—"আমাদিগকে এরূপ আশ্রয়স্থান দিন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্ন আহার করিতে পারি।" তখন স্রষ্টা তাঁহাদের নিকটে এক গবাকৃতি পিণ্ড আনিলেন। ইহাকে দেখিয়া তাঁহারা অর্থাৎ এসকল ইন্দ্রিয় বলিলেন—"ইহা আমাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।" তখন স্রষ্টা তাঁহাদের নিকটে একটি অশ্বাকৃতি পিণ্ড আনিলেন। তাহা দেখিয়াও ইন্দ্রিয়সকল বলিলেন—"ইহা আমা-দের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" তখন—

"তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতম্।"

স্রষ্টা তাঁহাদের (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের) নিকটে একটি পুরুষ আনি লেন। এই পুরুষকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন—"এই অধিষ্ঠান বস্তুতঃই সুন্দর। অতএব পুরুষ বস্তুতঃই সুন্দর।" এখানে "পুরুষ" অর্থ নরাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড।* অতএব উপনিষদ প্রথমতঃ পুরুষ শব্দে নরাকৃতি বুঝাইয়াছেন।

ফলতঃ বেদের পুরুষ-দেবতার বর্ণনা দেখিয়াও পুরুষ শব্দের এই মৌলিক অর্থই মনেতে জাগিয়া উঠে। পুরুষ শব্দের ধাত্বর্থের সঙ্গেও এই অর্থের বিশেষ সঙ্গতি আছে। ধাত্বর্থ বিচারে "পুরীতে যিনি শয়ান রহেন," তাঁহাকেই পুরুষ বলিতে হয়। "পুরুষং পূর্ণত্বেন পুরী-শয়ানং"—পূর্ণরূপে যিনি পুরীতে শয়ান তিনিই পুরুষ। শ্রুতিতে আছে—

> "সবাঽয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈতেন কিঞ্চ
> নানাবৃতং নৈতেন কিঞ্চ নাসংবৃতং।"

"সকল পুরীতে যিনি পূর্ণরূপে শয়ান তিনিই এই পুরুষ। এমন কোনও কিছু নাই যাহা তাঁহার দ্বারা আবৃত নহে; এমন কোনও কিছু নাই যাহা তাঁহার দ্বারা সংবৃত নহে।" পুরী অর্থ দেহ। দেহকে যিনি ব্যাপিয়া আছেন, দেহের প্রভু যিনি, তিনিই পুরুষ। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা পর্য্যন্ত যখন, যেখানে, যে ভাবে, যে প্রসঙ্গে, এই পুরুষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানেই ইহার এই মৌলিক, এই ধাতুগত অর্থের সঙ্গে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বা অনুমানপ্রতিষ্ঠ কোনও না কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের পুরুষ-সূক্তের পুরুষ দেবতার দেহ কল্পিত হইয়াছে। সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ এসকল বিশেষণ ইহার প্রমাণ। এই পুরুষ-দেবতার "মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল হইয়াছে।" পুরুষ-সূক্তের এই সকল বর্ণনা হইতে, এই পুরুষ-দেবতার যে মনুষ্যাকৃতি কল্পিত হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে এইরূপ আকৃতি কল্পিত হয় নাই, সেখানে পুরুষ শব্দ একেবারেই ব্যবহৃত হয় নাই, এমন কথাও বলা যায় না, সত্য। তবে সেসকল স্থলে বেশীর ভাগ ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করিতেই হইবে। ফলতঃ যেখানে পুরুষ অর্থে আত্মা, পর-

মাত্মা বা অন্তর্যামিকে বুঝাইয়াছে, সেখানেও তাঁহার একটা পুরী বা দেহ বা কোষ পরিকল্পিত হইয়াছে। ঈশোপনিষদে ঋষি যেখানে সূর্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—"হে সূর্য্য তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর—

যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি

তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা আমি তোমার প্রসাদে দর্শন করি। কেন না—

যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি

ঐ যে পুরুষ তিনি আমি।" এখানে "ঐ যে" শব্দের দ্বারা সূর্য্য-মণ্ডলস্থিত যে "পুরুষ" তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সূর্য্যমণ্ডল যাঁহার পুরী সেই "পুরুষ" আমি, ঋষি এখানে এই কথাই বলিতে চাহেন।

কঠোপনিষদের পরম-পুরুষ।

কঠোপনিষদের পুরুষকে নির্গুণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনিও একদিকে বিশ্বের অতীত হইয়াও, অন্যদিকে এই বিশ্বের ও এই জীবের অন্তর্যামি বলিয়াই পুরুষ অভিধান পাইয়াছেন। জীবের মধ্যে দেহী যে আত্মা তাঁর প্রতিষ্ঠা করাই কঠোপনিষদের মূল লক্ষ্য। পরলোকসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসাকে ধরিয়া, এই জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্যই যম-নচিকেতা উপাখ্যানের বিবৃতি। এই জন্য কঠ-শ্রুতি দেহতত্ত্বকে ধরিয়াই তিলে তিলে এই নির্গুণ ও বিশ্বাতীত পুরুষ-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ; মহান্ আত্মা বা মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও কিছু নাই। তাহাই শেষ, তাহাই পরা গতি।

এই শ্রুতি আমাদের সকল জ্ঞানের, সকল ভোগের ও সকল কর্ম্মের মূল ও আদি উৎপত্তি যে ইন্দ্রিয়গ্রাম তাহারই মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বিশ্ব-সমস্যার মীমাংসার সূত্র খুঁজিতে গিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি আলোচনা ও অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে এসকল ইন্দ্রিয় নিজেরা কোনও জ্ঞান বা ভোগ দিতে কিম্বা কোনও কর্ম্ম করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া মাত্রেই বিষয়-সাক্ষাৎকারের ও বিষয়-সম্পর্কের অধীন হইয়া আছে। চক্ষু ও রূপ এই দুই মিলিয়া তবে দর্শন-ব্যাপার সাধিত ও সম্ভব হয়। সেইরূপ কর্ণ ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, ত্বক ও স্পর্শ, এ সকল পরস্পারের সঙ্গে যথাযথ ভাবে যুক্ত না হইলে কোনও ইন্দ্রিয়ই আপনার কর্ম্মসাধনে সক্ষম হয় না। আর রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধাদি গুণ বস্তুর আশ্রয়েই থাকে। এই সকল বস্তুই ইন্দ্রিয়ের অর্থ বা বিষয়। ইন্দ্রিয় যেমন বিষয়ের অধীন, এই সকল বিষয় আবার আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে। তারপর এই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনের অধীন; মনঃসংযোগ ব্যতীত তারা বিষয়জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। চক্ষুর সম্মুখে রূপ, কানের কাছে শব্দ, নাসিকার কাছে গন্ধ, এ সকল থাকিলেও যতক্ষণ না মন ইহাদের পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়ায়, ততক্ষণ ইহারা কোনও জ্ঞান বা ভোগ দিতে পারে না। এই মন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণের তুলনা করিয়াই, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সাক্ষাৎকারে জ্ঞানের ও ভোগের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই তুলনার জন্য একাধিক বিষয়ের যুগপৎ ধারণা আবশ্যক। এই ধারণাশক্তি যে বৃত্তির আছে, তাহা-

কেই বুদ্ধি বলে। অতএব ইন্দ্রিয়, বিষয়, ও মন এই তিনই বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি সজাগ না থাকিলে, ইহারা কার্য্যকারী হয় না ও হইতে পারে না। আবার এই বুদ্ধি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। ইহা মহান্ আত্মা বা সাক্ষীস্বরূপ যে চৈতন্যবস্তু আমাদের অন্তর্বাহ্য সকল প্রকারের পরিবর্ত্তনের মাঝখানে আপনি এ সকল পরিবর্ত্তনের অতীত হইয়া নিত্যস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহার অধীন, তাঁহার অপেক্ষা রাখে। এই মহান্ আত্মাই বুদ্ধির ধারণাকার্য্য সম্ভব করিতেছেন। আবার এই মহান্ আত্মা বা জীবাত্মা যে অব্যক্ত হইতে এই বিশ্বপ্রবাহ নিয়ত স্ফুরিত ও প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার অধীন। জীবাত্মা বা individual soul, আপনার জ্ঞানের, আনন্দের ও কর্ম্মের বিষয় এবং প্রেরণা প্রতিনিয়ত এই বাহিরের বিশ্ব হইতে লাভ করিতেছে। এই বিশ্ব ছাড়া বিশিষ্ট জীবের কোনও জ্ঞান, কোনও আনন্দ, কোনও কর্ম্ম সম্ভব হয় না। এই বিশ্বের একত্ব ও প্রতিষ্ঠা যাঁহাতে তিনিই বিশ্বাত্মা বা cosmic soul ; উপনিষদে ইহাকেই অব্যক্ত বলিয়াছেন। জীবাত্মা এই অব্যক্তের বা বিশ্বাত্মার অধীন। জীবাত্মা স্বতন্ত্র হইয়াও আবার এই বিশ্বের অধীন, বিশ্বতন্ত্র। জীবাত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে, individual soul, cosmic soulএর সঙ্গে, মহান্ আত্মা অব্যক্তের সঙ্গে, অঙ্গাঙ্গ সম্বন্ধে আবদ্ধ। ইঁহারা কেহই স্বতন্ত্র নহেন। কেহই নিরপেক্ষ নহেন। ইঁহারা অন্যান্যাপেক্ষী ও অন্যান্যতন্ত্র। অতএব ইঁহাদের ভিত্তি, প্রতিষ্ঠা, সাক্ষীরূপে এক শ্রেষ্ঠতর তত্ত্বের প্রয়োজন। নতুবা ইঁহাদের পরস্পারের সম্বন্ধ ও আদানপ্রদান আদৌ সম্ভব হয় না। কঠ-শ্রুতি এই শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব-কেই পুরুষ বলিয়াছেন। ইহা শ্রেষ্ঠতম তত্ত্ব। ইহা শেষ তত্ত্ব। ইহা পরা গতি। ইহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে এইজন্য যে এই জীবাত্মা ও ঐ বিশ্বাত্মা এতদুভয়ই ইঁহার পুরী বা দেহস্বরূপ। অথবা জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা এক বৃহত্তর পুরীর পরস্পর সংলগ্ন, দুইটি প্রকোষ্ঠ মাত্র। আব্রহ্মস্তম্বান্ত সকল পুরীগ্রামসম্বলিত যে ব্রহ্মাণ্ড পুরী তাহাই এই

বৃহত্তর পুরী। পুরীর মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড পুরীই শেষ পুরী। সকল পুরী ইহার অন্তর্গত। আর কঠোপনিষদ এখানে যাঁহাকে পুরুষ বলিয়াছেন, তিনি এই শ্রেষ্ঠতম, বিশালতম, পূর্ণতম ব্রহ্মাণ্ড পুরীর স্বামী। এই জন্যই এই পুরুষ শেষ তত্ত্ব।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।

উপনিষদ এই পুরুষকে অব্যক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের হেতু এইমাত্র যে দুই বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ করিতে গেলে, উভয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ মাত্রেই একটা না একটা সামান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ মনুষ্যত্ব নামে যে সামান্য ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে আছে, তাহারই উপরে গড়িয়া উঠে। এই মনুষ্যত্ব বস্তু সকল মানুষে আছে, আবার সকল মানুষকে অতিক্রম করিয়াও আছে। বর্ণমালার ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সমগ্র বর্ণমালাটির অধীন, তার অপেক্ষা রাখে। এই বর্ণমালাতেই ক বর্গের সঙ্গে চ বর্গের বা ট বর্গের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আবার ক এবং খ, কিম্বা চ, ছ, এবং ঞ'র মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা আপন আপন বর্গের অধীন। ক-বর্গ ক-খ-আদি সকল বর্ণকে লইয়া, অথচ প্রত্যেক বর্ণকে অতিক্রম করিয়া আছে। এই সকল বর্ণ ছাড়া ক-বর্গ যে কি, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় না; অথচ আমাদের জ্ঞানেতে এই ক-বর্গ এসকল বিশিষ্ট ক-খ-আদি বর্ণকে অতিক্রম করিয়া আছে বলিয়াই, তাহার দ্বারা ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া থাকি। উপনিষদের পুরুষ সম্বন্ধেও ইহাই বলিতে পারা যায়। আমাদের জ্ঞানের মূল প্রকৃতি, এবং সেই প্রকৃতির অপরিহার্য্য বিধিবাঁধনের দ্বারা এই পুরুষ প্রতিষ্ঠিত হন। ইংরাজিতে জ্ঞানের এই মূল প্রকৃতি ও তার অপরিহার্য্য বিধিবিধানকে necessity of thought বা logic of reason বলে। অর্থাৎ কোনও কিছু জানিতে গেলেই এই বস্তুটিকে মানিয়া লইতে হয়, না

হইলে জ্ঞানক্রিয়ার কোনও অর্থ-ধারণা সম্ভব হয় না। বিস্তৃত বা আয়তনবিশিষ্ট বস্তুকে দেখিতে হইলে, দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই, যেমন আকাশ-বস্তুর অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়; অথচ এই আকাশ চক্ষু-রাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। কিম্বা কাল যাহাকে বলি তাহাকে জানিতে গেলেই ঘটনাপরম্পরাকে জানিতে হয়, নতুবা কাল যে কি বস্তু, তাহা জানিতে পারি না। আর কেবল ঘটনা-প্রবাহই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়; যে অখণ্ড, অনাদ্যনন্ত কাল-প্রবাহের মধ্যে এই সকল ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য বা পারম্পর্য্য দেখিতে পাই, তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না; তাহাকে কেবল এই সকল ঘটনার পারম্পর্য্যের জ্ঞানের ভূমিরূপেই মানিয়া লইতে হয়। সেইরূপ এই ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া মহৎ-তত্ত্ব এবং অব্যক্ত পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্বের জ্ঞান আমরা লাভ করি, তাহাদের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মা হইতে শ্রেষ্ঠতর, এ সকলের ভূমি ও প্রতিষ্ঠারূপে এই পুরুষ-তত্ত্বকে মানিয়া লইতে হয়। Necessity of thought বা logic of reasonএর দ্বারা এই পুরুষ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। কার্য্য দেখিয়া যেমন অজ্ঞাত কর্ত্তা বিশেষকে মানিতেই হয়; কারণ, জ্ঞান বলে যে কর্ত্তা ব্যতীত কার্য্য হয় না ও হইতেই পারে না; পূর্ব্ব দেখিয়াই পর, আর পর দেখিয়াই, যেমন না দেখিয়াও, পূর্ব্বকে মানিয়া লই; কারণ, পর ভিন্ন পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব ভিন্ন পর জ্ঞানেতে কিছুতেই ধরা যায় না; সেইরূপ ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মহান্-আত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য বা জীবাত্মা এবং জীবাত্মাকে দেখিয়া অব্যক্ত বা বিশ্বাত্মাকে যেমন জানি, সেইরূপ এই সকলকে জানিতে গিয়াই, এসকলের অপরিহার্য্য নিয়তি ও অবশ্যম্ভাবী ভিত্তি এবং সম্ভবরূপে এই পুরুষকেও জানি। এই জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ। ইংরাজিতে ইহাকে subjective বলে। এ জ্ঞান objective বা বিষয়তন্ত্র নহে। ইহা আত্মজ্ঞানেরই বিকাশ ও স্ফুরণ মাত্র। অর্থাৎ এই পুরুষকে আত্মার মধ্যেই অনুভব করা যায়, আত্মার

সঙ্গেই তিনি অনুভবগ্রাহ্য হইয়া থাকেন। তাঁর সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই ত্রিতয় সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না। এই পুরুষ যে জ্ঞেয়-রূপে প্রকাশিত হন না, উপনিষদ আপনি এ কথা বলিয়াছেন।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥

এই আত্মা বা পুরুষ, (কারণ অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতেই— "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" একথা বলা হইয়াছে) সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন, কোথাও তিনি প্রকাশ পান না, অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর হন না। সূক্ষ্মদর্শী যাঁরা, অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান-ক্রিয়ার নিগূঢ় নিয়মাদি দর্শন করিতে সক্ষম, তাঁরা বিশুদ্ধতম সূক্ষ্ম-বুদ্ধির দ্বারা ইঁহাকে দর্শন করেন বা জানেন। আর তাঁহাকে এই ভাবে জানিবার উপায় এই—

যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞস্তদ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তং যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥

অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে (এখানে বাক্য অর্থে সমুদায় বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বুঝিতে হইবে) মনেতে প্রত্যাহার করিবেন; মনকে বুদ্ধিতে প্রত্যাহার করিবেন; বুদ্ধিকে জীবভূত যে আত্মা তাঁহাতে প্রত্যাহার করিবেন; আর এই যে আপনার অন্তরস্থিত সাক্ষীচৈতন্য বা জীবাত্মা তাঁহাকে শান্ত আত্মাতে প্রত্যাহার করিবেন। এই শ্রুতিতে যাঁহাকে শান্ত আত্মা (শান্ত আত্মনি) বলা হইয়াছে, তিনিই পুরুষ। তিনি শান্ত, অর্থাৎ তাঁহাতে কোনও সংগ্রাম, কোনও বিক্ষেপ, কোনও অবসাদ বা উল্লাসাদি নাই। এ সকলের অভাব তাঁর বিশুদ্ধ অদ্বৈত-স্বভাবের প্রতিষ্ঠা করে। কারণ যেখানে দ্বৈত সেখানেই আদান-প্রদান, সেখানেই হয় বিরোধের বিক্ষেপ, না হয় মিলনের উল্লাস, অথবা বিরোধ-বর্জ্জনের কিম্বা মিলন-সাধনের

প্রয়াস থাকিবেই থাকিবে। এই জন্য শাস্ত্র-আত্মা বলিলেই সর্ব্বপ্রকারের ভেদাভেদশূন্য নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে বুঝায়। অতএব কঠোপনিষদ যাঁহাকে এখানে পুরুষ বলিয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ নির্গুণ ব্রহ্ম। তাঁর সম্বন্ধে, তিনি আছেন, এই মাত্রই বলিতে পারি। এতদতিরিক্ত তাঁর অন্য উপলব্ধি সম্ভবে না। সত্য বটে তিনি আব্রহ্ম-স্তম্বান্ত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডপুরেতে শয়ান রহিয়াছেন, তথাপি এই ব্রহ্মাণ্ড-পুরে তাঁর সত্তামাত্রই বিদিত আছে। স্বরূপতঃ তিনি যে কি, তার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞানের ভূমিরূপে তাঁহাকে মানিয়া লই, জ্ঞানের বিষয়রূপে জানিতে পারি না।

এইজন্য কঠোপনিষদের পুরুষ নির্গুণ ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যেমন বেদে, সেইরূপ উপনিষদেরও অনেক স্থানে পুরুষকে শরীরীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পাকতঃ কঠোপ-নিষদের এই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা পরম পুরুষকেও শরীরীরূপে কল্পনা করা যায় বটে। কিন্তু অন্যপক্ষে, ইঁহার এই অজ্ঞেয়তা নিবন্ধন, কঠ-শ্রুতি নিজেই ইঁহাকে অলিঙ্গ বা অশরীরী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কঠোপনিষদের যে শ্রুতিগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা তৃতীয়া বল্লীতে পাওয়া যায়। ষষ্ঠী বল্লীতে সেই পুরুষের কথাই আবার বলা হইয়াছে।

> ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
> সত্ত্বাদধি মহান্ আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥
> অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষঃ ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব বা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহান্ আত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য শ্রেষ্ঠ; মহৎ বা মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে ব্যাপক এবং অশরীরী পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

আর এই পুরুষ যে নির্গুণ ব্রহ্ম, পরবর্ত্তী শ্রুতির দ্বারাই ইহার প্রমাণ হয়।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥

এই পুরুষকে বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, কিম্বা চক্ষুর দ্বারা জানা যায় না। তিনি আছেন, এই মাত্র বলা ব্যতীত অন্যভাবে কিরূপে তাঁহার উপলব্ধি করিবে? এই পুরুষ সমাধি দ্বারা লভ্য।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি নিজ বিষয়-চেষ্টা করে না, সেই অবস্থাকে জ্ঞানাগণ পরম গতি বলেন। অর্থাৎ ইহাই এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এই নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিতি হয়। এইরূপ যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন, কঠ শ্রুতির পরম পুরুষকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহাকে কিছুতেই গীতার পুরুষোত্তমেরই নামান্তর বলা যায় না।

এই কারণেই বলিতে হয় যে এই পুরুষোত্তম কথা ও পুরুষোত্তম তত্ত্ব উভয়ই গীতার নিজস্ব; বেদে বা উপনিষদে এ বস্তু নাই। এই পুরুষোত্তমই গীতার বিশিষ্ট সাধ্য।

এই পুরুষোত্তম কে? গীতা যে পুরুষোত্তমের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ কি?

পুরুষ শব্দের মূল অর্থ—যিনি পুরাতে বা দেহেতে শয়ান আছেন। পুরুষ শব্দের মুখ্য অর্থ দেহ। গীতায় পুরুষ শব্দ স্থানে স্থানে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ!
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

হে পুরুষর্ষভ! যে পুরুষকে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-সংস্পর্শে যে সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি হয়, তাহারা ব্যথিত করে না, যাঁর সুখদুঃখে সমজ্ঞান-সিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই অমৃতত্ব লাভের যোগ্য। এখানে যাঁহাকে পুরুষ বলিয়াছেন, অন্যত্র তাঁহাকেই শরীরী, দেহী ইত্যাদি উপাধির দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন। এই শরীরী বা দেহী বা পুরুষকে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজেদের "আমি" রূপে জানি। এ জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষ; অপরোক্ষঅনুভূতিমূলক; এই আমিকে আমরা জ্ঞানের বিষয়রূপে জানি না। কিন্তু স্বয়ং জ্ঞাতারূপে জানি। আমি জ্ঞাতা, আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা,—ইত্যাদি উপলব্ধি হইতেই এই পুরুষকে আমরা জানিতে পারি। আর এই পুরুষকে দিয়াই পুরু-ষোত্তমকে জানি; তদ্ভিন্ন পুরুষোত্তম যে কি ও কে, ইহা জানিবার ও বুঝিবার আর কোনও উপায় নাই।

কঠ-শ্রুতি যে পুরুষের কথা কহিয়াছেন, তাঁহাকে কিন্তু এভাবে জানিতে পারি না। পুরুষ-তত্ত্বের নিম্নে কঠোপনিষদ যে অব্যক্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই অব্যক্তকে পর্য্যন্ত আমরা এইভাবে জানিতে পারি না। আমাদের অহং বা আত্মা পর্য্যন্তই সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চরম সীমা। মহান্ আত্মা বা জীবাত্মা বা সাক্ষীচৈতন্য হইয়া যিনি আমাদের ভিতরে আছেন, যাঁহাকে আমরা জ্ঞানেতে এবং মোহেতে, সকল অবস্থাতেই, "আমি" বলিয়া ডাকি ও বুঝি,—তাঁহাকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি। কারণ সেই বস্তু যে আমরা নিজে। কিন্তু এই মহান্ আত্মার বা জীবাত্মার, এই অহংপ্রত্যয়-বাচক অন্তর্যামি পুরুষের বা সাক্ষীচৈতন্যের বাহিরে যে বিশ্বাত্মা বা অব্যক্ত আছেন, ইহা ফলতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে, এক অর্থে অনু-মিত মাত্র। অর্থাৎ এই অব্যক্তকে বা বিশ্বাত্মাকে আমরা জানি না, কিন্তু যে অহংকে সাক্ষাৎভাবে জানি তাহার জ্ঞানের প্রয়ো-জনেই মানিয়া লইতে বাধ্য হই। যাহা অব্যক্ত, তাহা কখনওই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না।

উপনিষদের ব্রহ্ম জীবে ও জগতে প্রকাশিত, গীতার
জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

ফলতঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে বুঝি যে যাহাকে আমরা বহির্জগৎ বা বিশ্ব বা ব্রহ্মাণ্ড বলি, তাহারও কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এক অর্থে আমাদের নাই। আমাদের নিজেদের ভিতরে যে রূপরসাদির অনুভূতি হয়, তাহাকেই বাহিরে প্রক্ষেপ বা আরোপ করিয়া, আমরা জগতের রূপরসাদি আছে বলিয়া ধরিয়া লই। এই জন্যই আমাদের ভিতরে যাহা নাই, বাহিরে আমরা কখনওই সত্যভাবে তাহা দেখি না ও দেখিতে পারি না। আমাদের নিজের অপরোক্ষ অনুভূতি অপরেতে প্রক্ষেপ বা আরোপ করিয়াই আমরা তাহাদের যা কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। এরা নিজ নিজ স্বরূপে যে কি, ইহা আমাদের অজ্ঞাত। আর এই জগতের অন্তরে বা অন্তরালে যিনি বসিয়া আছেন, যাহা হইতে এই প্রবাহ অভিব্যক্ত হইতেছে, সেই অব্যক্ত পুরুষের সাক্ষাৎ জ্ঞান ত আমাদের থাকিতেই পারে না। এই অব্যক্তের উপরে, ইঁহারাও অন্তরালে যে পুরুষ আছেন বলিয়া কঠ-শ্রুতি বলিতেছেন, তাঁহাকে জানিব এমন কোনও সূত্র ত আমাদের মধ্যে নাই। এক বস্তুর দ্বারা তাহা হইতে একান্ত ভিন্ন অপর বস্তুর কোনও জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। মাটির ঢেলা দেখিয়া পশুরাজের কিম্বা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কোনওই কল্পনা করাও অসাধ্য। শৃগালকে দেখিয়া সিংহকে কল্পনা করিতে পারি; কৃমিকে দেখিয়া পারি কি? তবে যদি বলা হয় যে আমরাও পুরুষ, আর কঠ-শ্রুতি যে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনিও পুরুষ; তাহা হইলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সজাতীয়তা বা সামান্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং এই গুণসামান্য আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহাকে জানিতে ও বুঝিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যে পুরুষ, এ জ্ঞান আমাদের আছে। এই জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ। আর আমরা নিজেদের যেরূপ পুরুষ বলিয়া জানি, পরমতত্ত্বকেও সেইরূপ পুরুষ বলিয়াই জানিতে

পারি ; তার বেশী যদি তাঁহাতে কিছু থাকে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ই হইতে পারে না। আমরা ক্ষুদ্র পুরুষ, তিনি বৃহৎ পুরুষ ; আমরা অপূর্ণ পুরুষ, তিনি পূর্ণ পুরুষ ; আমরা নিকৃষ্ট পুরুষ, তিনি উৎকৃষ্ট পুরুষ ; এ সকল তারতম্য তাঁর সঙ্গে আমাদের থাকিতে পারে ; কিন্তু তিনি যদি একান্তভাবে আমাদের হইতে ভিন্ন ও পৃথক হন, তাহা হইলে, আমরা আমাদের নিজেদেরে যে পুরুষরূপে জানি, তাহার দ্বারা তাঁর স্বরূপের কোনও প্রকারের উপলব্ধি আমাদের সম্ভব হইবে না ও হইতে পারে না। এক কথায় বলিতে গেলে, এই বলিতে হয় যে কঠোপনিষদ যে পুরুষকে পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুতেই আমাদের পুরুষত্বের দ্বারা ধরিতে ও বুঝিতে পারি না। গীতা যাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের গুণ-সামান্য আছে বলিয়া, তাঁহাকে আমরা সত্যভাবে, রূপতঃ ও স্বরূপতঃ জানিতে ও বুঝিতে পারি। কারণ এই পুরুষোত্তম, আমরা যাহা তাহারই উত্তমাবস্থা। শৃগালকে দেখিয়া যেমন সিংহ যে কি ইহা বুঝিতে ও ধরিতে পারি ; বিড়ালকে দেখিয়া যেমন ব্যাঘ্র যে কি ইহা বুঝিতে ও ধরিতে পারি ; মাটির ঢিলা দেখিয়া যেমন অভ্রভেদী গিরিরাজ যে কিরূপ ইহা ধারণা করিতে পারি ; সেইরূপ নিজেদের পুরুষ-লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, আমাদের এই ক্ষুদ্র, নিকৃষ্ট, অপূর্ণ পুরুষত্বের দ্বারাই পুরুষোত্তম যে কি ও কে, ইহা ধরিতে পারি।

উপনিষদ জীবেতে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। "শ্বেতকেতো ! তত্ত্বমসি"—হে শ্বেতকেতো তুমি সেই ব্রহ্ম ; "অহং ব্রহ্মাস্মি" —আমি ব্রহ্ম ; "আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং"—এই আত্মা বা ব্রহ্ম জীবের অভ্যন্তরে নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছেন ; "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য"—আত্মাতে এই ব্রহ্মকে দর্শন করিবে ;—"প্রতিবোধবিদিতং"—এই ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে জানিলেই প্রকৃতরূপে জানা যায় ;

"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু তৎসমুদায় ব্রহ্ম; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এই জগতে যাহা কিছু প্রপঞ্চভূত চঞ্চল বিষয় আছে, তৎসমুদায়কে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে;—এইরূপ অসংখ্য শ্রুতি ব্রহ্মবস্তুকে জীবে ও জগতেতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ব্রহ্মকে জীবে ও জগতে দেখা উপনিষদের সাধনার সাধ্য।

গীতা উল্টা পথ ধরিয়াছেন। গীতা বলিতেছেন, উপনিষদ বাক্য সত্য। ব্রহ্ম জগতে আছেন।

ময়াততং মিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত রূপিনা

"অব্যক্ত"রূপী আমার যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার দ্বারা সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই গীতার শেষ কথা নহে। ইহা সত্যের একদেশ মাত্র। ব্রহ্ম যেমন জীবে আছেন, ব্রহ্ম যেমন জগতে আছেন; এই জীব এবং জগতও সেইরূপ ব্রহ্মেতে আছে। ব্রহ্মের সত্তা জীবে ও জগতে পরিপূর্ণ, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁর প্রকাশ এখানে পরিণামী; অর্থাৎ উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পূর্ণতর হইতে পূর্ণতম হইতেছে। জগতের ও জীবের সত্তা এবং প্রকাশ ব্রহ্মেতে উভয়ই নিত্য-সিদ্ধ, পূর্ণতম। সেখানে ব্রহ্মেতে যাহা ফুটিয়া আছে, পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত; এখানে, জগতে ও জীবে তাহা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে। এই জন্যই এখানে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, পূর্ণ-অপূর্ণ, উত্তম-অধম, এসকল ভেদ ও বৈষম্য দেখিতে পাই। আর ঠিক এই হেতুতেই সেখানে, ব্রহ্মস্বরূপে জীব ও জগৎ তাহাদের পূর্ণতা পাইয়া আছে, নিত্যকাল পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এখানে জীবাত্মার মধ্যে আমরা এই জন্যই পুরুষকে মাত্র দেখি। এই পুরুষ অভিব্যক্তিশীল। কিন্তু ঐখানে, ব্রহ্মেতে এই পুরুষ নিত্য-পূর্ণ। ঐ ব্রহ্মে আর পূর্ণ পুরুষে কোনও ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই পুরুষ। এক দিক্ দিয়া দেখিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি; আর দিক্ দিয়া দেখিয়া তাঁহাকে পুরুষ বলি। আর যেখানে ব্রহ্ম আর পুরুষ এক, সেইখানেই

পরমতত্ত্ব পুরুষোত্তম। উপনিষদ ব্রহ্মকে জীবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। গীতা জীবকে তার নিত্য, পরিপূর্ণ, শ্রেষ্ঠতম, সর্ব্বোত্তম স্বরূপে ব্রহ্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্রহ্মকে পুরুষোত্তমরূপে জীবের নিত্য সাধ্য করিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব সগুণও নহে, নির্গুণও নহে; সগুণ+নির্গুণও নহে; এ তত্ত্ব সগুণ ও নির্গুণ উভয়ের অতীত। ইহাই গীতার মূল শিক্ষা। আর এই যে সগুণ-নির্গুণাতীত পরমতত্ত্ব, তাহাই গীতার কৃষ্ণ-তত্ত্ব। এই তত্ত্বোপদেশ ধরিয়াই গীতার কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা]

[ভাদ্র, ১৩২২

কীর্ত্তন

এস আমার সাঁঝের বরণ,
এস আমার সজল আঁখি,
এস এস এস এস হে !
মান ক'রে আর থেক না হে !
ঐ দূরে দাঁড়ায়ে থেক না হে !
ওই যে তোমার সজল নয়ন,
কেমন করে পরাণ রাখি।
এস এস এস এস হে !
এস এস এস এস হে !
এস আমার আঁধার বরণ,
আজ তোমারে বুকে রাখি।
সকাল সন্ধ্যা দিবস যামি
আর কারো পানে চাইনি আমি !—
ওগো আমার আঁধার বরণ,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
বুকের ব্যথা বুকে ক'রে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
এই অনুরাগ চেপে চেপে,

তোমার পানেই চেয়ে আছি।—
লাজের ভরে নীরবে হে,
তোমার পানেই চেয়ে আছি।
এস আমার সাঁঝের বরণ,
এস তোমায় বুকে রাখি!
(আর) লাজের বাধা মান্‌বো না হে!
এই অনুরাগ চাপ্‌বো না হে,
সকল জীবন খুলে দিব,—
কিছুই আর ঢাক্‌বো না হে!
এস এস এস এস হে!
মান ক'রে আর থেক না হে!
ওই শুন আমার প্রাণের কান্না,
এই হের আমার সজল আঁখি।
এস আমার আঁধার বরণ,
আজ তোমারে বুকে রাখি।

কবিতার কষ্টি-পাথর

মামলার মূল।

কবিতার কথা লইয়া কিছুদিন হইতে আমাদের সাহিত্যে একটা গোল বাধিয়াছে। কবিতার ভাল-মন্দের কষ্টি-পাথর কি, এই প্রশ্ন হইতেই এই গোল উঠিয়াছে। এরূপ বিষয়ে মতভেদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের মাটির গুণে মতভেদ হইলেই দলাদলি পাকাইয়া উঠে। এক্ষেত্রেও যে তাহা হয় নাই, এমন বলিতে পারি না। মূলে দুই দলের মধ্যে যে কোনও সাংঘাতিক গরমিল আছে, এমনও মনে হয় না। বেশীর ভাগ গোল বোধ হয় কেবল কথা লইয়া। আর সকলের চাইতে এই গোলের মূল আমাদের অভিমান ও অসহিষ্ণুতা।

কবি-বিশেষের কবিতার গুণাগুণের কথা না তুলিয়া, নিতান্ত নির্গুণ (বা abstract) ও নিরাকার (বা impersonal) ভাবে এবিষয়ের আলোচনা হইলে, এতটা গোল পাকাইয়া উঠিত না। সেরূপ নির্গুণ আলোচনা-প্রসঙ্গে যদি বলিতাম যে—"কবিতার প্রাণ রস", সে কথায় কেহ আপত্তি করিতেন না। এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলিয়া আসিয়াছে।—"আর এই রস হয় বর্ত্তমান বস্তুর সাক্ষাৎকার, না হয় পূর্ব্ব-প্রত্যক্ষ বস্তুর সাক্ষাৎকারের স্মৃতি হইতেই কেবল উৎপন্ন হয়, শূন্য হইতে কিম্বা কেবল মনের ভিতর হইতে আপনি জন্মে না"—তাহাতেও যে বড় একটা কথা উঠিত, এমনও বোধ হয় না। কারণ, ইহা ত অতি মামুলী কথা। রস-বস্তুর অভিজ্ঞতা যারই আছে, আর কি ভাবে এবস্তু ফোটে ইহা যে'ই কোনও দিন তলাইয়া দেখিয়াছে, সে'ই ইহা জানে।—"কিন্তু বস্তু-বিশেষকে ধরিয়াই জন্মিলেও, এই রস আমাদের মনের বা আত্মারই অনুভবের বিষয়। বস্তু আমাদের

ভোগ্য, আমরা তার ভোক্তা: আর করুণ-রুদ্রাদি আগন্তুক রস, কিম্বা দাস্যসখ্যাদি স্থায়ী রস, উভয়ই আমাদের মধ্যে এই ভোগ-হইতে উৎপন্ন হয়। তবে ভোক্তা সর্ব্বদাই আপনার ভোগ্য অপেক্ষা বড় ভোগ্যকে ছাড়াইয়া থাকেন। এই কারণে, বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুর সাক্ষাৎকারে জন্মিলেও, এই সকল রস সর্ব্বদাই সে বস্তুকে ছাপাইয়া উঠে এবং ছাড়াইয়া যায়। আর এই ভাবে ছাপাইয়া উঠে ও ছাড়াইয়া যায় বলিয়াই, তাহার ভিতরে একটা সার্ব্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতা প্রচ্ছন্ন থাকে। রস মাত্রেই নানা আধারে, নানা রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এসকল নানাত্বের মধ্যে তার একটা একত্ব; এসকল চঞ্চল রূপের মধ্যেই তার একটা নিত্যসিদ্ধ স্বরূপও বিদ্যমান থাকে। আর রসের বিশিষ্ট রূপের মধ্য দিয়া, এই সকল বিশিষ্ট রূপের আশ্রয়েই, নিপুণ কবি-প্রতিভা তার এই সার্ব্বজনীন, এই বিশ্বজনীন, এই নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটিকে ফুটাইয়া তুলে। এই ভাবেই শ্রেষ্ঠ কবিতার সৃষ্টি হয়।"—এই কথা বলিলেও, সকলেই যে ইহা ভাল করিয়া বুঝিত, এমন নাওবা হইতে পারে; কিন্তু বুঝুক আর নাইবা বুঝুক, তাহাতে কাহারও আঁতে ঘা লাগিত না; এবং সেক্ষেত্রে, সকলে না হউক, অনেকেই এসকল কথায় সায় দিয়া যাইতেন। কিন্তু প্রয়োগের বেলা, নিজ নিজ মনোমত ভাষ্যাদি রচনা করিয়া, এসকল সূত্রের এমন অর্থ করিয়া লইতেন, যাহাতে ইহার দ্বারা তাঁহাদের যে সকল কবিতা মিষ্ট লাগে, তাহারই উৎকর্ষ প্রমাণিত হইত এবং যাহা তাঁহাদের পছন্দ হয় না তাহা নিন্দনীয় হইয়াই থাকিত। সেরূপ নির্গুণ আলোচনায় কোনও গোলই বাধিত না, সত্য; অন্যপক্ষে তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াও থাকিত। এখন যেমন যার যাহা ভাল-লাগে, লোকে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া ধরিয়া লইতেছে, তখনও তাহাই থাকিয়া যাইত। সাহিত্য-সমালোচনার, বিশেষ কাব্য-সমালোচনার, কোনও সত্য ও প্রামাণ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইত না।

ভাল-লাগা ও আনন্দ।

এই ভাল-লাগাটাই প্রকৃতপক্ষে, এখন আমাদের সাহিত্যে সোনার কাঠি হইয়া আছে। তবে এই উদার-শিক্ষার যুগে নিতান্ত মামুলী বস্তুরও এক একটা দার্শনিক নাম-করণ হইয়া যায়। এই ভাল-লাগাটাকে অনেকেই আনন্দ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে এই ভাল লাগার একটা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, আমাদের ধর্ম্মে ও দর্শনে এই আনন্দ শব্দটি অতি প্রাচীন। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সাধন-সম্পদ-সম্ভার বহন করিয়া এই আনন্দ কথাটি আমাদের নিকটে আসিয়াছে। উপনিষদ এই আনন্দকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ভাগবত এই আনন্দকেই নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীভগবানের নিজ-স্বরূপ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আনন্দ হইতেই সৃষ্টি।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

"আনন্দ হইতেই যাবতীয় ভূতগ্রাম জন্মগ্রহণ করে। জন্মিয়া আনন্দেতেই সকলে জীবিত রহে। অন্তিমে আনন্দেতেই সকলে প্রবেশ করে।" সৃষ্টির মূলে, মধ্যে, অন্তে, সর্ব্বত্র এই আনন্দ বিদ্যমান। স্রষ্টা আপনার অন্তরতম যে আনন্দ তাহারই প্রেরণায় এই সৃষ্টির প্রকাশ করিয়াছেন। এই সৃষ্টি তাঁর আনন্দেরই মূর্ত্তি।

কবির কৈফিয়ৎ।

কবি কহিতেছেন—"আমার সৃষ্টিও ত তাহাই। আমিও আমার অন্তরের আনন্দের প্রেরণাতেই কবিতা লিখি। এই আনন্দের কষ্টি-পাথরেই আমার কবিতাকে কষিতে হইবে। তোমরা বল, কবিতার প্রাণ রস। ইহা আমারই কথা। রস আর আনন্দ ত একই বস্তু। 'রসো বৈ সঃ। রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।'—পরমেশ্বর স্বয়ং রস-স্বরূপ। তাঁর এই রস পাইয়াই জীব আনন্দিত হয়। রস মাত্রেই

আনন্দাত্মক। আর এই আনন্দ বাহিরের বস্তু নয়। ইহাকে চক্ষে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, হাত দিয়া ইহাকে ধরিতে বা ছুঁইতে পাই না। আনন্দের অনুভব কেবল প্রাণের ভিতরেই হইয়া থাকে। এই আনন্দ বা রস জীবের অন্তরতর, অন্তরতম কথা। ইহা শুদ্ধ অনুভূতিগ্রাহ্য। যাহা চক্ষুগ্রাহ্য, চক্ষু বা দৃষ্টি যেমন তার একমাত্র প্রমাণ, আর এই প্রমাণ যেমন তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, সে বস্তুর প্রতিষ্ঠা যেমন আর প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে না; সেইরূপ কেবল প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়াই যাহাকে জানিতে হয়, সেই আন্তরিক অনুভূতিই তার একমাত্র প্রমাণ। তার পক্ষে এই প্রমাণই পর্য্যাপ্ত, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা নাই। আমার অন্তরের আনন্দের প্রেরণাতেই যখন আমার কবিতা ফোটে; এই আন্তরিক আনন্দানুভূতিই যখন আপনি আপনার ছন্দো-বন্ধরূপ ফুটাইয়া তাহার মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করে; তখন সে কবিতা রসাত্মক নহে, তোমরা একথা বলিলেই আমি তাহা শুনিব কেন? মানিব কেমন করিয়া? তোমাদের কথাকে আমি মর্য্যাদা করিতে পারি; কিন্তু সেকথা যখন আমার প্রত্যক্ষের প্রতিবাদ করে, তখন তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি কিরূপে? আমি যাহাতে অমন আনন্দ পাই, তাহা তোমাদের আনন্দদান করে না, ইহা বুঝি। কিন্তু আমার মিষ্ট লাগে বলিয়া, তোমরাও কেন ইহাতে রস পাইবে না, এজোর যেমন আমি করিতে পারি না; সেইরূপ তোমাদের যাহা ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগিলেও তাহাকে মন্দ বলিয়া সন্দেহ করিব, এই জবরদস্তিই বা আমার উপরে তোমরা করিবে কেন? তবে ভাল-লাগাটা ভাবাত্মক, হাঁ-প্রত্যয়-বাচক। ইহা প্রত্যক্ষের কথা। আর ভাল-না-লাগাটা অভাবাত্মক, না-প্রত্যয়-বাচক। আর 'না' কখনও প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ হয় না। 'না'-প্রত্যয় মাত্রেই স্বল্পাধিক অনুমান-প্রতিষ্ঠ। অনুমানের দ্বারা প্রত্যক্ষ অসিদ্ধ হয় না।"

ইষুর গোল।

এখানে কবি মূল কথা বা ইষুটা একটু গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। প্রথমতঃ, রস আর আনন্দ কি ঠিক একই কথা? কবি বলিতেছেন, "রস মাত্রেই আনন্দাত্মক"। কিন্তু রস আর আনন্দ এক হইলে, এমন কথা বলা যাইত কি? তাহা হইলে, "রস মাত্রেই আনন্দাত্মক" না বলিয়া "আনন্দ মাত্রেই আনন্দাত্মক", ইহাও বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সে কথার কোনও অর্থ হইত না। রসেতে আনন্দ আছে। আনন্দ রসের আত্মা। কিন্তু আনন্দ ছাড়াও তাহাতে আর কিছু আছে, আত্মা ছাড়াও তার একটা দেহ আছে; "রসমাত্রেই আনন্দাত্মক"—বলিলে ইহাই বুঝায়। "রস বৈ সঃ। রসোহেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"।—পরমেশ্বর রস-স্বরূপ। পরমেশ্বরের রস পাইয়াই, এই জীব আনন্দিত হয়। এখানেও রস আর আনন্দ যে একই বস্তু, এমন বলা হয় নাই। পুত্রকে পাইয়া মাতার আনন্দ হয়। এখানে পুত্রই যে আনন্দ তাহা নহে। পুত্র আশ্রয়, আনন্দ আশ্রয়ী। রস বিষয়াশ্রিত, বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম; আনন্দ বিষয়ীর আশ্রিত, তাঁর জ্ঞান ও ভোগের ফল। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে পার্থক্য, রস এবং আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ। কবি এই কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন।

তার পর, ভাল-লাগার কথা। এই ভাল-লাগাটা বা আনন্দানুভূতি রসের অস্তিত্বের প্রমাণ, ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না। আপনার সৃষ্টিতে যখন কবির এমন আনন্দ হয়, তখন সে কবিতায় রস নাই, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু ভাল-লাগার বা আনন্দানুভূতির দ্বারা রস আছে, এইটুকুই জানি। সে রস শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট তার কোনও প্রমাণ হয় কি? ফলতঃ আনন্দানুভূতির দ্বারা রসের অস্তিত্বেরই প্রমাণ হয়, রসের আদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় না। আর এই আদর্শটাই যে এখানে মূল কথা। এই মূল কথাটা ভুলিয়া গিয়াই, কবি আপনার কৈফিয়তে আসল ইষুটাকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

আদর্শ ও স্বানুভূতি।

এই আদর্শ কেবল আমাদের নিজ নিজ অনুভূতির দ্বারা কখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই অনুভূতি, যে ইহা অনুভব করে, তার নিতান্ত ভিতরকার কথা। কবির আপনার কাব্যে যে আনন্দানুভব হয়, ইহা তাঁর অতি অন্তরঙ্গ কথা। তিনি ছাড়া আর কেউ একথার মর্ম্ম, অর্থ, সত্যাসত্য বুঝে না ও বুঝিতে পারে না। সমালোচক যে সে কাব্যেতে কখনও সে আনন্দ পান না, ইহাও তাঁর অতি অন্তরঙ্গ কথা। তিনি ছাড়া একথার আর কোনও সাক্ষী-সাবুদ নাই। এক্ষেত্রে কবির অন্তরঙ্গ অনুভব একদিকে, আর সমালোচকের অন্তরঙ্গ অনুভব অন্যদিকে, এই দুই অনুভবের মধ্যে কোন্‌টা সঙ্গত, কোন্‌টা অসঙ্গত, ইহার মীমাংসার কোনও সূত্র, কোনও লক্ষণ, কোনও কষ্টিপাথর আছে কি নাই? যদি এরূপ কোনও সূত্র না থাকে, তবে এ আলোচনারই বা ফল কি? সেক্ষেত্রে সমালোচকের সমালোচনা এবং কবির আত্মসমর্থন, দু'ই নিতান্ত নিরর্থক হয়। কিন্তু সমালোচক যখন কবির বিরুদ্ধে এজাহার দেন, আর কবি যখন সেই এজাহারের জবাব দিতে অগ্রসর হন, তখনই বুঝিতে হইবে যে ইঁহারা দুইজনেই নিজেদের ভাল-লাগা বা না-লাগা, নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা স্বানুভূতি ছাড়া, একটা উচ্চতর আদালতের এলাকা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁদের নিজের যা ভাল লাগে, সত্য সত্যই যে তাহা ভাল; কিম্বা যা ভাল লাগে না, সত্য সত্যই যে তাহা মন্দ; এ দাবী দু'জনাই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কবির নিজের আনন্দানুভূতিই যদি তাঁর কাব্যের সত্যতার ও শ্রেষ্ঠত্বের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হয়, তবে তিনি কৈফিয়ৎ দেন কেন, কাহার নিকটে? কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়ার মানেই বিচারপ্রার্থী হওয়া। আর বিচার মাত্রেই প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু কবির অন্তরের অনুভূতি ছাড়া যদি তাঁর কাব্যের সত্যাসত্যের বা উৎকর্ষাপকর্ষের আর কোনও প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি নিজে ছাড়া,

তাঁর সাক্ষীই বা আর কে আছে, বা থাকিতে পারে? তাঁর অনুভূতি সত্য কি অসত্য, শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, তাহা তাঁরই অনুভবগম্য; তিনিই কেবল তাহা প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারেন, অপরে বুঝিবে কেমন করিয়া? সে অবস্থায়, তিনি আপনিই বাদী, আপনিই আপনার সাক্ষী, আপনিই আপনার বিচারক। কৈফিয়তের অবসর আর সেখানে রহিল কৈ?

তর্ক ও তত্ত্ব।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-সাধনাতে এ বিষয়টা নিতান্ত অপরিচিত নহে। কতকগুলি তত্ত্বকে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মানীষীগণ শুদ্ধ অন্তরের অনুভূতিগ্রাহ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বেদান্তমতে ব্রহ্মের স্বরূপ, এবং পরলোকতত্ত্ব এই আন্তরিক অনুভূতিগ্রাহ্য তত্ত্বের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এ তত্ত্ব অতর্ক-প্রতিষ্ঠ, শুদ্ধ অপরোক্ষ-অনুভূতিগ্রাহ্য। এইজন্য এদেশের তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা এসকল বিষয়ে কখনও তর্ক-বিতর্ক করেন না। যে পথে গেলে এই অপরোক্ষ-অনুভূতি খুলিবার সম্ভাবনা, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন শিষ্য পাইলে, তাহাকে সেই পথ কেবল ধরাইয়া দেন। কারণ, তর্কের ভূমিতে গেলেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া, আর একটা প্রামাণ্যের অস্তিত্ব মানিতে হয়। নতুবা তর্ক চলিবে কিসের উপরে?

আসল কথা এই, মুখে যিনিই যাহা বলুন না কেন, ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া সত্যাসত্যের, সুন্দর-কুৎসিতের, এবং ভাল-মন্দের একটা সার্ব্বজনীন মাপকাঠি ও আদর্শ যে আছে, যেখানেই বিচার-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বাদী-প্রতিবাদী, অর্থী-প্রত্যর্থী, পূর্ব্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ, সেইখানেই কার্য্যতঃ ইহা মানিয়া লওয়া হয়। না হইলে বিচার, তর্ক, মীমাংসা কিছুই সম্ভব হয় না। কবি কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়াই এটি মানিয়া লইয়াছেন।

আনন্দের বহু রূপ।

আনন্দ পাওয়া আর আনন্দ দেওয়াই কবির কাব্য-সৃষ্টির এক-

মাত্র লক্ষ্য। লোক-শিক্ষা বা লোকহিত তাহাতে হয় হউক; সে কষ্টি-পাথরে কাব্য-রস কষিলে চলিবে না, ইহা মানিলাম। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও ত ইতরবিশেষ আছে? কেবল কবিতা পড়িয়াই যে লোকে আনন্দ পায়, তাহা নহে। রসগোল্লা খাইয়াও আনন্দ পায়। আর রসগোল্লার আবিষ্কার যে প্রথমে করিয়াছিল সে'ও আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নয়। যে যাহা নির্ম্মাণ করে, যদি সে নির্ম্মাণ-কার্য্যে তার প্রাণ থাকে, সে তাহাতেই আনন্দ পায়। কবি কবিতা লিখিয়া আনন্দ পান। রাঁধুনী রাঁধিয়া আনন্দ পায়। সূত্রধর খাট-আলমারী তৈয়ার করিয়া আনন্দ পায়। মালী বাগান করিয়া আনন্দ পায়। আর নির্ম্মাণে নির্ম্মাতা, কর্ম্মে কর্ত্তা যেমন আনন্দ পান, ভোগে ভোক্তাও সেইরূপ আনন্দ পাইয়া থাকেন। মিষ্টান্ন খাইয়া আনন্দ হয়। পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দ হয়। তত্ত্বের অনুসন্ধানে আনন্দ হয়। ভক্তির অনুশীলনে আনন্দ হয়। কৃপণের ধন-রক্ষণে, আর দাতার সেই ধনই অকাতরে বিতরণে, আনন্দ হয়। শৈশবে গুরুজনদিগের মুখে শুনিতাম—

> নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ ময়ূরাঃ ঘনগর্জ্জনে।
> সাধবঃ পরকার্য্যেষু দুর্জ্জনঃ পরপীড়নে॥

কিন্তু ব্রাহ্মণের ফলারের আনন্দ, সাধুদিগের পরোপকারের আনন্দ, দুর্জ্জনদিগের পরপীড়নের আনন্দ, সকলই কি এক? এসকলের মধ্যে কি কোনও শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদ নাই? যদি থাকে, তবে তাহার প্রমাণ কি? পরীক্ষা হইবে কিসে? আনন্দ যে পায়, তার নিজের আন্তরিক অনুভূতির দ্বারা ইহার বিচার ত হয় না, হইতেই পারে না? তাহা হইলে, কবির বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের ধ্যানে ও চিত্রণে যে আনন্দ হয়, দস্যুর পরস্বাপহরণের এবং দুর্জ্জনের পরপীড়নের আনন্দের সঙ্গে তার কোনও প্রভেদ থাকে না। তারপর, একই বিষয়েতেও যখন বহুলোকে

আনন্দ পায়, তখনও তাদের সকলের আনন্দ সমান হয় না। আর এখানেই বা এই নানালোকের আনন্দের ওজন করিব কোন্ তোলে চড়াইয়া? কেবল অনুভূতির দ্বারা এ বিচার হয় না। আমার অনুভূতি কোথায় কম, কোথায় বেশী, তার বিচার আমি করিতে পারি, তুমি পার না। তোমার অনুভূতি কতটা, তার ওজনও কেবল তুমিই জান, আমি জানি না। তবে যে বলি,—"এ বিষয়ে তোমার তেমন আনন্দ হয় নাই, দেখিতেছি," তাহা তোমার আনন্দানুভূতির বাহিরের প্রকাশ দেখিয়া। এখানে আমি ইহা ধরিয়া লই যে তোমার আনন্দ আর আমার আনন্দ, দু'ই মূলতঃ একই বস্তু। আর এই আনন্দবস্তু যে আকারে আমার বাহিরে, অর্থাৎ আমার মুখের ভাবে, চোখের চাহনিতে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুলকাদিতে প্রকাশিত হয়, তোমার মুখে চোখে দেহেতেও সেইরূপই প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রকাশ বলিতেই রূপ বুঝায়। আর রূপ বলিতেই স্বরূপের কথা আইসে। যাহা প্রকাশের পিছনে থাকে, তাহাই প্রকাশিত হয়। পিছনে যাহা থাকে, তাহা পূর্ণ হইয়া আছে। প্রকট যাহা হয়, তাহা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে। বীজেতে গাছের স্বরূপটি নিহিত। ক্ষুদ্র বট-বীজাণুর মধ্যে সমগ্র বটগাছটি লুকাইয়া আছে। সেই বীজ হইতেই গাছটি তিলে তিলে ফুটিয়া বাহির হয়। আর যে পরিপূর্ণ বটগাছ বীজের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ, তাহাই বাহিরে অঙ্কুর হইতে চারা, চারা হইতে ছোট গাছ, ছোট গাছ হইতে অসংখ্য-শাখ বনস্পতিরূপে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। এই যে নিত্যসিদ্ধ বট-বৃক্ষটি বীজের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া আছে, তাহাই তার স্বরূপ। সেই স্বরূপ দিয়া নানা বট-বৃক্ষেতে যে রূপ প্রকাশিত হয়, তার ছোট-বড়র, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের, উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয়। এইটি না থাকিলে, কোন্ বটগাছ যে ভাল, কোন্টাই বা মন্দ, ইহা কে বলিতে পারিত?

রূপ ও স্বরূপ।

যাহা বাহিরে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই আমরা রূপ বলি। যাহা

হইতে এই প্রকাশ হয়, যাহা এই প্রকাশের পিছনে আছে, তাহাই সে রূপের স্বরূপ। আমাদের ভিতরকার অনুভবের একটা স্বরূপ আছে। বাহিরে কথায় বা কার্য্যে, বিশেষ আমাদের মুখের ভাবে, চোখের চাহনিতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিশেষ বিশেষ সংস্থানে যাহা প্রকাশিত হয়, এগুলি সে অনুভবের রূপ। ভয়াদি আগন্তুক, কিম্বা দাস্যাদি স্থায়ী রসের অনুভবে আমাদের দেহেতে যে রূপ ফোটে তার পিছনে এসকলের একটা স্বরূপ অবশ্যই লুকাইয়া আছে; না হইলে এসকল রূপ ফোটে কোথা হইতে? এ সকল রসের প্রকাশের বা রূপের মধ্যে একটা সজাতীয়তা, কতকগুলি সামান্য লক্ষণও সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই সামান্য লক্ষণগুলির দ্বারাই তারা যে একই বস্তুকে নানাভাবে প্রকাশ করিতেছে, ইহা বুঝি। যাহাকে এখানে একই বস্তু বলিলাম, তাহাই এসকল রসের স্বরূপ। সকল রূপের বা প্রকাশের মধ্যেই তাদের নিজ নিজ স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। কোনও রূপেতে সে স্বরূপের প্রকাশ বা বেশী হয়, কোনও রূপেতে বা কম হয়। কিন্তু রূপ মাত্রেই স্বরূপকে প্রকাশিত করে। এই স্বরূপ দিয়াই রূপের তারতম্যের বিচার হইয়া থাকে। যে রূপেতে স্বরূপের যত বেশী প্রকাশ হয়, তাহাই তত শ্রেষ্ঠ, যাহাতে যত কম প্রকাশ হয়, তাহাই তত নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। আনন্দের রূপ অসংখ্য। আনন্দের এসকল অসংখ্য রূপের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিজ নিজ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটিও আমাদের চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হয়। রূপের সঙ্গেই যে স্বরূপের প্রকাশ হয়, তাহাকে অনুভূতি বলা যায় না, তাহা অনুভূতির ভূমি, রূপের মধ্যে তার আভাস পাই মাত্র। এইজন্য স্বরূপের জ্ঞানকে মামুলী অর্থে অনুভূতি না বলিয়া প্রত্যয়, perception না বলিয়া intuition বলাই শ্রেয়স্কর। কারণ বস্তুর বা ভাবের রূপই কেবল আমাদের এই অনুভবগম্য; তার স্বরূপ এই অনুভবগম্য নহে, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আনন্দের যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের কথা বলিতেছি, সেই স্বরূপটি যে

আধারে আমরা আনন্দ অনুভব করি তাহার মধ্যে ফুটিয়াও সর্ব্বদাই তাহাকে ছাড়াইয়া থাকে। সেই স্বরূপ আমাদের ঠিক অনুভবগম্য নহে, কিন্তু যাহার প্রকাশে আমাদের সকল অনুভূতি সম্ভব হয়, ইহা সেই প্রত্যয়সিদ্ধ বস্তু। আনন্দকে কাব্যের একমাত্র কষ্টি-পাথর করিতে যাইয়া, কবি আপনি ইহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ মানিলেও, জ্ঞানতঃ ধরিতে পারেন নাই। পারিলে, কবিতার আদর্শ কি, এই লইয়া এত গোল পাকাইত না।

কবিতার রাজ্যে অরাজকতা।

ফলতঃ কবি নিজের বেলায় যে আন্তরিক আনন্দানুভূতির উপরে আপনার কাব্যের সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেন, অপর কবির বেলায় তাহা অকৈতব আন্তরিকতা সহকারে স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। আপনার ভিতরকার আনন্দের প্রেরণা-তেই তাঁরা কবিতা লেখেন, সকল কবিই এই দাবী করিয়া থাকেন। এই আন্তরিক প্রেরণা ব্যতীত যে কবিতার উৎপত্তি হইতে পারে, কোনও কবিই ইহা মানেন না। কোনও সাহিত্যিকই ইহা স্বীকার করিতে রাজী নহেন। আর কবিমাত্রেই নিজের কবিতাতে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করেন। সুতরাং কবি নিজে যে প্রামাণ্যের উপরে আপ-নার কাব্যের সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা করেন, অপর কবির বেলায়, সে প্রামাণ্যের দাবী অগ্রাহ্য করিবেন কি করিয়া? মাইকেল "মেঘনাদবধ" রচনা করিয়া যে আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় "হেলেনাকাব্য" রচনাকালে তার চাইতে কম আনন্দ পাইয়াছিলেন এমন বলা কঠিন। হেমচন্দ্র "কবিতাবলী" লিখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, যে "মালঞ্চনিবাসিনী মধুসূদন সরকারস্য" কবিতা-পুস্তকের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র কষাঘাত পড়িয়াছিল, তিনি ঐ কবিতা রচনা করিয়া তার চাইতে অল্প আনন্দ পাইয়াছিলেন, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। আর কবির অন্তরের আনন্দানুভূতিই যদি তাঁর কাব্যের রসাত্মকতার বা কাব্যত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হয়, তাহা

হইলে মাইকেলের "মেঘনাদবধ" এবং আনন্দচন্দ্রের "হেলেনাকাব্য", হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী" এবং "মালঞ্চনিবাসিনী মধুসূদন সরকারস্য" কবিতাপুস্তক, সকলই তুল্য মূল্য হইয়া পড়ে। সে অবস্থায়, কবিতার রাজ্যে সম্রাটের আসনের সংকুলান হওয়া ত দূরের কথা, ডিমক্রেসীর বা গণতন্ত্রতারও কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ঘোরতর অরাজকতাই সে রাজ্যের একমাত্র সহজ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়।

স্বানুভূতি ও সত্য।

কি রসের রাজ্যে, কি সত্যের রাজ্যে, যেখানেই ব্যক্তিগত অনুভূতি বা স্বানুভূতিকে সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনে বসাইবে, সেইখানেই এই অরাজকতা অনিবার্য্য হয়। আমার নিজের অনুভূতি যদি, কোনও বস্তু যে আছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমার নিজের অনুভূতিকেই আমি সে মর্য্যাদা দিব না কেন? আমি স্থানুকে মানুষ বলিয়া দেখিতেছি। তুমি সেই স্থানুর কাছেই একজন মানুষ বসিয়া আছে, তাহাকে স্থানু বলিয়া দেখিতেছ। এক্ষেত্রে আমার স্থানুই মানুষ, না তোমার মানুষই স্থানু, ইহার বিচার করিবে কে? আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি মিথ্যা, এমন কথা বলিব বা মানিব কেমন করিয়া? তোমার প্রত্যক্ষ অনুভূতিই যে মিথ্যা তাহাই বা তুমি মানিবে বা আমি বলিব কিরূপে? অথচ কাছে যাইয়া দেখি, দু'ই মিথ্যা। এই মিথ্যা প্রমাণ করিল কে? ঐ অনুভূতি ভিন্ন আর কেউ নয়। তবে এই পূর্ব্বকার মিথ্যার মূল কোথায়, আর এখনকার সত্যেরই বা প্রতিষ্ঠা কি? পূর্ব্বকার মিথ্যার মূল—অনুমান; এখনকার সত্যের প্রতিষ্ঠা—প্রকৃতপক্ষে, বস্তু-সাক্ষাৎকারে। আমিও মানুষ দেখি নাই, তুমিও স্থানু দেখ নাই। আমি দেখিয়াছিলাম মানবাকৃতি-বিশিষ্ট একটা বস্তু। তুমি দেখিয়াছিলে স্থানুর আকারের মতন আকারসম্পন্ন একটা বস্তু। আর মানবাকৃতিবিশিষ্ট বস্তুটাকেই আমি সত্য মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। তুমি স্থানুর আকারকেই যথার্থ স্থানু বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলে। এই ধরিয়া লওয়াটা প্রত্যক্ষের কাজ

নহে, অনুমানেরই কাজ। প্রত্যক্ষ কখনও মিথ্যা হয় না, হইতেই পারে না। অনুমান সত্যও হয়, মিথ্যাও হয়। কিন্তু অনুমান সত্য না মিথ্যা, ইহা কেবল বস্তুপ্রত্যক্ষ দ্বারাই নির্ণীত হয়। অন্য উপায় নাই। আমরা যাহাকে সচরাচর প্রত্যক্ষ বলিয়া ধরিয়া লই, তাহাতে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দু'ই জড়াইয়া থাকে। আর এই জন্যই সত্য-বস্তু কেবল এই স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সেইরূপ আমার ভাল-লাগার বা আনন্দানুভূতির দ্বারা রসবস্তুরও প্রতিষ্ঠা হয় না। আমাদের সত্যের অনুভূতিতে যেমন প্রত্যক্ষ ও অনুমান দু'ই মিশিয়া থাকে, আনন্দের অনুভূতিতেও সেইরূপ বস্তু ও কল্পনা দু'ই মাখামাখি হইয়া রহে। আমি স্থানুকে কখনও মানুষ, মানুষকে কখনও স্থানু বলিয়া অনুমান করি। কিন্তু তাহাতে স্থানু মানুষ, কিম্বা মানুষ স্থানু হয় না। সেইরূপ আমি কোনও খাঁদামুখকেও সুন্দর বলিয়া দেখি। কিন্তু তাহাতে ঐ মুখের খাঁদাত্ব ঘুচিয়া যায় না। ফলতঃ, এই সুন্দর দেখার অর্থ এ নয় যে, লোকে যে মুখকে সুন্দর বলে, এই মুখ আমার চক্ষে তারই আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া উঠে; তার নাক আমার চক্ষে খাঁদা বোধ হয় না, কিন্তু "টিকাল" দেখায়; তার রং আমি কাল দেখি না, কিন্তু চাঁপার মতনই প্রত্যক্ষ করি। এই সুন্দর-বলার অর্থ এই যে, লোকে যাকে সুন্দর বলে তার সাক্ষাৎ-কারে চিত্তে যেসকল ভাব জাগে, এই মুখখানি দেখিয়া আমার অন্তরে তারই কতকগুলি ভাব জাগিয়া উঠে। সুন্দর মুখ দেখিয়া লোকের আনন্দ হয়; এই মুখখানি দেখিয়া আমারও আনন্দ হয়। সুন্দর মুখ একবার দেখিলে আবার দেখিতে সাধ যায়, বার বার দেখিয়াও দেখার সাধ মিটে না; এই মুখখানিও আমি যত দেখি ততই আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই আনন্দ ও এই আকাঙ্ক্ষা দুই ক্ষেত্রে দুই কারণে উৎপন্ন হয়। এক ক্ষেত্রে ইহা সৌন্দর্য্য বলিয়া যে বস্তু আছে, যাহা বর্ণে গঠনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গতে প্রকাশিত হয়, তার প্রত্যক্ষ হইতে জন্মে। অন্যক্ষেত্রে স্নেহ বলিয়া

যে ভাব আছে, যাহা অন্তরেই ফুটে, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। এই স্নেহও প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। অন্তরে জাগিলেও বাহিরে স্নেহের পাত্রকে ধরিয়াই এই স্নেহ অনুভবগম্য হয়। সে পাত্রের একান্ত অভাবে হয় না। আর সৌন্দর্য্য দেখার আনন্দও অন্তরেই ফুটে, কিন্তু অন্তরে জন্মিলেও বাহিরে সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিকে ধরিয়াই অন্তরের এই অনুভূতি জাগে, সে বস্তুর একান্ত অভাবে জন্মে না।

বস্তুতন্ত্রতা ও Realism.

সত্যের অনুভূতিই হউক, আর আনন্দের অনুভূতিই হউক, সকল অনুভূতিই বস্তুসাপেক্ষ, বস্তুসাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়, শূন্য হইতে জন্মে না। কিন্তু আজিকালিকার সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতেরাও এই বস্তু-কথা বুঝিতে বড়ই গোলে পড়িয়া যান। বস্তু বলিতে তাঁরা কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুকেই বুঝেন। অতীন্দ্রিয় বস্তুও যে বস্তু, এ কথা তাঁহাদের মনে থাকে না। আমাদের দেশে যাহারই অনুভব হয়, তাহাকেই বস্তু বলিয়াছেন। আনন্দের অনুভূতি হয় বাহিরের বিষয়-সাক্ষাৎকারে, এইজন্য এই বিষয় বস্তু। কিন্তু নানা বস্তুতে যে আনন্দ পাইল, তার রূপ অনেক। এসকল নানা রূপের ভিতর দিয়া আনন্দের নিত্য স্বরূপটি প্রকাশিত হয়। এসকল নানা-রূপ সেই স্বরূপের প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রতিবিম্বেই সচরাচর আমাদের আনন্দের অনুভূতি হয়। স্ফটিকে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাতেও সূর্য্যের অনুভূতি হয়। জলেতেও হয়, আবার দিবালোকেও হয়। কিন্তু এসকল ছাড়া সাক্ষাৎভাবে সূর্য্যকে দেখিয়াও সূর্য্যের অনুভব হয়। এই সূর্য্য সূর্য্যমণ্ডলে নিজস্বরূপে প্রত্যক্ষ হন। স্ফটিকাদিতে সেই স্বরূপের রূপমাত্র প্রত্যক্ষ হয়। আনন্দ সম্বন্ধেও তাহাই। আনন্দকর বস্তুতে আনন্দের রূপের অনুভূতি হয়; আবার ধ্যানযোগে আনন্দের নিজস্বরূপও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহাও অনুভবগম্য। সেইজন্য আমরা আনন্দকেও বস্তু বলি। স্নেহ, প্রেম, ভয়, বিস্ময় প্রভৃতিকে ইউরোপীয়েরা ভাব বলেন, বস্তু বলেন না। আমরা

এগুলিকেও বস্তু বলিয়া থাকি। রস-বস্তু বলিতে আমাদের কিছুই আটকায় না। ইহার অর্থ এই যে আমাদের অন্তরের অনুভূতিকে আমরা কোনও দিন কেবল মনগড়া বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। আর অনুভূতি বলিতে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে বিষয়ের অনুভূতি জন্মে, তাহাও বুঝি নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন জাগতিক রূপরসাদির অনুভূতি হয়, সেইরূপ আত্মার যে জ্ঞান-শক্তি আছে, যে-শক্তি প্রভাবে ইন্দ্রিয়সকলও আপন আপন বিষয়-গ্রহণে সমর্থ হইয়া আমাদিগের রূপরসাদির অনুভব সম্ভব করে, সেই জ্ঞান-শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত যে সকল সত্তা বা সত্য আছে, তারও অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ হইয়া থাকে। এই অনুভূতি কেবল এক জাতীয় নহে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিও আছে, অতীন্দ্রিয়ানুভূতিও আছে। এইজন্য আমাদের চিন্তায়, সাধনায়, ভাষায়, শাস্ত্রে, সাহিত্যে, জড়-বস্তুকেও বস্তু বলিয়াছেন, আর অতীন্দ্রিয় যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহাকেও ব্রহ্ম-বস্তু বলিতে কখনও সঙ্কোচবোধ করেন নাই। আত্ম-বস্তু, রস-বস্তু, আনন্দ-বস্তু, ব্রহ্ম-বস্তু,—এসকল শব্দের বহুল ব্যবহার আমাদের শাস্ত্র-সাহিত্যে আছে; সংস্কৃতেও আছে, বাঙ্গলাতেও আছে। কিন্তু এ কালের লোকে এই আস্তিক্য বুদ্ধি হারাইতে বসিয়াছেন। ঘোরতর দ্বৈতবাদী প্রাচীন খৃষ্টীয় সাধনা এবং প্রকাশ্য-বা-প্রচ্ছন্ন জড়-বাদী আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থের যেরূপ প্রত্যক্ষ হয়, অতীন্দ্রিয় আত্মপদার্থেরও যে ঠিক সেইরূপই প্রত্যক্ষ সম্ভব, একথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। আধুনিক ঈশ্বর-বাদীরা পর্য্যন্ত ঈশ্বরকে জ্ঞানের ভূমিরূপেই মানিয়া লন, এই ঈশ্বর যে প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য ইহা বস্তুতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন না। এইজন্যই কাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে বস্তুতন্ত্র শব্দের ব্যবহার দেখিয়া, আমাদের ইংরাজি-শিক্ষিত পারদর্শী পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত এই বস্তুতন্ত্রতাকে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বাস্তবতা বা realism শব্দেরই একটা নূতন বাঙ্গলা সংস্করণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, নানাপ্রকারের

কুটিল, কল্পিত তর্কজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাকে মুনিদিগের মতিভ্রমের মতনই মনে হয়। কারণ সংস্কৃতে ও বাঙ্গলায় বস্তু বলিতে যে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়পদার্থমাত্র বুঝায় না, একথা এত বড় পণ্ডিতেরা জানেন না, ইহা বিশ্বাস করা অসাধ্য। তাঁরা জানেন যে ব্রহ্মতত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অজড়, অবাঙ্‌মনসোগোচর।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, ন বিভেতি কুতশ্চন।

এই শ্রুতি তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে নিয়ত নৃত্য করে। ইহারই উপরে তাঁহাদের ঈশ্বরতত্ত্বের, ধর্ম্মতত্ত্বের, রস-তত্ত্বের সকল তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। আর এই একান্ত নিরাকার, নিতান্ত অজড়, অবাঙ্‌মনসোগোচর যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহাকেও এদেশের শাস্ত্রসাহিত্যে "বস্তু" বলিয়াছেন। এক লোকায়তগণই কেবল অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। আর তাঁহারাই কেবল বস্তু বলিতে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে মাত্র বুঝিতেন। এদেশে কেবল এক লোকায়তদিগের অভিধানেই বস্তুতন্ত্রতা আর আধুনিক ইউরোপের জড়াত্মক ও ইন্দ্রিয়াত্মক বাস্তবতা বা realism এক ছিল। এদেশের আর কোনও সম্প্রদায় এই কথার অমন কদর্থ করিতে সাহস পাইতেন না। অমন যে ঘোরতর নিরাকারবাদী শঙ্কর, তিনি পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে জ্ঞানমাত্রকেই বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তুসাক্ষাৎকারেই কেবল উৎপন্ন হয়, একথা বলিয়াছেন। শঙ্কর জ্ঞানমার্গের সাধক, জ্ঞানেতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। "জ্ঞানেনৈবমাপ্নুয়াৎ"—কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পরমবস্তুলাভ হয়; "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়"—মুক্তির আর অপর পথ নাই; এই সকল মহাবাক্যই শঙ্করসিদ্ধান্তের মূল। ব্রহ্মকে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই পাওয়া যায়, যে শঙ্কর এক-দিকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তিনিই আবার অন্যদিকে এই জ্ঞানের নিত্য-লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, তাহাকে বস্তুতন্ত্র, বস্তুর অধীন, বস্তুসাক্ষাৎকার হইতেই কেবল এই

জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, অন্য উপায়ে হয় না ও হইতে পারে না, এই কথা বলিয়াছেন। কাষ্ঠলোষ্ট্রের জ্ঞান কাষ্ঠলোষ্ট্রতন্ত্র, কাষ্ঠলোষ্ট্রের সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মতন্ত্র, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞান অনুভূতি পর্য্যবসায়ী—অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয়। "অনুভূতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং।" জড়-বস্তুর জ্ঞান জড়সাক্ষাৎকারে জন্মিয়া অন্তরে এই জড়ের পরিপূর্ণ অনুভূতিতে গিয়া শেষ বা পূর্ণ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জন্মিয়া, অন্তরে ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অনুভূতিতে যাইয়াই শেষ বা পূর্ণ হয়। এই ব্রহ্মও বস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানও বস্তুতন্ত্র। এ সকল সত্ত্বেও আমাদের বস্তুতন্ত্রতা আর ইউরোপীয়দের আধুনিক বাস্তবতা বা realism যে এক নহে, কখনওই এক হইতে পারে না, ইহাও কি আবার অত করিয়া বুঝাইতে হয়?

অনুভূতির প্রামাণ্য।

যাহার অনুভূতি সম্ভব, আমাদের দেশে তাহাকেই বস্তু বলিয়াছেন। এই অনুভূতি কেবল অন্তরের ব্যাপারও নহে, কেবল বাহিরেরও নহে। এই অনুভূতির জন্য প্রথমে একটা অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তুর আবশ্যক হয়। দ্বিতীয় এই অনুভূতির উপযুক্ত করণ বা যন্ত্র থাকা চাই। তৃতীয় যে অনুভব করিবে এমন একজন জ্ঞাতা বা ব্যক্তি থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ অনুভবের বিষয়, অনুভবের করণ বা যন্ত্র, এবং অনুভব-কর্ত্তা, এই তিন মিলিয়া তবে অনুভূতি ব্যাপার সাধিত হয়। এখানে কেবল কর্ত্তার উপরেই অনুভব নির্ভর করে, একথা বলিলে চলিবে কেন? কর্ত্তা থাকিতে পারেন, করণও থাকিতে পারে; কিন্তু বিষয় না থাকিলে, কোনও অনুভূতি জন্মিবে না। কলিকাতার পথে দাঁড়াইয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরও হিমালয়ের কিম্বা ভারত-সাগরের কোনও অনুভূতি জন্মিতে পারে না। আবার বিষয়ও আছে, কর্ত্তাও আছেন, কিন্তু করণ নাই, সেক্ষেত্রেও অনুভূতি জন্মিবে না। করণের অভাবে বধিরের শব্দের অনুভব এবং অন্ধের রূপের অনুভব

হয় না। তার পর, কর্ত্তাও আছেন, করণও আছে, বিষয়ও আছে; কিন্তু এই তিনের যথাযোগ্য সম্মিলন হয় নাই, সেখানেও সত্য অনুভূতি জন্মিতে পারে না। সেখানে যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, তাহার সঙ্গে পূর্ব্বপ্রত্যক্ষ ভিন্ন বিষয়ের অনুভূতির স্মৃতি মিশিয়া গিয়া, একটা মিথ্যা অনুভবের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন ভাস্করমূর্ত্তিতে মানুষজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, বা শুক্তিতে রজত-জ্ঞান। আর সত্য অনুভূতি মাত্রেই বস্তু-তন্ত্র, বস্তুর অধীন বলিয়া, সেই বস্তুর দ্বারাই এসকল ভ্রান্তির বা সত্যাভাসের প্রমাণ হইতে পারে, অন্য কিছুর দ্বারা হয় না ও হইতে পারে না। ভাস্করমূর্ত্তি মানুষের সকল লক্ষণ প্রকাশ করে না। মানুষের দেহগঠনের অনুভব মাত্রই এই মূর্ত্তি হইতে জন্মে। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে পূর্ব্বকার প্রত্যক্ষ মানুষের চৈতন্যাদি লক্ষণের অনুভব মিলাইয়া তবে এই ভাস্কর-প্রতিমাকে মানুষ বলিয়া ভাবিয়া লই। এখানে মানুষের দেহগঠনের অনুভূতিটুকু সত্য, কারণ এইটুকুই বস্তুতন্ত্র। কিন্তু এই দেহের মধ্যে সমগ্র মনুষ্য-ধর্ম্মটি রহিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ নহে, ইহা বর্ত্তমানের অনুভূতি নহে, পূর্ব্বকার অনুভূতির স্মৃতির আশ্রয়ে, ভাব-যোগে বা association বা ideasএ পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের পুনরুদ্দীপন মাত্র। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ যে ভাস্কর-মূর্ত্তি তাহার দ্বারা এই অনুভূতি সমর্থিত হইবে না। তাহাকে নাড়িয়া দেখিলেই দেখিব যে এ অচেতন পুতুলমাত্র, সচেতন মানুষ নহে। সুতরাং জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র একথা বলিলে, যে বস্তুকে ধরিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহার সত্যাসত্য সেই বস্তুর সমগ্রতার দ্বারাই কেবল নির্ণীত হইতে পারে; অন্য কোনও উপায়ে হয় না।

কবিতার প্রাণ যে রস তাহাও বস্তু। কারণ তাহাও অনুভূতিগ্রাহ্য। এই রসানুভূতির জন্যও প্রথমে বস্তু চাই, দ্বিতীয় করণ চাই, তৃতীয় কর্ত্তা চাই। জ্ঞান যেমন বস্তুকে ধরিয়া জন্মে, শূন্যকে ধরিয়া জন্মে না; সেইরূপ ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, করুণা, প্রীতি, প্রভৃতি রসও বস্তুর আশ্রয়েই জন্মে, বস্তু-আশ্রয় ছাড়া জন্মিতে পারে না।

যে বস্তু হইতে কোন বিপদের আশঙ্কা একেবারেই নাই, তাহাকে দেখিয়া ভয়ের অনুভূতি হয় না। যে বস্তু বীভৎস, তাহার সাক্ষাৎকারে প্রীতির অনুভব সম্ভবে না। শিশুকে দেখিয়া সখ্য বা সখাকে দেখিয়া বাৎসল্যের উদয় হয় না। এসকল অতি মামুলী কথা। কিন্তু রস-মাত্রেই বস্তু-তন্ত্র, ইহাতে এই মামুলী কথাটার বেশী কিছুই বলা হয় নাই।

ভাল-লাগার ইতিহাস।

আমরা যাহাকে ভাল-লাগা বলি, কবি যাহাকে আনন্দানুভূতি বলেন, তাহা একটা মিশ্র-অনুভূতি। কবিতা-বিশেষ লিখিয়া বা পড়িয়া যে আনন্দানুভব হয়, তাহাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি অতিশয় ওতপ্রোত হইয়া জড়াইয়া থাকে। কবির কাব্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, সৃষ্টিমাত্রেরই যে একটা আনন্দ আছে, কবি সে কবিতা রচনা করিতে সে-আনন্দ অনুভব করেন। শিশু যখন বর্ণ-মালা শিখিয়া প্রথম দিন, স্লেটে "বাবা" "মা" "কাকা" "দাদা" প্রভৃতি পরিচিত কথাগুলি লিখে, সে-দিন তার অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। ইহাতে তার নিজের কৃতিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে আনন্দিত হয়। অক্ষরগুলোর ছাঁদের ভালমন্দের সঙ্গে এ আনন্দানুভূতির কোনওই সম্পর্ক নাই। কবিও কবিতা রচনা করিয়া আপনার একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হন। কবিতার ভালমন্দের উপরে এ আনন্দ তখন নির্ভর করে না। সে বিচার অপরে করিবে। সে-কথা পরে উঠিবে। তখন লোকে মন্দ বলিলে তাঁর আনন্দের হানি হইবে, কারণ সে মন্দ বলাতে তাঁর কৃতিত্বের অভিমানে আঘাত লাগিবে। লোকে সে-কবিতা পড়িয়া ভাল বলিলে, তাঁর আনন্দ বাড়িয়া উঠিবে। কারণ সে ভাল-বলাতে লোকমধ্যে তাঁর কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতেছে এ-বোধ তাঁর জন্মিবে। তারপর সৃষ্টিমাত্রেতেই স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধি হয়। ইংরাজিতে এই আত্মপ্রকাশকে self expression এবং আত্মোপ-

লব্ধিকে self-realisation বলে। এই আত্মপ্রকাশের এবং আত্মোপলব্ধিরও একটা গভীর আনন্দ আছে। কবি কাব্যরচনায় এই আনন্দও অনুভব করেন। এই দুই প্রকারের আনন্দ সকল কবিরই হয়। ভাল কবিরও হয়। মন্দ কবিরও হয়। ইহার দ্বারা কোনও কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হয় না ও হইতেই পারে না, ইহা দেখিয়াছি। তার পর পাঠকের কথা। কবিতা পাঠে আমরা যে আনন্দ পাই তাহাও নানা কারণে জন্মে। যে কবিতায় আমাদের কোনও পূর্ব্বপরিচিত রসানুভূতিকে জাগাইয়া দেয়, তাহাতে আমরা আনন্দ পাই। আর আমাদের স্মৃতি নানা কারণে জাগিয়া উঠে। কিন্তু যে কারণেই জাগরুক হউক না কেন, প্রত্যক্ষের আশ্রয় ব্যতীত স্মৃতি জন্মে না। আগে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তার অনুরূপ কোনও কিছু দেখিলে, কিম্বা দেখিতেছি ভাবিলেই, সেই প্রত্যক্ষের স্মৃতি জাগরুক হইয়া উঠে। এক্ষেত্রে আমি বর্ত্তমানে যাহা শুনিতেছি বা দেখিতেছি তার পরিপূর্ণ মর্ম্ম না বুঝিয়াও, সেই পূর্ব্বস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া, গভীর আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। কিন্তু এই আনন্দ সত্য নহে, অধ্যাসজনিত। ইহার দ্বারা যে বিশেষ কবিতার আশ্রয়ে ইহা জন্মিয়াছে, তার উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে না। বৈষ্ণব মহাজনগণের ললিত পদাবলি শুনিয়া এক লম্পট ব্যক্তি অজস্র অশ্রুপাত করিতেছিল। কীর্ত্তন ভাঙ্গিলে তাহাকে প্রশ্ন করা হইল—"তুমি অমনভাবে আকুল হইয়া কাঁদিতেছিলে কেন, বল দেখি?" সে সরলভাবে বলিল, "আর কিছু নয়, কীর্ত্তনীয়া যখন 'বঁধু! বঁধু!' বলিয়া ডাকিতেছিল, তখন আমার একব্যক্তির কথা মনে পড়িয়া গেল, যে আমাকে ঐ ভাবেই ডাকিত।" এখানে এ ব্যক্তি বৈষ্ণব কবিতার যে রস গ্রহণ করিয়া কাঁদিল, তাহার দ্বারা সে সকল পদাবলির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে কি?

ফলতঃ এই ভাল-লাগা ব্যাপারটার, এই আনন্দানুভূতিটার অন্তরালে ভাল-মন্দ, সত্য-কল্পিত, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনেক কারণ বিদ্যমান

থাকে। সে-সকল কারণের অনুসন্ধান না-করিয়া, কেবল ভাল লাগে বলিয়াই, কোনও কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলিয়াই, কোনও কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। ইংলণ্ডের অনেক লোকের কিপ্‌লিংএর কবিতা ভাল লাগে; তাদের টেনিসন্ একেবারেই ভাল লাগে না। অনেকের টেনিস্‌ন্ খুবই ভাল লাগে; কিন্তু ব্রাউনিং তারা পড়িতেই পারে না। এক্ষেত্রে কেন কার কি ভাল লাগে, ইহা না জানিয়া, এই সকল কবির কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট বিচার করা যায় না। কিপ্‌লিংকে অনেক লোকে ভালবাসে, কারণ কিপলিংএর হাল্‌কা ভাবগুলি তাদের মনোমত, এগুলিকে তাহারা সহজে ধরিতে ও বুঝিতে পারে। টেনিসনের আভিজাত্যের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নাই; তাঁর শব্দ-সম্পদ এবং ভাবসম্ভার দু'এর কোনওটাই ইহারা ধরিতে পারে না। যাঁরা টেনিসন্‌কে ভালবাসে, তাঁরা বহুলপরিমাণে তাঁর ঝঙ্কারেই মুগ্ধ হইয়া রহে; ব্রাউনিংএর সে ঝঙ্কার নাই বলিয়া ব্রাউনিংএর কবিত্ব তাহাদের মনঃপুত হয় না। আবার হুইট্‌ম্যানের টেনিসনের আভিজাত্যও নাই, কিপ্‌লিংএর লঘুতাও নাই, ব্রাউনিংএর মার্জ্জিত রুচি (refined culture)ও নাই; এই জন্য অতি অল্প লোকেই তাঁর কবিতার রস আস্বাদন করিয়া থাকে। এইরূপে নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতাকে বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এইসকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা সত্য রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোন্‌টা অবান্তর বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত, ইহার দ্বারাই এগুলির কোন্‌টি কাব্যবিচারে গ্রহণীয় আর কোন্‌টিই বা বর্জ্জনীয় ইহার মীমাংসা হইবে। কেবল ভাল-লাগার বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হইতে পারে না।

একটি দৃষ্টান্ত।

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।

চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।

আমার নিকটে মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনা গীতি অপূর্ব্ব বোধ হয়। অমন মিষ্ট গীত, আমার মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও ফোটে নাই, কখনও ফুটিবে না। আর তোমার কানে ও প্রাণে—

যাই গো, ওই বাঁজায় বাঁশী
প্রাণ কেমন করে।
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে
মান-ভরে।

গিরীশ ঘোষের এই সঙ্গীতটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত বর্ষণ করে। তোমার বিবেচনায় অমন মিষ্ট গীত বাঙ্গলা ভাষায় কোনও দিন কেউ গায় নাই, কোনও দিন কেউ আর গাহিতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাতে তুমি কোনও রস পাও না। গিরীশ ঘোষের গানে আমিও কোনও রস পাই না। এ অবস্থায় এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট, বাস্তবিকই কাব্য-রসাত্মক, আর কোন্‌টি নয়, ইহার বিচার হইবে কিসে?

আমাকে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তবে বলিব যে তোমার প্রশ্নের ভিতরেই আমার বিচারের সূত্রটিও রহিয়াছে। "কোন্‌টি বাস্তবিকই মিষ্ট?" এই বাস্তবিক কথাতেই বিচারের সূত্রটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক মিষ্ট বলিবার সময়ই, এটা তুমি মানিয়া লইয়াছ যে যাহা মিষ্ট লাগে তাহা এক নহে, দুই জাতীয়;—এক বাস্তবিক; আর এক যাহা বাস্তবিক নহে, অর্থাৎ অবাস্তবিক। যাহার বস্তুত্ব আছে, তাহাই বাস্তবিক; যাহার বস্তুত্ব নাই, তাহাই অবাস্তব। সুতরাং তোমার নিজের কথাতেই, কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় না, এই মিষ্টত্বের অন্তরালে বস্তুত্ব থাকা চাই। এই বস্তুত্বের দ্বারাও কবিতার বিচার হইবে,

কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা নহে। কেবল বস্তুত্বে কবিতা হয় না। কেবল মিষ্টত্বেও হয় না। বস্তুত্বের সঙ্গে মিষ্টত্বের, মিষ্টত্বের সঙ্গে বস্তুত্বের মিলন যেখানে, সেইখানেই সত্য কবিতা জন্মে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতা মাত্রেই রসাত্মক এবং বস্তু-তন্ত্র।

সুতরাং কেবল মিষ্টত্বের দ্বারা কখনও কাব্যের ভালমন্দ বিচার করা চলে না। মিষ্টত্ব একটা অনুভূতি। অনুভূতি বলিলেই যে অনুভব করে এমন কোনও ব্যক্তি, আর যাহা তার এই অনুভবের বিষয় এমন কোনও বস্তু, এ দুইটিই বুঝায়। আর এই অনুভবের বিষয় দুই জাতীয় হইতে পারে, এক তাহা বর্ত্তমানে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত, দ্বিতীয় তাহা অতীতে কোনও সময়ে উপস্থিত ছিল, এখন অনুপস্থিত হইয়াও ভাবযোগে কিম্বা association of ideasএর সহায়ে মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অথবা স্মৃতি, এই দুই সূত্র ব্যতীত কোনও কিছু আমাদের সত্য অনুভবের বিষয় হইতেই পারে না। সত্য অনুভব যখন বলিলাম, তখন মিথ্যা অনুভব সম্ভব, ইহাও মানিয়া লইলাম। সে মিথ্যা অনুভব কি? তার উৎপত্তি কিসে ও স্থিতি কোথায়? ইহাও জানা প্রয়োজন। নতুবা সত্য মিথ্যার প্রভেদ করিব কিরূপে? সত্য অনুভব হয় বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ, না হয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিকে ধরিয়া। সুতরাং যে অনুভবের মূলে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষও নাই, আর পূর্ব্ব প্রত্যক্ষের স্মৃতিও নাই, সেই অনুভবকেই মিথ্যা বলিব। এই মিথ্যা অনুভবও আবার কোনও কোনও স্থলে একান্ত মিথ্যা, আর কোনও স্থলে বা সত্যাভাস হইতে পারে। মাকে বাবার বাহুপাশবদ্ধ দেখিয়া শিশু—"বাবা মাকে মারিতেছে"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শিশুর এ অনুভব সত্য নহে, কিন্তু সত্যাভাস। ভালবাসার জড়াজড়ি যে কি সে এখনও তাহা জানে না; জানিবে সখ্যের আস্বাদন যেদিন পাইবে সেদিন। এখন সে জানে মারামারিতেই কেবল জড়াজড়ি হয়। সুতরাং এখানে তাহাই সহজে কল্পনা করিল। অর্থাৎ এখানে

বাস্তবিক যে ভাবটা নাই, সে আপনার মন হইতে তাহাই তার উপরে চাপাইল। এ গেল এক প্রকারের মিথ্যা অনুভব। এ অনুভব একান্ত মিথ্যা নয়, আধখানা সত্য মাত্র। শিশুর নিজের অন্তরের অনুভূতিটা সত্য, বাহিরে তার আরোপটা কল্পিত। কিন্তু আর এক প্রকারের অনুভব আছে, যাহা আধখানা সত্য বা সত্যাভাসও নয়; যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আদ্যোপান্ত স্বকপোলকল্পিত। যে ব্যক্তি জন্মে কোনও দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, বরফপড়া কা'কে বলে তাহা, বা তার অনুরূপ কোনও কিছু দেখে নাই, কেবল শুনিয়াছে যে দুরন্ত শীতের দেশেই কেবল বরফ পড়ে; কেতাবে পড়িয়াছে যে এই বরফ যখন পড়িতে আরম্ভ করে তখন আশমান-জমীন যেন টুক্‌রা টুক্‌রা ফেন-পুঞ্জে ভরিয়া যায়। এই শোনা কথার উপরে সে তার মনে মনে বরফপাতের একটা মনগড়া ছবি আঁকিয়াছে। এই দৃশ্যের অনুভূতিটা নিতান্ত মিথ্যা; ইহাতে প্রত্যক্ষের লেষমাত্র নাই। ইহা অনুমান-প্রতিষ্ঠও নহে। কারণ অনুমান মাত্রেই প্রত্যক্ষের উপরে গড়িয়া উঠে। ইহা উপমানও নহে। কারণ একান্ত অপ্রত্যক্ষের উপমানও সম্ভবে না। ইহা উপমানের অনুমানের উপরে গঠিত। বস্তুর ছায়ার ছায়া, তস্য ছায়া মাত্র। ইহাতে বস্তুর চিহ্ন, সত্যের আভাসমাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর রসমাত্রেই যখন কোনও না কোনও বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ বা পূর্ব্বপ্রত্যক্ষের স্মৃতির আশ্রয়ে জন্মে, তখন যে রস এভাবে জন্মে না, তাহা কখনই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

এই কষ্টিপাথর দিয়াই সকল কবিতার বিচার করিতে হয়। আমার নিকটে মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাগীতি বেশী মিষ্ট লাগে। তোমার নিকটে গিরীশ ঘোষের "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী" বেশী মিষ্ট লাগে। এখানেও তোমার অনুভূতিই শ্রেষ্ঠ, না আমার অনুভূতি শ্রেষ্ঠ, ইহার বিচারও ঐ বস্তুর কষ্টিপাথর দিয়াই করিতে হইবে। নায়কের সঙ্কেতে তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য নায়িকার উদ্বেগই এই দুইটি

কবিতার বিষয়। এই উদ্বেগই এখানে বস্তু। এই উদ্বেগের অবস্থায়, নায়ক-নায়িকার যে সত্য অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি ও এই অনুভূতি যে আকারে তাঁহাদের আচার আচরণে, মুখের ভাবে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানাদিতে প্রকাশিত হয়, তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। বস্তু-লক্ষণ দিয়াই মধুসূদনের ও গিরীশ ঘোষের এই দুইটি গানের উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার হইবে, আমার বা তোমার কোন্‌টা কতটুকু ভাল-লাগে, বা না-লাগে, তার দ্বারা এ বিচার হইবে না। এই বস্তু-লক্ষণ দিয়া বিচার করিতে গেলেই দেখি, মধুসূদনের গানে এই সত্য, প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি একেবারেই নাই; আর গিরীশ ঘোষের গানেতে তাহা পূরামাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিদের অভিসারের কথা পড়িয়া, তার একটা স্বকপোলকল্পিত মানস-ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, ললিত শব্দ যোজনা করিয়া সেই ছবিটিই এখানে প্রকট করিতে গিয়াছেন। আর গিরীশ ঘোষের এসকল কেবল পড়া-কথা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। সুতরাং তাঁর গানেতে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই।

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!
রাধিকারমণ।

ইহাতে মধুসূদনের যে এ বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই, ইহা প্রমাণ করে। রাখাল বালকেরা গ্রামের মাঠের প্রান্তে গাছতলায় বাঁশী বাজাইয়া নাচে, মধুসূদন ইহাই দেখিয়াছিলেন। তারা যে বাঁশী বাজাইয়া প্রণয়ীজনকে আহ্বান করে না, একথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা-বিরহে অধীর হইয়া রাধিকাকে ডাকিয়া ডাকিয়া বাঁশী বাজাইতেন। আর রাধিকা আসিতেছেন কি না, তাই ভাবিতেন; কান পাতিয়া তাঁর নূপুরধ্বনি শোনা যায় কি না, অনুকূল বায়ু সে অঙ্গ-গন্ধ বহন করে কি না,—বাঁশী বাজাইতেন

আর তাই নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধানামে সাধা বাঁশী বাজাইতেন, আর সর্ব্বেন্দ্রিয়কে কেন্দ্রিভূত করিয়া শ্রীরাধিকা আসিতেছেন কি না তাই দেখিতেন। এ বাঁশী বাজে ধ্যানে, যোগে, সমাধিতে। এ অবস্থায় কোনও নায়ক বাঁশী বাজাইয়া তার তালে তালে নাচে না।

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে!—

শুনিলেই রাধিকারমণকে মনে পড়ে না, মনে পড়ে এক সাঁওতাল যুবককে, যে এককালে আমাদের উঠানে আসিয়া বাঁশী বাজাইয়া নাচিত। এক "নাচিছে" কথায়, মধুসূদন সব নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাখীরা কুঞ্জদ্বারে নাচিয়া আপনার প্রণয়ীকে ডাকে। কপোতী সন্ধ্যাকালে আপনার খোপের দরজায় নাচিয়া নাচিয়া আপনার সঙ্গীকে ডাকিয়া আনে। এ সকল সত্য। কিন্তু মানুষ ডাকে, নাচে না। সে ডাকে আর ধেয়ায়, ধেয়ায় আর ডাকে। ধ্যান নৃত্যের বিরোধী। কিন্তু আমি যখন "ব্রজাঙ্গনা" পড়ি, তখন এসকল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দসম্পদ। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে। এই ঝঙ্কারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ নয়, অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যা মিষ্ট লাগে, তোমার তাহা তেমন মিষ্ট লাগে না। তুমি ডাঙ্গায়, আমি জলে; এক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ অনিবার্য্য।

তবে এ মীমাংসার একটা পথ হয়, যদি কবিতার ভালমন্দের বিচারটা তোমার রসের রাজ্যে যাইয়া হইবে, না আমার ঝঙ্কারের রাজ্যে আসিয়া হইবে, এই কথাটা একবার দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মৃত্যু-স্বপ্ন

একদা আছিনু যবে নিদ্রা-ঘোরে হ'য়ে অচেতন,
দেখিলাম বিচিত্র স্বপন :—
জনক, জননী, জায়া শব-কায়া করিয়া বেষ্টন
হাহাকারে করিছে ক্রন্দন।

ছিন্ন-তার বীণা সম দেহ মম রয়েছে পড়িয়া
অযতনে ধূলির শয্যায়,
একে একে বন্ধুগণ ক্ষুণ্ণ-মন নীরবে কাঁদিয়া
চাহে তনু তুলিতে চিতায়।

মাতার রোদন-ধ্বনি আশেপাশে দীর্ঘশ্বাস সম
ভেসে আসে দূর কক্ষ হ'তে;
পাগলিনী প্রেয়সীর তপ্ত অশ্রু হিম অঙ্গ মম
পরশনে চাহে সঞ্জীবিতে।

অতীতের স্মৃতিগুলি দুলি' দুলি' লহরীর প্রায়
চিত্ত-তটে করে কোলাহল ;—
সমগ্র জীবন যেন চিত্রমাঝে জীবন্ত দেখায়
পর পর ঘটনা সকল।

প্রথমে পড়িল মনে শৈশবের সোনার স্বপন
হাস্যক্রীড়া-কৌতুক-মুখর ;
জড়া'য়ে জননী-কণ্ঠ অকুণ্ঠিত মর্ম্ম-নিবেদন,
মাতৃ-বক্ষ অমৃত-নির্ঝর।

তার পর ছুটাছুটি অন্তরঙ্গ বাল্যসখা সহ,
খেলাধূলা বহির অঙ্গনে ;
সামান্য কারণে কভু বন্ধুসনে বিষম কলহ,
ক্ষণপরে আগ্রহ মিলনে।

কৈশোরে কিশোর এক মিত্র পরে প্রগাঢ় প্রণয়,
হাসি, অশ্রু, বিরহ, মিলন ;
শয়ন অশন নিদ্রা এক সঙ্গে ; লিপি-বিনিময়
প্রাতে, সাঁঝে, মধ্যাহ্নে কখন।

বিবর্ত্তিত দৃশ্য-পট ; দেখা দিল কিশোরী কুমারী,
প্রাণ দিয়ে বাসিলাম ভাল ;
নাহি তায় কাম-গন্ধ ; অশ্রুজলে পূর্ণ প্রেম-ঝারি ;
শুধু তৃপ্তি, শুধু স্নিগ্ধ আলো।

তারপর মনে পড়ে চিতা-দীপ্ত শ্মশান তাহার,
হাহাকার হৃদয়-কন্দরে ;
গান-শেষে তান যেন ঘুরে, ঘুরে, কাঁদে অনিবার
থাকি, থাকি, গোপন অন্তরে।

ক্রমে মন্দীভূত যদি দুঃখ-নদী, তবু তার স্মৃতি
করুণায় বিগলিল মন ;
অসহায় নিরুপায় দীনজনে হৃদয়ের প্রীতি
বহি গেল স্রোতের মতন।

রোগ-জীর্ণ কতজনে বহি' বুকে আনিয়া আলয়ে
সেবা-রত রহি' নিরন্তর

ভুলিতে চাহিনু যত তার কথা,—কুটিল হৃদয়ে
তত তার করুণ অন্তর!

প্রকৃতির প্রতি পত্রে ছত্রে ছত্রে সে করুণ গাথা,
প্রতি ফুলে তারি দৃষ্টি হাসি;
শারদ-পূর্ণিমা রাতে, বর্ষা-প্রাতে আসে সে বারতা
জ্যোৎস্নালোকে, মেঘ-মন্দ্রে ভাসি'।

আত্মহারা হ'য়ে যবে এইরূপে আপনার মাঝে
বিরচিয়া বিরল ভুবন
আছিনু প্রতিমা-ধ্যানে নিমজ্জিত,—কি অপূর্ব্ব সাজে
নারী এক দিল দরশন!

নয়নে বিজলি-জ্বালা, বক্ষে তার মাধুরী-নির্ঝর,
লীলা-পদ্ম শোভে চারু ভুজে;
বাসনা-নূপুর পায়, পিপাসায় পূরিত অন্তর,
বালা বুঝি আমারেই খুঁজে!

মধু-লুব্ধ অলি সম রমণীর হৃদয়-কমলে
প্রেম-মধু না করিতে পান
মুগ্ধ নেত্রে নেহারিনু—কিবা শোভা সে বিচিত্র দলে,
বাহ্যরূপে মোহিল পরাণ।

না আস্বাদি' মধু-স্বাদ, হৃদি-পাত্র না করি' সন্ধান,
তনু-গন্ধে হইনু পাগল;
ডুবিনু রূপজ মোহে, অন্ধ আঁখি, আকুল পরাণ,
ষট্‌পদে পড়িল শৃঙ্খল।

আত্মহারা অবিবেকী ভুলে' গেনু সে প্রেম-প্রতিমা,
মুক্তি-দ্বার নারিনু লঙ্ঘিতে;
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কামনার গুঞ্জন-গরিমা
অধিকার পসারিল চিতে।

হায় লুব্ধ! হায় মুগ্ধ!—বাসনার অন্ধ কারাগারে
বদ্ধ-পক্ষ হইনু বিকল;—
থাকি, থাকি, স্বপ্নসম পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয় মাঝারে
উঁকি দিয়া করিত চঞ্চল।

বুঝিনু সে নহে মোর আজন্মের মানস-প্রতিমা,
সংসারের কুহক-মূরতি;
নয়নে নরক-জ্বালা, বক্ষে বহে গরল-কালিমা,
ভুজ-যুগে ভুজঙ্গ-বসতি।

বিবর্ত্তিত দৃশ্য-পট; বদ্ধ দেহ সংসার-কারায়
মৃত্যুমুখে হইল পতিত;—
অহো কি আনন্দ মরি! কারামুক্ত চিত্ত মোর ধায়
মায়া-পাশ করি বিদলিত!

স্বাধীন আকাশ-পথে মুক্ত বায়ু করিয়া সেবন
রবি-করে জুড়া'ল হৃদয়;
রুদ্ধ-শ্বাস তমো-পাশ চিত্ত আর না করে বন্ধন,
বন্ধ-জ্বালা স্মৃতিমাত্র রয়।

বুঝিনু—মরণ নহে চেতনার পূর্ণ অবসান,
শুধু মুক্তি জড়ের বন্ধনে;
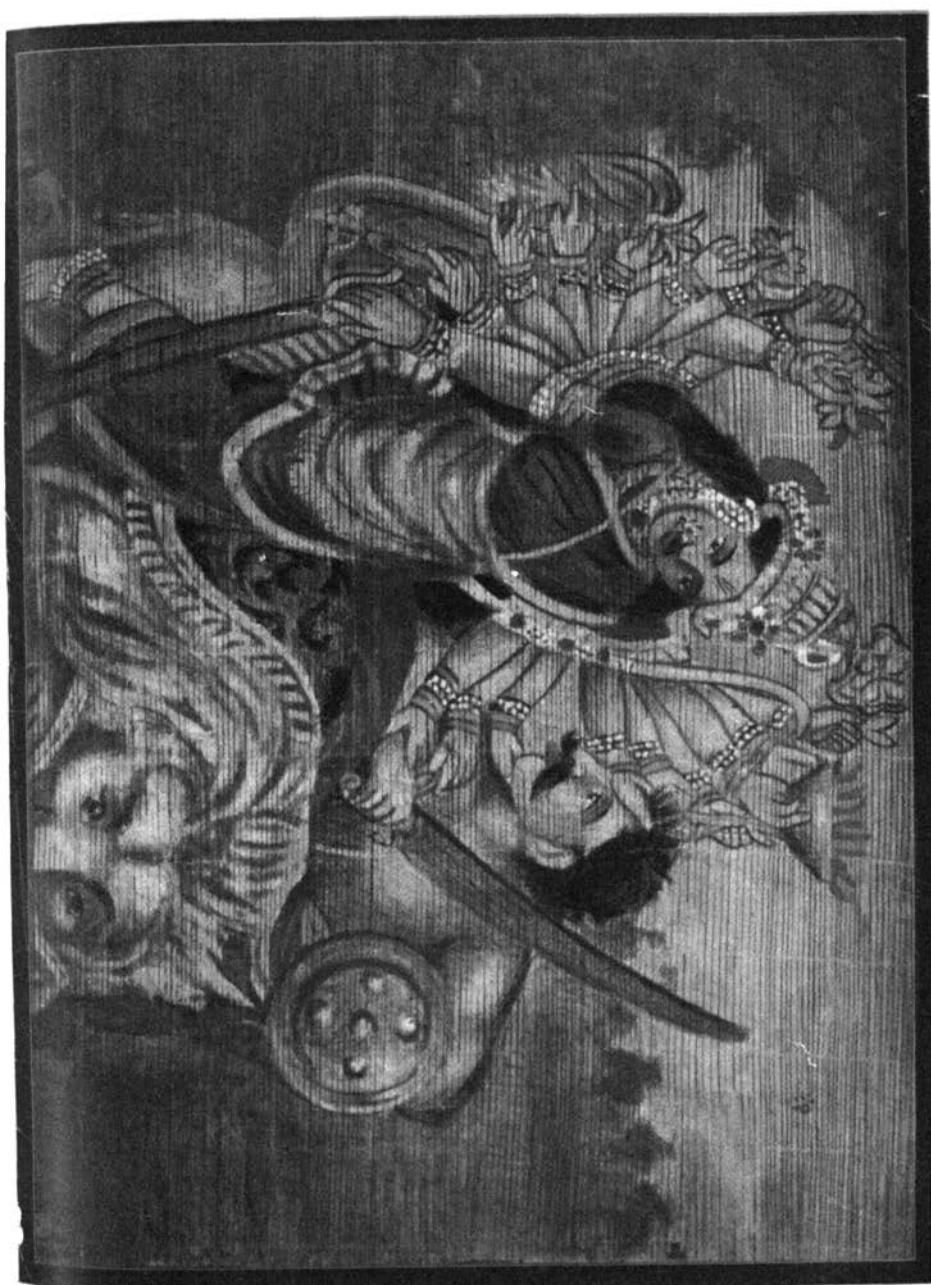
ওই যে পতিত শব প্রাণ-হীন, মোর পরিণাম
ও ত নহে—বুঝিলাম মনে।

বিস্ময়ে দেখিনু চেয়ে :—যেই দেহ পুড়িল চিতায়,
সে ত শুধু স্থূল আবরণ ;—
অতি সূক্ষ্ম সত্ত্বা মম ছাড়ি' তারে চলিল কোথায়
শূন্যপথে বিমুক্ত-বন্ধন !

সহসা ভ্রমণ-পথে ভাসমান দেখিনু প্রসূন,
কি বিচিত্র বর্ণ গন্ধ তার ;
সে অপূর্ব্ব পুষ্প হ'তে বাড়াইয়া বদন করুণ
চেয়ে আছে দেবতা আমার !

আবার দেখিনু চেয়ে :—মেঘ-গিরি-গুহার ভিতরে
ঝকিছে সে মাণিক আমার ;
দীপ্ত আঁখি-তারা যেন মেলি' মম বদন উপরে
দিব্যাঙ্গনা দেখে বার বার !

নয়ন ফিরা'যে দেখি—তরঙ্গিত জলধির তলে
শুক্তি হ'তে হইয়া বাহির
সে আমার মুক্তা-পরী সদ্য-সিক্ত টানি' নীলাঞ্চলে
ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিছে অধীর !

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখি—নাহি কিছু আর,
রাজে শুধু তাহার মূরতি ;
চাহি' পুন মোর পানে একি দেখি—প্রতি অণু তার
লভিয়াছে তাহে পরিণতি !

৫

তার পর চেয়ে দেখি—সারা বিশ্বে, জড়তার মাঝে
বিজড়িত তাহারি চেতনা ;
নাহি মৃত্যু, নাহি জন্ম, নাহি কাল, সেই শুধু আছে ;
আর সব কেবলি কল্পনা !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

দরদিয়া

[গল্প]

আমি ছিলাম বালবিধবা। তার উপর আমার রঙ্ ছিল অত্যন্ত কাল।

আমার আত্মীয়েরা যখন গল্পগুজব করিতেন, মধ্যাহ্ন-আহারের পর যখন সকলে তাস লইয়া নানারূপ আলোচনা সমালোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন, তখন তাহার মধ্যে আমার স্থান ছিল না। আমাকে থাকিতে হইত অতি দূরে দূরে।

যতকিছু খারাপের দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন হইলে, সকলে আমাকেই দেখাইয়া দিতেন এবং সকলেই তাহা অনুমোদন করিতেন। বিধবার ব্রতাদি কার্য্যবিধির একটু এদিক ওদিক হইলে সকলে 'মার মার' করিয়া ছুটিয়া আসিতেন। সকলে মিলিয়া আমাকে কাঠের পুতুল—আচার অনুষ্ঠানের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলিবার জন্য শশব্যস্ত। নিজের ইচ্ছা, নিজের ব্যক্তিত্ব এইরূপে লুপ্ত হইয়া গেল।

বাড়ীর সমস্ত কাজের ভার ছিল আমার উপর। সুতরাং অবসর আমার অত্যন্ত কম। কার্য্যের ভিতর আমি ডুবিয়া থাকিতাম। কিন্তু কার্য্যের ভিতর আমি শান্তি পাইতাম না। আর আমার কার্য্যেও কেহ বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না, সকলেই একটা না একটা খুঁত পাইতেন। সকলে মনে করিতেন কাজ আমি করিতে বাধ্য —আমি যে বিধবা! সেইজন্যই আবার আমার ভুল ত্রুটি একেবারে অমার্জ্জনীয়।

কখনও কাহার সহানুভূতি আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সকলে আমার নিন্দা করিয়াই মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতেন। ভাল কাপড় গহনা পরিয়া আমার সম্মুখে না ঘুরিলে তাঁহাদের তৃপ্তি

হইত না। আমার সাম্‌নে বসিয়া ভাল খাবার না খাইলে তাঁহাদের পরিতোষ হইত না। আমার দুঃখ কষ্টের দিকে কাহারও দৃক্‌পাত নাই, কেহই সেজন্য ব্যথিত নয়।

আমার কষ্টে কেবল একজন মাত্র অনুতপ্ত হইয়াছিল। তা'কে আমি কেবল একদিনের জন্য দেখিয়াছিলাম। সেদিন শরতের মধ্যাহ্ন। নীল আকাশে রজতশুভ্র মেঘগুলি খণ্ডে খণ্ডে ভাসিয়া চলিয়াছিল! পার্শ্বের ঘর হইতে তাসের 'বোলে'র সহিত পুরাঙ্গণাদের উচ্চ কলহাস্যধ্বনি ও বলয়-শিঞ্জনের শব্দ শুনা যাইতেছিল। একটা অশ্রান্ত কাক কোথা হইতে কা কা করিয়া মরিতেছিল। নিকটেই আমার পালিত বিড়ালটি রৌদ্রে পা ছড়াইয়া দিয়া আরামে নিদ্রামগ্ন। আমি শয়নকক্ষের বাতায়নটি খুলিতেই দেখি পথে সে দাঁড়াইয়া। তখন লোকের চলাফিরা কমিয়া গেছে। দ্বিপ্রহের প্রখর শান্তি চারিদিকে বিরাজিত।

তাহার মুখে কি একটা ভাব ছিল, আমি অবাক হইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। তা'র মুখখানির ভিতর আমি যেন সব পাইলাম। সব সাধনার সিদ্ধি, সকল কামনার পূরণ, সব চাঞ্চল্যের—সব বিগ্রহের শান্তি। জীবনে এমন ভাব ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আসে নাই। আমি আত্মহারা হইলাম। সেও আমার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। দুইজনের দৃষ্টি দুইজনার উপর নিবদ্ধ। মনে হইল আমাদের উভয়ের অনেকদিনের পরিচয়, অনেক দিনের আত্মীয়তা। কিন্তু কবে যে এই পরিচয় হইল তাহা মনে আসিল না। আমি দেখিলাম তাহার গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ভূতলে পড়িল।

কতক্ষণ যে আমি এইরূপ ভাবে বিভোর ছিলাম জানিনা।

সহসা পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "কি বউ, তোমার এই কাণ্ড?"

সর্পাহতের ন্যায় চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখি আমার মেজ ননদ পশ্চাতে দণ্ডায়মান। কখন যে তিনি চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। আমি কোন উত্তর না দিয়া স্থিরনেত্রে

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি উত্তর দিব কি ? আমি যে অক্ষমনীয় পাপে দূষিতা, আমি যে বিধবা। পরপুরুষের দিকে চাহিবার আমার অধিকার কি ?

আমাকে নীরব দেখিয়া ঠাকুরঝী, বলিয়া গেলেন ! "বউ, তুমি বিধবা মানুষ। তুমি কোথায় শুদ্ধাচারিণী হয়ে জপ তপ করবে, না তোমার এই কাণ্ড ? পরপুরুষের সঙ্গে দুপুর বেলা আলাপ করা ? লোকে বল্‌বে কি ? তুমি দেখ্‌চি আমার বাপের কুলের নাম ডোবালে ! আমি তথাপি নিস্তব্ধ; কিছু বলার শক্তি আমার তখন ছিল না। সে ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, মেজ ঠাকুরঝী তার চেহারা ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। তা'র নাম জান্‌বার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না। আমি পাষাণের ন্যায় অচল অটল রহিলাম।

আমার নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি অপ্রসন্ন মুখে প্রস্থান করিলেন, এবং ব্যাপারটিতে নানা রং দিয়া প্রচার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না। শীঘ্রই শুনা গেল, আমি ভর দুপুর বেলা গৃহমধ্যে এক অপরিচিত পুরুষের সহিত প্রেমালাপ করিতে-ছিলাম। চারিদিকে ঢিঢি পড়িয়া গেল।

এখন আমার কষ্টের একশেষ হইল। এখন উঠিতে বসিতে কেবল গঞ্জনা। আমি মেজ ননদের নজরবন্দী হয়ে রহিলাম। কিন্তু আমার মন আজকাল সর্ব্বদা নানাভাবে আলোড়িত। সর্ব্বদা তা'রই বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি মনে পড়িত, কষ্টে ও আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিত। আমার ভাব লক্ষ্য করিয়া, মেজ ননদ মাঝে মাঝে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষপাত করিতেন।

অনেক দিনের পর আজ কিছুক্ষণের জন্য ছাড়া পেয়েছি।

আজ আমার ছোট ননদের বিবাহ। উৎসবে আনন্দে বাড়া-খানি আমোদিত। মধুর নহবৎ ধ্বনি। বালকবালিকাগণের উল্লাস-চীৎকার। আত্মীয় স্বজনের সম্ভাষণ ও আলাপ।

বহুকাল পূর্ব্বের এইরূপ একদিনের অস্পষ্ট ছবি আমার মনে জাগরুক হইয়া উঠিল। আমি তখন খুব ছোট—সে আমি প্রায় সব ভুলিয়া গেছি,—কেবল নিশিশেষের স্বপ্নটুকুর মতন ভাসা ভাসা রকম মনে আছে। বর আসিয়া গিয়াছে। বরণ করিবার জন্য তাহাকে ভিতরে আনা হইয়াছে।

আমি দূরে অন্ধকারে এককোণে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এখানে আর কেহই নাই। আমি আজকের এই মঙ্গল উৎসবের দিনে অস্পৃশ্য—অশুচি। আমাকে সর্ব্বদা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া চলিতে হইতেছে, পাছে ভুলক্রমে কোন জিনিস ছুঁইয়া ফেলি—পাছে দৈবাৎক্রমে আমার সাদা তুতির একটুখানি স্পর্শে কোন জিনিস অপবিত্র হইয়া যায়। মঙ্গল কার্য্য হইতে আমার স্থান বহুদূরে—আমি যে বিধবা, আমি যে স্বামীহীনা।

সহসা ফিরিয়া দেখি সে একজন আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বল্‌ছে! তা'র সঙ্গে যে আমাদের এতদূর আত্মীয়তা আছে—যা'তে সে অন্তঃপুরে সচ্ছন্দে আসিতে পারে—তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। আমার মেজ ননদ সেদিন আমার দোষ ধরায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে তা'কে ভাল ক'রে দেখ্‌তে পান নি। তা'হলে জান্‌তে পার্‌তেন সে আমাদের অতি নিকট আত্মীয়।

তা'কে দেখে আমার সমস্ত শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দে কি বিস্ময়ে কি ভয়ে, স্থির করিতে পারিলাম না। আমাকে দেখিতে পাইয়া সে নিকটে আসিল।

আস্তে আস্তে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? চল ওখানে চল।" এই বলিয়া যেখানে বর বরণ হইতেছিল সেই মণ্ডপটি দেখাইয়া দিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। জিব্ কাটিয়া বলিলাম, —"সে কি? আমি যে বিধবা!"

—"তাতে কি? তুমি যে মানুষ। তুমি যে স্ত্রী হয়ে জন্মেছ! এর চেয়ে বেশী আর কি চাও?"

আমি কি শুনিলাম! আমি যে মানুষ আমি যে স্ত্রী হয়ে জন্মেছি। এত বড় কথাটা আমাকে আগে ত কেউ শুনায় নি! সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে নূতন মনে হইল। বিশ্বছন্দের ভিতর আমি অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিলাম। "তুমি যে মানুষ তুমি যে স্ত্রী হয়ে জন্মেছ।" ওঃ! আমি রমণী, আমি মানুষ। এই দুইকে কি আমার বৈধব্য একা বাধা দিতে পারে? আমার সকল বাঁধন দূর হইয়া গেল। আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন।

কতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিলাম জানিনা, হঠাৎ তা'র হাতের স্পর্শে সমস্ত শিরা উপশিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ হইল। কোমল স্বরে সে বলিল, "এখন তবে চল।"

বিহ্বল কম্পিত কণ্ঠে আমি বলিলাম, "চল।"

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অন্ধকারে

কেন মালা এমন ক'রে,
আপন হাতে পরাইলে ;—
তোমার ছোঁয়া ফুলের বাসে,
পরাণখানি মাতাইলে !

কেন সেই প্রভাত বেলা,
এমন স্থরে গাহিলে,
আমার এই হৃদয় মাঝে,
তারে তারে বাজাইলে !

আমি গরবে হ'মু সারা,
আমি সোহাগে মাতোয়ারা !

আজি এই আঁধার রাতে,
মালার ফুল শুকায়েছে,
তোমার সেই গানের সুর,
কোথায় জানি হারায়েছে !

চারি দিকে অন্ধকার !
সুর-হারা গানের ভার,
কঠিন এক শিলার মত,
চাপ্‌ছে প্রাণে অবিরত।

সুর হারাণ অন্ধকারে,
মরা ফুলের মালার ভারে।

———

আমার কথা।

কৃষ্ণদরশন লালসে, রাই উন্মাদিনী দেহপুর ছেড়ে বিচিত্র বিলাসযাত্রা করেছিল! তার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে জেনে, আর সে এ আবাসে ফিরে আস্‌বে না ভেবে, সে ছাড়া বাড়ীতে ভূতের দৌরাত্মি হবে ভয় করে, সকলে মিলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। মহামিলনের আনন্দ লয়ে, শ্যামসুন্দরের মহাপ্রাণে মিলিত হয়ে, সে যখন ঘরে ফিরে এল, তার কৃষ্ণবিলাসের দেহ আগুন পোড়াতে পায় নাই দেখে, আগুন আপ্‌নিতেই নিবে গেছে দেখে সে প্রাণভরে হাস্‌ল। কি? এ অঙ্গে আগুন? হে সর্ব্বভুক্! জঠরের জ্বালা নিয়ে, লোলজিহ্বা প্রসারণ করে তুমি গ্রাস কর্‌তে এসেছিলে কাকে? তোমার দাহিকা শক্তি আছে, সব দহন করে তুমি আত্মসাৎ কর্‌তে জান, তা আমি জানি। তুমি জাতবিদ্, তোমার অবিদিত কিছু নাই, তোমা হ'তে কিছু লুকিয়ে রাখ্‌ব সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্র, তুমি বিরাট রুদ্র। লোকে তোমার উপাসনা করে, ভয়ে তোমাকে প্রণাম করে, আমিও তা কর্‌তাম, তাই তোমার এ সাহস হয়েছিল। কিন্তু আজ তুমি তোমার লোলজিহ্বা সম্বরণ কর্‌লে কেন? তোমার জঠরের জ্বালা জুড়াবার সাধ মিটে গেল কেন? এ স্বর্ণপুরী পুড়ে ছাই কর্‌লে না কেন? তুমি তা পার্‌লে না? তোমার দুর্দ্ধর্ষ দাহিকা শক্তি সোনা থেকে গর্‌দা কেটে কেটে বের করে দিল, তখন সে খাঁটী সোনা হয়ে দাঁড়াল, দেখে তোমার গাত্রজ্বালা বাড়্‌ল। তুমি যে ইন্ধন অবলম্বন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলে, খাদ গলে গলে এসে তাতে পড়্‌ল, তোমার নির্ব্বাণ সাধন কর্‌ল। আজ দেখ সে পোড়া পুরীর একি অপূর্ব্ব কনক-কিরণ-কান্তি? এ যে দেবতার মন্দির হয়ে গেল! আজ দিব্য মাতৃমূর্ত্তি এ মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। বাহিরে

তার অলৌকিক আভা প্রতিভাসিত। এক শিব-সুন্দর-শিশু মায়ের কোলে। সেই মহামিলনের আনন্দ অন্তরে ধর্‌ল না, সে বহিঃ-প্রকাশ খুঁজ্‌ল, তখন সে উপ্‌চে পড়া আনন্দ, আকার ধরে এসে কোলে ঠাঁই নিল। আজ আমার বুকভরা আনন্দ, আজ আমার কোলভরা আনন্দের আকার! এদ্দিন শুধু অন্তরের আনন্দে যে মাতৃত্বকে উপলব্ধি করে এসেছি, আজ তাকে বাহিরের চোখে দেখ্‌ছি। আমি চোখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ছি আনন্দ, আমি চোখ বুজে বুঝছি আনন্দ! এ আনন্দের আকারে রাধারাণী নিজে? না এতে শ্যামসুন্দরের আবির্ভাব? না উভয়ের মিলিত ভাব? আমি যে দেখি শ্যাম সুন্দরকে, আমার আ-নন্দ-কুল-চন্দ্রমাকে! তোমরা কাকে দেখ আমি জানি না। এ বিগ্রহ আমার বিভ্রম ঘটাবে না ত? আমি যে আকারেই সব পাই! আমার আত্মাও যে আকারই নিল! বধূরূপ ছেড়ে মাতৃ-রূপ! বধূতে মোহ আপন মনোমোহনের, আর মায়েতে মোহ বিশ্ব-বিমোহনের, সন্তানের! গণ্ডী ছেড়ে ছড়িয়ে পড়া! আমার মনো-মোহন যদি অমনিতে বিশ্ববিমোহন হ'ত, আমি তবে তাকে চাই তাম না! জগন্নাথই যে রাধানাথ, রাধা তা বোঝে কৈ? তা শুন্‌লে সে কাঁদ্‌তে বসে! তাই সে চতুর নাগর এই বিশ্ববিমোহনরূপে সন্তানে আবির্ভূত। বিশ্বজন তার সন্তানে আকৃষ্ট হউক মা তাই চায়। সন্তানের প্রিয়জন, মায়ের প্রিয় দর্শন, মায়ের আকাঙ্ক্ষার বস্তু! সন্তানের স্তুতিবাদ শুন্‌তে মা উৎকর্ণ হয়ে থাকে! দেখ দেখ রসিকরাজের রসিকতা দেখ! সে কেমন কৌশলে আপনা বধূকে দিয়ে কি অসম্ভব সম্ভব করিয়ে নিল! বধূ তা টেরও পেল না! "কুলতিরপি বহুবল্লভঃ" কেমন স্বয়ং বহুবল্লভ হয়েও আপন বধূর চিত্ত কেড়ে নিল! কেমন বধূকে আপনা হাতে মা সাজিয়ে তাকে জগন্মোহিনী মাতৃরূপ দিয়ে, তার চক্ষের চাওয়া বদ্‌লে দিল, মনের বিকার শুধ্‌রে নিল! মা আজ সন্তানে আত্মহারা হয়ে, ডেকে ডেকে সকলকে এরূপে আত্মহারা হ'তে বল্‌ছে। এখানে হিংসা

নাই দ্বেষ নাই, বিবাদ নাই বিসম্বাদ নাই। যেখানেই সন্তানের আদর সেখানেই মা প'ড়ে। এই ত চাই! মনোমোহন যত যত মন ভোলাবেন, বধূ তার ততই আত্মগৌরব অনুভব করবে! আপনার জিৎ জানবে। সৌখ্য যা দিতে পারে না, বাৎসল্য তা এনে দেয়। তাই সময় বুঝে স্বরূপ না বদ্‌লালে, সে রূপ সনাতনের আঁচ পাবে কেমনে? জান না কি যে মাধুর্য্যরসের মাধুরীই এসে সময়ে মাতৃত্বে পৌঁছায়? বিশ্বশিল্পীর শিল্পচাতুরীই এই। কিন্তু সকল মা কি তা বোঝে? সকল মা কি তা দেখ্‌তে জানে? এই দেখ্‌ছনা কি যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী" হয়েও অজ্ঞান অবোধের মত তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তাকে জিজ্ঞাসা করতে "বল বল ওহে আমার বাঞ্ছিত! তুমি নিজেই বল, শিশুরূপে আমায় ভোলাতে এসেছ কেন? মন ত আগেই সখারূপে কেড়ে নিয়েছ, তাতে কি তৃপ্ত হও নাই? আমাদের মহামিলনের আনন্দের কি কিছু অপূর্ণ ছিল? এই বিশ্বচরাচর ডুবাইয়া তুমি দেখ্‌তে আমাকে, আমি দেখ্‌তাম তোমাকে। তুমি আমি ছাড়া এ জগতে আর কিছু ত ছিল না! কেন এই "কিছু" আন্‌লে? কেন আমাদের বিশ্ববিজয়ী মোহ ভাঙ্‌লে? শুধুই শ্যামসুন্দর এ সংসারে, শুধুই রাধাময় এ সংসার! সেই ত ছিল ভাল। তোমার সেই বিলাস রভস রূপ বিলোপ করে, কেন এই শিব শিশুরূপ ধরলে? কি? দুইএর দৃষ্টি এক করবার জন্যে? দুই থেকে দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে, একদৃষ্টে বল্‌তে যে রাধা, সেই মা যশোদা! আমি যে অজ্ঞ, আমাতে এ দৃষ্টি খুল্‌বে কি! কিন্তু রাধারাণীর শ্যামসুন্দর যশোদার নন্দদুলাল ত হয়নি! হে সন্তানবৎসল! এ তুমি কি করলে? সব উল্টে দিলে যে? মুগ্ধা মাতার মুক্তি কোথায়? সন্তানে খুঁজে আমি পাব কি বল? সে যে বড় ছোট, সে যে নিজেই অসহায় অকিঞ্চন! তুমি পূর্ণ, এ ক্ষুদ্রে আবদ্ধ থাক্‌তে পার কি? সব আমার ফাঁকি হয়ে যাবে না কি? তা নয়? এ ক্ষুদ্র হতেই আমার

মহত্ব লাভ হবে! অণুপরমাণু হতেই এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড? রমণীর দেবত্ব শিশুর উৎপত্তিতে? শিশু অসহায় তাই মা সর্ব্বাশ্রয়া ধরিত্রী? শিশু মা-গতপ্রাণ তাই মায়ের এ মহাপ্রাণ! শিশুর করুণ দুইটি চক্ষের আলোতে তিনি দেখ্ছেন বিশ্বম্ভরা মাতাকে, আর, মা দেখ্ছেন স্থষ্টিকর্ত্তা পিতাকে! ও সুধাকণ্ঠের "মা" ডাকে মা জান্‌ছেন জগজ্জননীকে? ও কচি হাতের সুখপরশে, মায়েতে সকল বুঝ আসে? তাই সন্তানের কাছে মায়ের মাথা নত! এখানেই মা খাট হয়ে পড়ে! স্বর্গের সিংহাসনে মা দেখে সন্তানকে তাহার শিক্ষাগুরুকে! সন্তান যে নিয়তই মায়ের শিক্ষাগুরু, মা তা মানে! তখন আকার অদৃশ্য হয়ে যায়, মা এই সন্তানের অস্তিত্বে সেই ভূমাকে প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হয়? আকারে আবদ্ধ আখরেই না অনঙ্গ-আত্মা অনুদিন অনুলিপ্ত? আমরা যে আখরের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাই। দেখি, ক্ষণে সে ক্ষুদ্র, ক্ষণে বিরাট, ক্ষণে ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণে অবিনাশী, ক্ষণে দেহধারী জীব, ক্ষণে বিদেহী শিব, ক্ষণে পুরুষ, ক্ষণে প্রকৃতি! ক্ষণে স্রষ্টা, ক্ষণে সৃষ্ট, ক্ষণে তৃষিত প্রেমভিখারী, ক্ষণে পরিপূর্ণ প্রেমের অধিকারী। আমি তার মহিমা বুঝিব কি? আমি তার মাহাত্ম্যের জানি কি? সে নিত্য নবলীলাকর, কখনও আমাকে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে, আপন অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা দেয়, কখনও বা আপনি দেবতা থেকে আমা হ'তে ভক্তি শ্রদ্ধা গ্রহণ করে। সেও যা, আমায়ও তা সাজায়, কেউ কম হলে হবে না। যে যজমান সেই যাজক। আমাদের মধ্যে নিরন্ত এই রঙ্গ তামাসা চলেছে। তোমরা এতে বিরক্ত হচ্ছ? তা হবারই কথা। এ সংসারে সবাই দেবতাকে দূরে রেখে ভক্তি করে, কেননা ভক্তিতে ভয় লেগে রয়েছে। আমার দেবতা তা চায় না। সে চায় মানুষের মত মাঝে মাঝে হাস্‌তে, মাঝে মাঝে কাঁদ্‌তে, মাঝে মাঝে হাসাতে, মাঝে মাঝে কাঁদাতে! কখনও দৈব শক্তি দেখ্‌তে, কখনও বা দেখাতে। মা যখন বাৎসল্য রসে গদ্গদ হয়ে

শিশুর মুখের পানে চেয়ে থাকে, আর শিশু মৃদুমধুর হাস্য করে, মা তখন সে হাসির তুলনা পায় না, "ঠাকুর" "ঠাকুর" বলে কোলের বাছাকে প্রণাম করতে চায়। সে যে মায়ের ঠাকুরের ঠাকুর। মাকে দিয়ে তার সকল কাজ করিয়ে নেয় সেই একরত্তি প্রাণী! মায়ের আহার নাই, নিদ্রা নাই! মায়ের চোখ দুটা থাকে শিশুর বিগ্রহের উপর প'ড়ে, আর তার প্রাণটা থাকে শিশুর এই মহাশক্তির মধ্যে বিহ্বল হয়ে! একেবারে হাত পা বাঁধা। আবার ইচ্ছামত কখনও বা অশান্ত উদ্ধত হয়ে, শত অপরাধ করে, মা হ'তে শাসন যেচে নিয়ে আপনি চোখের জলে ভাসে। কখনও বা লুকিয়ে থেকে ধরা না দিয়ে, মাকে নাকাল ক'রে মনে মনে হাসে। এমন করেই হেসে খেলে মাকে জব্দ রাখে। এক এক সময় ভারি ভড়কে যাই। ভাবি যদি এত ঘনিষ্ঠতায় অবজ্ঞা আসে, যদি তখন অভি-সম্পাৎ করে তখন কি হবে? ভয়ে ত্রাসে যেন গুঁড়িসুঁড়ি খেয়ে শিশুর শিশু হয়ে পড়ি। আর অমনি অকিঞ্চন জননীকে, তার মাতৃত্বে মহীয়সী করে, উঁচু করে তুলে ধরে মায়ের আপন স্বরূপ দেখায়ে দেয়। চেয়ে দেখি মা-মণির আলো এ মুখে! সে মণি মহার্ঘ্য মণি, সে মণি রাজার রাণীর মাথার মণিকে সে দিক করে। এ মণি চোরে চুরি করতে নারে। তাই খেতে শুতে চলতে বসতে মা, এ সকল মণির শিরোমণিকে সর্ব্বাঙ্গে ধরে।

আজ আমি মাতৃপদে অভিষিক্তা। এ পদগৌরবে আমার আপাদ মস্তক পুলকিত। আর বাঁকা করে কেউ আমার দিকে তাকায় না। সাক্ষাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। আমি আজ সম্ভ্রমনীয়া পূজ-নীয়া। এ পদগৌরব আমি রাখতে পারব ত? আমার অন্তরের নিভৃত কোণে বসে, কেগো তুমি গোপনে সন্তানের শুভকামনায় মাকে পরিতুষ্ট করছ? বধূর বেয়াদপি সব বিস্মৃত হয়ে, দেবদুর্লভ মাতৃমূর্ত্তি দেখতে ছুটে চলে এসেছ? যৌবন গতেও জরা নাই

এমন তুমি দেখ নাই, তাই দেখ্‌তে এসেছ? যৌবন যে যাবে, তার সঙ্গে যে মায়ের বনিবনোয়া নাই, সে ঘুষ্‌খোর দালালের দাবী যে, মা সইবে না তা তুমি জান্‌তে। কিন্তু জরা ত যৌবন ছাড়া জননীকে জড়িয়ে জড়িয়েই থাকে তুমি দেখে এসেছ, তবে এখানে তার দেখা নাই যে? তুমি তাই বুঝি ভাব্‌ছ! তবে শোন ওগো আমার দৃপ্ত "আমি"! যদি অনুগত জনের মত অবনত হয়ে, সেধে এসেছ, তবে সব রোধ্‌শোধ! থাক তোমরা সবাই থাক, দেখ তোমরা সবাই দেখ, আমার দেবতাকে দেখ আমার দেবত্বকে দেখ। যার প্রসাদে আমি বিগত যৌবনেও জরামুক্ত হয়ে, এক সত্য সনাতন সৌন্দর্য্যে মা সেজেছি! তাকে দেখ। এদ্দিন তোমরা আমায় একটা ভাব নিয়ে খেলা করতে দেখে এলে। আমি সেই খন্নেশে সে ভাবের ব্রশে, কি কর্‌তে যে কি কর্‌তাম, কি বল্‌তে যে কি বল্‌তাম, তোমরা আমার সঙ্গে পেরে উঠ্‌তে না। আমার ঘর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলে। আজ আর তুমি আমি নয়। আজ আর সে খোলা ভাব নয়, আজ "কোঽপি ভাব বন্ধনঃ" সে ভাবের গতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে? এই বন্ধনে আবদ্ধ প্রাণ বাধা পেয়ে ফুলে ফুলে উঠে, এ বাঁধ ভাসিয়ে দিয়ে আপনা পথ করে চলে যাবে বলে। তার বেগ সামলাবে হেন সাধ্য কার? সমতল ক্ষেত্রে পড়ে যখন গতি ঢিমে হতে চায়, তখন তার বেগ বাড়াবার এই ত পন্থা। গতি আছে অথচ তার বোধ নাই, এতে করে জীবনীশক্তি থাকে না, জীবন চলে না। গতি মন্দ হলেই তাতে বাঁধ বাঁধা চাই! তাই ত এই ভাব-বন্ধনের ব্যবস্থা! আর এই ভাববন্ধন তিনি নিজে সন্তানরূপে! আজ আমি নিবিড় করে এ বাঁধ বুকে ধরে তাকে ধরে রয়েছি। স্রোতের ঘা এসে আমার গায়ে পড়্‌ছে! হে আমার বন্ধনকারি! হৃদবিহারি! তবে এ বাঁধ ডুবায়ে আমার ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কি? এ বাহুপাশ হ'তে একে ছিন্ন করে ফেলে রেখে যেতে হবে কি? আমি যে তোমার বেগ দেখে বড় ভয় পাচ্ছি!

শান্ত সুধীরে এ'আবিল এ উদ্দাম কেন? তোমার ঐ শুভ্র ফেনিল অট্টহাসিতে আমার কান যে বধির হয়ে গেল?

এ'ত শার বালির বাঁধ নয় যে বেগের চোটে, খসে খসে ধসে পড়্বে? এযে মায়ের রক্ত জমাট হয়ে স্নেহরসে আঁট হয়ে রয়েছে। হে অগতির গতি! গতিতেই মুক্তি জানি। কিন্তু তোমার এ গতির বিধিতে কি সব ফেলে চলে যেতে হয়? তবে এ গতির মুখে এই বাঁধ, তুমি যারে আমার বুকে চাপিয়ে দিয়েছ তার করি কি? তোমার টানে যে আমার কোনই জ্ঞান থাকে না, আমাকে আন্‌মনা করে দেয়, "তবে রইল পড়ে বাঁধ, রইল পড়ে কুল, আমাকে চল্‌তেই হল, আমাকে চল্‌তেই হবে" বলে ভেসে যেতে বলে? তোমরা বিদ্রূপ কর্‌ছ, মায়ের এ গতি শোভন নয় বল্‌ছ? বাঁধে ভর করে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেতে পার ত যাও, নয় ত একে এঁটে ধরে থাক ডিঙ্গিয়ে যেওনা বল্‌ছ। তোমরা এ টান বুঝবে না তাই ওকথা কইছ। এ নদীর পরাণ বাঁধের বশ হতে পারে না—"সাগর যে সদা গো টানে নদীর পরাণ"। বাঁধ ত আমার উপলক্ষ্য মাত্র, গতির বেগ বাড়াবার জন্যে। বেগ যার বাঁধও যে তারি। সে যে দূরে থেকে তামাসা দেখ্‌ছে, কাকে ছেড়ে কাকে ধরি! ধরে ডুবেই মরি, না ভেসেই উঠি! বাঁধ আমায় ভাসাবে? না ডোবাবে? যদি মেলা আবর্জ্জনা এনে স্তূপীকৃত করে এ বাঁধের আকার বাড়াতে পারি, তবে তাতে ঠেকে গিয়ে, এ গতি শতধা বিভক্ত হয়ে ক্ষীণপ্রাণে চলৎশক্তি হারায়ে যাবে জানি। নগণ্য খাল বিল সরিৎ পতিকে পায় না, তাতে গিয়া পৌঁছায় না। কিন্তু আমি যে জননী জাহ্নবী। সাগরসঙ্গম আমার পরিণতি! আমি পূজার নির্ম্মাল্য মাথায় করে, প্রতিমার কাঠাম বুকে ধরে, তারি পানে ধেয়ে যাচ্ছি। কি ফেলে যেতে হবে, কি লয়ে যাব, সে ভাবনা তার। তারি জোয়ার-ভাঁটায় আমাতে জোয়ার-ভাঁটা খেল্‌ছে। ভাঁটার দিনে শুক্‌না টানে বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়ে আমার সব লুকানো জাহির করে

দিয়ে চলে যায়। তখন দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশে মৃতের মত পড়ে থাকি। আবার জোয়ারের দিনে, সোহাগের বানে আমায় ফুলিয়ে ফুলিয়ে, কূল ছাপিয়ে, কূল ছাড়িয়ে টেনে লয়ে চলে। আমি তখন আর কিছুরই দিশা পাই না আপনাতে থাকি না। তারি জন্যে বলছিলাম, তোমরা কূলে থেকে আমার এ টান বুঝ্‌বেনা।

আমি পুণ্যপিযূষবাহিনী স্রোতস্বিনী! দুকূলের সন্তান আমায় "মা" "মা" বলে ডাকছে, আমি তাদের ডাক শুনছি, কিন্তু তা বলে তাদের ডাকে আমি আমার অপারের টান ছেড়ে পারে এসে দাঁড়াই নি! আমি পাষাণী মা, আমি পাষাণের মেয়ে! আমার যোগা-যোগ ঊর্দ্ধে সেই শৈলেশ্বরের সঙ্গে, তারি বুকের রক্ত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। আমার বোঝাপড়া নিম্নে ঐ দুর্জ্জয় পারাবারের সাথে। এই দুইএর ব্যবধান ব্যাপিয়া চলেছি আমি, আমার কি আর এদিক্ ওদিক্ চাওয়া চলে?

আমি যে পিতৃগৃহে অরক্ষণীয়া হয়েছিলাম, তাই তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হতে তাড়া খেয়ে, পিতৃকুল ছেড়ে, ত্বরা করে শত সহস্র যোজন দূরে, আমাকে আস্‌তে হয়েছে এই আমার চরম গতির সাথে মিলিত হতে। তদবধি তারি জীবনে জীবন ধরি, তারি বুলি আওড়াই, তারি টান টানি। এটান ছিঁড়ে নিয়ে ছিটকে পড়্‌তে পায় না। এবে যাবৎ জীবন, তাবৎ টান! আর ছাড়াছাড়ি হবার যোই নাই, আর অপরাধ ঘটে না। তাই আমি জননী হয়েও সন্তানের কাছে ধরা দিচ্ছি না, সে আমায় আট্‌কে রাখ্‌তে পারছে না। কখনও কখনও যদিও বা এ টানের চোটে আমায় অপথ ধরিয়ে দেয় বটে, কিন্তু তখন মাথা খুঁড়ে মরলেও আমার এই দুর্ব্বিসহ আবেগ সইবার ভার সে সর্ব্বসহাও নেয় না, পায়ে ঠেলে আমায় ফিরিয়ে দেয়। এই ভাবে ধাক্কা খাওয়ায়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তবে সে আমায় আপনার করেই রেখেছে। তাই ভাবি গো মনে, কোথায়

আমার উৎপত্তি আর কোথায় আমার পরিণতি! এ টান পথের সম্বল না হলে, কবে ঝোঁপে ঝাঁড়ে পড়ে ম'রে থাক্‌তাম।

কিন্তু আজ কি জানি কেন আর শুধু এ যোগাযোগের টানে প্রাণ মান্‌ছে না। আর নয়নে নয়ন রেখে নয়নলোভনকে দেখা, পরশের প্রেরণায় পরশমণিকে ছোঁওয়া, রসের লালসে রসরাজে নেশা, সুরভির তাড়নায় তারি পিছু ছোটা, এসবে তার আর মন নাই। সে কেবলি বল্‌ছে, "আর নয় আর নয়, আর এসব নয়, আর যোগাযোগ নয়, মিলন নয়, আর আবেগ নয়, অভিসার নয়, ত্বরা নয়, আর আবদার নয়, অভিমান নয়, আদর নয়। আহ্বান নয়, এসো এসো নয়, বসো বসো নয়, আজ আর এসব কিছুই নয়।" আজ প্রাণটা চাইছে শুধু শব্দকে আশ্রয় করে থাক্‌তে, শুধু ডাক্‌তে! দূরে সরে, গলা ছেড়ে ডাক্‌তে, প্রাণখুলে ডাক্‌তে। সে ত কাছে থেকে হবে না, মিশে গেলে চল্‌বে না, চোখে থুয়ে পার্‌বে না! ডাক্‌তে হলে দূরে যাওয়া চাই, বিয়োগ ঘটান চাই, তার ভোগ ভোগা চাই। তবেই না ডাক খুল্‌বে, পরাণ পরশ কর্‌বে, তোমায় উন্মনা বানাবে।

একদিন বসন্তের নবীন পাখীও ডেকেছিল, বাসা ছেড়ে উড়ে গেছিল, সে বসন্ত সখার অন্বেষণে তারি সহ মিলিত হবার জন্যে! কিন্তু আজ সে নবীন পাখী মা-পাখী হয়ে, মিলনের মহাযোগ উপভোগ করে, পরের ঘরে ছানা রেখে, দেখ সে কেমন নির্বিকার, নিশ্চিন্ত মনে একা চলন, উধাও হয়ে উড়ে চলন, দূরে চলন সে শুধু ডাকবার লাগি। তার এ ডাক বিশ্বজনকে বিমোহিত করে, বিশ্বজনের মুগ্ধ মনের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেই বিশ্বেশ্বরের কাছে পৌঁছিবে কিনা সে তা জানে না। তার কাজ শুধু ডেকে যাওয়া, ডাকের মত ডাক ডাকা। তোমাদের অভিযোগ, সে বসন্তের পাখী বসন্ত নইলে, সে দেখা দিবে না, ডাক্‌তে আসবে না, মন মজাতে পার্‌বে না। তার দোষ কি বল? আপন আবেগ জানাতে কে না

মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা করে, শুভলগ্ন খুঁজে মরে? তাই বসন্তের ব্রহ্মমুহূর্ত্ত নইলে যে তার গলার আওয়াজ খোলে না, তাতে মিঠা রস মিলে না, বিয়োগের ভোগ বাড়ায় না। সে যে শীতের জড়-সড় ভাব, তাপের খরতর প্রভাব, জানাতে চায় না, জানাতে পারে না, সে তা আপ্‌নি গোপনে সয়ে লয়। বসন্তের সুমন্দ শীতল বাতাসে, যখন সবার মনে উল্লাস আসে, তখন তারও দিল্‌ খুলে যায়। তখন কেবল অবিরাম অফুরাণ ডাক্, ডাকের উপর ডাক্ "ন যত্র দুখং ন সুখং ন চিন্তা, ন-দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদ্ ইচ্ছা" সেখান থেকে ডাক্। তাই বসন্তের দিন তার বেরুবার দিন, গলা ছেড়ে ডাকবার দিন, ডেকে ডেকে প্রাণ জুড়াবার দিন। যদি জীবনের দোটানার দিনেও এম্‌নি করে বারে বারে বসন্তের আনাগোনা রাখ্‌তে পার; যদি বসন্তের মা-পাখী হয়ে, ছানা ছেড়ে, উধাও হয়ে উড়ে, তাপে পুড়ে, জলে ভিজে, হিমে জমেও, ফিরে এদিনে এসে, গলাছেড়ে ডাক্‌তে পার। যদি ডালে নাহি বস, যদি আশ্রয় নাহি চাহ, কেবল ডাকিতেই রহ, তবেই জানবে, তবেই কানে শুনবে ঐ তোমার "কুহু" "কুহু" "কুহু" ডাকই কেমন "তুঁহু", তুঁহু", তুঁহু" বোল্ বল্‌ছে। "তুমি" "তুমি" "তুমি", "তৎ-ত্বম্-অসি", "তৎ-ত্বম্-অসি" "তত্ত্বমসি"। তোমার সে ডাক্ শুনে দূর হতে দশকণ্ঠ মিলে, তোমায় ফিরে ডেকে ডেকে বল্‌ছে "কুহু" "কুহু" "কুহু", "তুঁহু" "তুঁহু" "তুঁহু", "তুমি" "তুমি" "তুমি" "তৎ-ত্বম্-অসি" "তৎ-ত্বম্-অসি" "তৎ-ত্বমসি" "সে তুমি নিজে"! তাই কি? ওরা মুখে বল্‌ছে "সোঽহম্"? এতকাল কত কি বিঘোরে ঘুরে ঐ যে বলে এলাম "তৎত্বম্", আজ কিনা বিয়োগের বিলাসে পড়ে, এই আপন ডাকেরি জোরে জান্‌লাম সোঽহম্। আর চাই কি? যোগ আর বিয়োগ,—মিলন আর ব্যবধান! এই দুইএর মহিমা জান্‌তেই, এজগতে জন্ম লয়েছিলাম। এই দুইকে জেনে আজ পরমানন্দ মনে তবে আমি চল্‌লাম। আবার ঘুরে ফিরে বসন্তের পাখী হয়ে দূরে

দূরে সরে, বিয়োগের এই বিলাস উপভোগ করতেই আসি, কি জন্মজন্মের তরে আপনা খোয়ায়ে সেই নাগরসঙ্গ সাগরসঙ্গই মাগি ; সে তখন আমার ইচ্ছে।

শ্রীমতী জগদম্বা দেবী।

গান

মিটাও না এই পিয়াসা,
এই তো আমার মিষ্টি লাগে,
ওগো বিরহি! চির বিরহি!
এ তৃষা যেন নিত্য জাগে।
মিলন আমি চাই না হে!
এই পিয়াসা যেন থাকে।
চোখের জলে এত মধু,
প্রাণবঁধু হে! প্রাণবঁধু!
মুছায়ো না চোখের বারি,
নাই বা এলে আঁখির আগে।
নাই বা হ'ল মিলন যদি,
এই বিরহ নিত্য জাগে।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

[৮]

সহজযান।

মহাযানমতে নির্ব্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া 'দশভূমি' অতিক্রম পূর্ব্বক শূন্যের উপর শূন্য, তা'র উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্ব্বাণ-পদ লাভ হয়। এত ত লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে ত 'সাংবৃত সত্য' বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং "পরমার্থ সত্য"কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্ব্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" বলিয়াছে—অতএব উহা 'অস্তি'ও নয়, 'নাস্তি'ও নয়, 'তদুভয়'ও নয়, 'অনুভয়'ও নয়। তবে উহা কি?—অনির্ব্বচনীয় রূপ। কিন্তু উহার ধারণা ভাবরূপে হয়, অভাবরূপে নয়—ইংরাজীতে বলিতে গেলে 'Positive', 'Negative' রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে ঐ অবস্থায় শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও 'ভাব'। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্ব্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোন জিনিসই নাই।

সহজধর্ম্মের অনেক বই বাঙ্গলায় লেখা। হওয়াই উচিত। যদি নির্ব্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন করা কেন? বাঙ্গলায় বলিলে উহা ত আরও সহজ হইবে। তাই

তাঁহারা বাঙ্গলাতেই সহজধর্ম্ম প্রচার করেন। সরহপাদ বাঙ্গলায় বলিলেন ;—

অপণে রচি রচি ভব নির্ব্বাণা,
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা।
অম্ভে ণ জানহু অচিন্ত জোই—
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীয়ন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো।
জা এথু জাম মরণে বিশঙ্কা
সো করই রসরসামেরে কথা॥

লোকে বৃথা আপনা-আপনি সংসার ও নির্ব্বাণ মনে মনে রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি অচিন্ত্যযোগী—আমি জানি না জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ; জীয়ন্তে ও মরণে কোনই বিশেষ নাই। জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

ভাদেপাদের কথা এই ঃ—

এতকাল হাঁউ আছিলেঁ স্বমোহেঁ
এবে মই বুঝিল সদ্‌গুরু বোহেঁ।
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা—
গঅণ সমুদে টলিআ পইঠা॥
পেখমি দহদিহ সর্ব্বই সূন
চিঅ বিহুন্নে পাপ ন পুন্ন।
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ
চিঅরাঅ মই অহার কএলা॥

এতকাল আমি আমার মোহেতেই ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টলিয়া গগন-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি দশদিক্‌ সকলই শূন্য। চিত্তই যখন নাই, তখন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছি। ভাদেপাদ বলিতেছেন, ভাগ ত নাই, আমি আমার চিত্ত-রাজকে আহার করিয়া ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে 'নিঃস্বভাব' করিয়াছি।

এই দুইটি গান হইতে আমরা কি বুঝিতে পারিতেছি? যখন সবই শূন্য—তখন উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই; জন্মও নাই, মরণও নাই, সংসারও নাই। 'চিত্ত' 'চিত্ত' বলিয়া যে পদার্থ আছে বল, তাহাও ত শূন্যসমুদ্রে পড়িয়া মিশাইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব, তখন আমার চিত্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কি? আমি যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবনা ভাবিতেছিলাম, তত দিন আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম। ঠিক্‌ গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ পাইয়া, আমি বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ নাই। আমি চিত্ত-রাজকে 'আহার' করিয়া ফেলিলাম।

যোগাচারমতে যেমন—কিছুই থাকে না বিজ্ঞানমাত্র থাকে, সহজ-মতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনও বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষসংযোগজনিত সুখ। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে—নীচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্য আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া "নিঃস্বভাব" হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা—সদ্‌গুরুর উপদেশ।

এই যানের কথা :—

> ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকম্।
> নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ॥ [শ্রীসমাজতন্ত্র]

বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্ব্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্ব্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্ব্বাণের চরম ফল, যে নির্ব্বাণে আর 'বিবর্ত্ত' থাকে না, অর্থাৎ, কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

গুরুর কথা শুনিলে, তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিবে। [বজ্রজাপ।]

গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পারা যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি না। সে সুখে তন্ময়তা লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ হইয়া থাকে।

[সরহপাদপ্রবন্ধ]

সে গুরুকে আমরা বজ্রগুরু বলি কেন? বজ্র বলিতে শূন্যতা বুঝায়। যোগরত্নমালায় লিখে—

> দৃঢ়ং সারমশৌষার্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
> অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে॥

শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাতে ছেঁদা করা যায় না—উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয়, সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা।

শ্রীসমাজতন্ত্রে বলিতেছেন—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা।
দুঃখাদ্বিক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা॥

যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক হইবে, ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে। দুঃখ উপস্থিত হইলে, মন স্থির থাকিবে না, মনস্থির না থাকিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না।

হেবজ্রতন্ত্রেও বলিতেছে—

রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ॥

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানিত না, অর্থাৎ, অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা জানেনা, আমরা, সহজপন্থীরাই, কেবল জানি।

আবার শ্রীসমাজ বলিতেছেন ঃ—

পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম বলে। সেই পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।

সরহপাদ বলিতেছেন :—

অনুত্তরচিন্তাকুরকো বিষয়রসৈর্যদি ন সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে॥

যখন চিত্ত অল্পে অল্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিত্তরূপ ছোট অঙ্কুরটির গোড়ায় বিষয়রস যদি না সেক কর, কেমন করিয়া সেই অঙ্কুর কল্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে?

এই সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে, যে যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ কর।

পঞ্চকাম উপভোগ ত সকলেই করে। তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম্ম কেন? সে ত সকলে আপনা হইতেই করে? তাহার জন্য আবার গুরু কেন? একটু আছে। মানুষ-মাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন, যে সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজীয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। তাই দারিকপাদ বলিলেন :—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠান মহাসুখলীলে দুলখ পরমনিবাণে॥
দুখেঁ সুখেঁ একু করিআ
ভুঞ্জই ইন্দিজানী।
স্বপরাপর ন চেবই
দারিক সঅলানুত্তরমানী॥

অরে বালযোগি, তোর মন্ত্রেই বা কি? তন্ত্রেই বা কি? ধ্যানেই বা কি? ব্যাখ্যানেই বা কি? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্ব্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ। তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা

করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ কর। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার আত্মপর বোধ নাই।

তিনি এই সঙ্গেই আবার বলিতেছেন—

রাআ রাআ রাআরে অবররাঅ মোহেরা বাধা।
লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুবণেঁ লধা॥

আর যত রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরমসুখ লাভ করিয়াছেন।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজীয়াদের কি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে।

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঽস্তর্বিশতীব চ।
নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্চ্ছিতঃ॥

শরীর যখন সৎসুখে মূর্চ্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়া পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই যে পঞ্চকামোপভোগ—ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? সে বিষয়ে অনুত্তরসন্ধিতে এই কথাটি দেখা যায়।—

সর্ব্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।
জ্ঞানত্রয়প্রভেদোঽয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে॥

সকল মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়াই বড়। ইহাতেই তিনটি জ্ঞানের যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটি জ্ঞান—প্রথম তিনটি শূন্য। সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় এবং বিরমানন্দ রূপ যে চতুর্থ শূন্য তাহা পাইতে পারা যায়। এই চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। ইহাতেই নিরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিত্ত মহাসুখে লীন হয়।

সবরপাদ বলিতেছেন :—

তইলা বাড়ীর পাসেঁর জোহনা বাড়ী তাত্রলা।
কিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিলা॥
কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অনুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুখে ভেলা॥

তৃতীয় বাড়ীর (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ী বলিতে শূন্য বুঝাইল) পাশে জ্যোৎস্না বাড়ী বা জ্যোৎস্না শূন্য। সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সর্ব্বদা উদিত। সেখান হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে। সেখানে কাঁকুড় পাকিল না (সন্ধ্যাভাষায় কাঁকুড় শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী সুখ; পাকিল না, অর্থাৎ শেষ হইল না। অর্থাৎ, সুখই রহিল।) শবর ও শবরী (বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবী) উন্মত্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শবরের জ্ঞান—চৈতন্য কিছুই রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে মত ইহা সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায়, সহজীয়ারা তাহাই দিল; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগ-রাগিণীতে এই সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কি কি যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তাহাদের খোল করতাল ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে একতারা ছিল বলিয়া জানা যায়—প্রমাণ—বীণাপাদ বলিতেছেন ;—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী।
বাজই অলো সহি হেরুকবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা॥

সূর্য্য হইলেন লাউএর বস্—অর্থাৎ পাকা লাউএর শক্ত খোলা, তাহাতে চাঁদ, তাঁত বা তন্ত্রী লাগিল, অনহা অর্থাৎ অনাহতকে দণ্ড করা হইল ও অবধূতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়ালা হইল। হে সখি ঐ শুন হেরুকের বীণা বাজিতেছে। আর সেই তন্ত্রীধ্বনিতে শুনিয়া ও করুণা বিলাস করিতেছে।

এই যে বীণাধ্বনি ইহা একরকম music of the sphereএর মত, অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মত। মিউসিকে যে বীণাধ্বনিতে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বীণাধ্বনিতেও ত্রৈধাতুকময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল।

তাহারা পটহ বা ঢোল বাজাইত :—

বেটিল হাক পড়থ চউদিশ [ভুসুকুর গান]

তাহারা ডমরু ব্যবহার করিত, মাদলও বাজাইত :—

অণহা ডমরু বাজএ বীরনাদে [কৃষ্ণাচার্য্য]

ভবনিব্বাণে পড়হ মাদলা
মণ পবণ বেণি করণ্ডকশালা [কৃষ্ণাচার্য্য]

তাহাদের দুন্দুভি ছিল।

জঅ জঅ দুন্দুভি সাদ উছলিআঁ
কাহ্নু ডোম্বী বিবাহে চলিআ [কৃষ্ণাচার্য্য]

তাঁহারা যে সকল রাগে গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সঙ্কীর্ত্তনে চলিতেছে।

যথা :—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাডী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারি, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্ত্তারা সন্ধ্যাভাষায় গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলো-আঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। ইহাকে রূপক বলিতে চাও, বল।

কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখন বিবাহ বলিতেছেন, কখন তরুলতা সাজাইতেছেন, কখন হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখন দুধ-দোহা বলিতেছেন, কখন বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন বা নদীর উপর সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন শূন্য ও করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখন গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখন ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে নানা অলঙ্কারে তাঁহারা সহজমত নানাদিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যাঁহারা গান লিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্ত্তা এবং তাঁহাদের গানের নাম পদ। বৌদ্ধ সঙ্কীর্ত্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্ত্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখিতেন তাহার নাম চর্য্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্য্যাপদ ছাড়া আরও পদ লিখিতেন—যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশ পদ বা উপদেশগীতিকা।

তখন অনেক বড় বড় লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশাও বাঙ্গলায় গীতিকা লিখিতেন। যে রত্নাকর শান্তির নামে আর্য্যাবর্ত্তের দার্শনিকেরা ভয় পাইতেন, তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙ্গালী বৌদ্ধ ত গীতিকা লিখিতেনই, এতদ্ভিন্ন আসামী, উড়িয়া ও মৈথিলেরাও গীতিকা লিখিতেন। সহজ ধর্ম্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাঙ্গলায় বাজিল বজুল ও বজ্রগু বলিত। লোকে মনে করিত ইহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা দাড়ীগোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড় বড় চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা, তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াই-

তেন। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য্য বলিত। তিব্বতদেশে এখনও সিদ্ধাচার্য্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্য্যের মূর্ত্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ সিদ্ধাচার্য্যদের আদি, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। লোকে বলে সর্ব্বশুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। লুইএর বাড়ী বাঙ্গলাদেশে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিব্বত দেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটা খাইতে ভাল বাসিতেন, সেই-জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্ম-ঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইএর উদ্দেশে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। লুইএর পূজার দিন তাহারা সেই পাঁটা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেনবাবু বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকু রাঢ় বলে, সেখানেও লুইএর পূজা হইয়া থাকে। লুইএর বংশে আরও কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন, এবং বাঙ্গলায় গান লিখিয়াছিলেন।

এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্য্যেরা যদি তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়াধারীদের যেমন অনেক চেলা থাকে সেইরূপ সিদ্ধাচার্য্যদেরও অনেক চেলা ছিল, যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাঙ্গলার কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কি না খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সিদ্ধাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্ত্তা ছিলেন। একে ত তাঁহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায়, তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে, গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই ত শূন্য—সংসারও শূন্য,

নির্ব্বাণও শূন্য—তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র।

এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেল। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ কর। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদি-তেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভাল হয় নাই, তাহা ত আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কি পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড় উপকার করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গ-বাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইঁহারা যে সহজ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম্ম এখনও চলিতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজীয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজীয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পুঁটুর বাপ

পুঁটুর মায়ের অনেক বয়স অবধি সন্তানাদি হয় নাই। সন্তান-কামনায়, নানাবিধ ব্রত উপবাস করিয়া, ও অসংখ্য মন্ত্রপূত মাদুলী ও কবচ ধারণ করিয়াও, সে সন্তান-লাভাশায় যখন প্রায় নিরাশ-চিত্ত হইয়াছে, তখন মা ষষ্ঠী মুখ তুলিয়া চাহিলেন,—সে পুঁটুকে কোলে পাইল। পুঁটু এ পৃথিবীতে আসিয়া যে আদর অভ্যর্থনা পাইল, বুঝি রাজারাজড়ার সন্তানও তাহা পায় না। বিমল সন্তান-স্নেহ ধনী দরিদ্রের হৃদয়ে সমান ভাবেই বিরাজ করে!

পুঁটু দেখিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। দরিদ্রের গৃহে এত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া যাইত। বাপ মা আদর করিয়া নাম রাখিল "পুঁটুরাণী"। ছয় মাসের পুঁটুরাণী যখন তাহার কোঁকড়া চুলের মধ্য হইতে কালো চোখ দুটি তুলিয়া, বিস্মিত নেত্রে সকলের পানে চাহিত, তখন কেহই তাহাকে আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না।

পুঁটুর বাপ বাবুদের বাড়ী কাজ করিতে যাইত, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকিত তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে। সন্ধ্যা হইলে গৃহের জন্য, পুঁটুর জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত। সে কতক্ষণে গৃহে যাইবে, কতক্ষণে পুঁটু "বাবা" "বাবা" বলিয়া তাহার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, কতক্ষণে সে পুঁটুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উঠানে হাঁটিয়া বেড়াইবে, পুঁটু ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, সে কি রকম করিয়া, কতক্ষণ ধরিয়া, সে ঘুমন্ত মুখের শোভা বসিয়া বসিয়া দেখিবে, ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইচ্ছা হইত তখনই ছুটিয়া গৃহে যায়! যতই দিন যাইতে লাগিল, পুঁটু সম্বন্ধে হৃদয়ের এই দৌর্ব্বল্য ততই তাহাকে পাইয়া বসিতে লাগিল। তাহার আর কাজে মন লাগে না,—আর কাজ-কর্ম্মে নানা অনব-ধানতার জন্য সে প্রায়ই প্রভুর নিকট ভর্ৎসনা পাইতে লাগিল।

দিনগুলিও যেন ক্রমেই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া তাহার সহিত শত্রুতা সাধন করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিপ্রহরে, বাবুদের বাড়ীর খানসামাদের গৃহে যাইবার নিয়ম ছিল না। বাবুদের কখন কাহার কি দরকার হয়, বড় মানুষের মেজাজের ত ঠিক নাই! পুঁটুর বাপ কিন্তু প্রায়ই এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিল। সে আহারাদির পর বিশ্রাম না করিয়া, লুকাইয়া মাঝে মাঝে ঘরে আসিতে লাগিল। রামচরণের বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন তাহার কুটীরে আসিয়া তাহাকে দেখিলে, আর কেহ তাহাকে পূর্ব্বের সেই ভব্য সভ্য গম্ভীর রামচরণ বলিয়া চিনিতে পারিবে না। সে এখন ঘরে আসিয়া, পুঁটুকে লইয়া, হাসে খেলে নাচে। কখনও সে পুঁটুকে কাঁধে করিয়া পাড়ার ঘরে ঘরে বেড়ায়। সকলেই পুঁটুর সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করে, তাহাতে সে বড় আনন্দ পায়। কখনও সে ঘোড়া হইয়া, চার হাত পায়ে উঠানময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আর পুঁটু তাহার মুখে রাশ দিয়া, "হেট্" "হেট্" করিয়া, টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে তাহাকে চালায়। আবার কখনও সে পুঁটুকে বুকে লইয়া, তাহাদের ক্ষুদ্র শয্যায় নিদ্রা যায়! একদিন পথে আসিতে আসিতে তাহার মাথায় একটা খেয়াল চাপিল। সে দোকানে প্রবেশ করিয়া চার পয়সা দিয়া একটা মুখস কিনিল। মুখস পরিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতেই, পুঁটু মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই মুখসশূন্য পিতৃমুখ সন্দর্শন করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল! রামচরণ তাহাকে কোলে লইয়া, চুম্বনের পর চুম্বনে তাহার ক্ষুদ্র মুখখানা প্লাবিত করিয়া দিল। পুঁটুকে কোলে লইলেই রামচরণের মনে হইত তাহার ঘরে যেমনটি আছে তেমনটি বুঝি আর কারো ঘরে নাই!

পুঁটুর মা কিন্তু স্বামীর এই গোপন আগমনে, আনন্দিত না হইয়া ভীতই হইত। সে বলিত,—"ওরে দেখ, তুই এমন ক'রে আর ঘরে আসিস্‌নি। মুনিব টের পেলে অনর্থ হ'বে।"

রামচরণ হাসিয়া বলিত,—"এ মেয়েটাই তো যত নষ্টের গোড়া, এটার জন্যই তো আসি। রোজই মনে করি কাল থেকে আর আসব না,—কিন্তু বেলা যতই বাড়তে থাকে ততই মনটা যেন কেমন ক'রতে থাকে। তখন ভাবি আজ যাই কাল আর যাব না। মুনিব টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না তা জানি।"

এই ভাবে বেশী দিন গেল না,—সে একদিন ধরা পড়িয়া গেল। পূর্ব্ব রাত্রে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে কাটাইয়া আসিয়া, সেদিন মেজবাবুর শরীর ভাল ছিল না। মেজাজও যে তৎসঙ্গে ভাল ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য। বাড়ীর মধ্যে রূক্ষ মেজাজের জন্য মেজবাবু প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র নলিনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ওরে, রামচরণকে একবার ডেকে দে তো, আমার গা হাত পাটা একটু টিপে দেবে।" রামচরণকে কিন্তু পাওয়া গেল না,—সে তখন তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে, ক্ষুদ্র শয্যায়, ক্ষুদ্র পুঁটুকে বুকে লইয়া শুইয়া আছে।

চাকর-মহলে, রামচরণের একটু প্রতিপত্তি ছিল, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত ও মানিয়া চলিত। বেহারী খানসামা রামচরণের কুটীরাভিমুখে ছুটিল, ফকীর খানসামা মেজবাবুর গৃহাভিমুখে ছুটিল। ফকীরকে দেখিয়াই মেজবাবু চটিয়া লাল হইলেন,—"তোকে কে ডেকেছে রে? সে নবাবের বেটার বুঝি নাক ডাকিয়ে ঘুম হচ্ছে?" মৃদুস্বরে ফকীর বলিল,—"না হুজুর, সে আজ একবার একটু ঘরে গেছে। আমি গা টিপে দেব কি?"

মুখভঙ্গী করিয়া মেজবাবু কহিলেন,—"ছুঃ বাপ পিতামোর দেওয়া হাড় কখানার উপর তোমার মায়া না থাকলেও আমার আছে। তোমার ঐ পাথরের মত হাত দু'খানা এর উপর প'ড়লেই চিত্তির আর কি? তোমার কিছু করতে হবে না, সে নবাবের বেটা কোথায় গেল একবার দয়া ক'রে খোঁজ নাও দিকিন্।"

ফকীর হেঁটমুখে চলিয়া গেল।

এদিকে বেহারী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া যখন বলিল,— "রামচরণ দা, ক'চ্ছ কি? মেজবাবু যে তোমায় খুঁজছেন," তখন ভয়ে তাহার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। সে পুঁটুরাণীর বাহু আপন কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মনীববাড়ী ছুটিল।

মেজবাবু ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিলেন,—রামচরণ আসিয়া নীরবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তিনি কোন কথা না কহিয়া, পদ হইতে পাদুকা খুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। রামচরণের ললাট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। মেজবাবু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া কয়েকটি পদাঘাত ও চপেটাঘাতে তাহার দেহ জর্জ্জরিত করিলেন। রামচরণ একটিও কথা কহিল না। কিন্তু, তার উপরেও মেজবাবু যখন কহিলেন,—"আজ তোর দু'টাকা জরিমানা"—তখন সে কাঁদিয়া ফেলিল। হায়! হায়! হায়! দুটি টাকা যে দুধের শিশু পুঁটুরাণীর দুধের দাম! একবার তাহার মনে হইল, বাবুর পায়ে ধরিয়া বলে,—"বাবু গো! আমি আমার পুঁটুকে একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। তাকে না দেখে যে আমি থাকতে পারিনা,"—কিন্তু পরক্ষণেই বাবুর বিদ্রূপপূর্ণ উচ্চহাস্য কল্পনা করিয়া নীরব রহিল। বেটা চাকরের আবার এত! তার আবার সন্তান-স্নেহ! রামচরণ সব সহ্য করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার সুগভীর সন্তান-স্নেহের উপর বিদ্রূপের কষাঘাত সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না! সে নীরবে কপালের রক্ত মুছিয়া মনীবের গাত্রসেবায় নিযুক্ত হইল।

সেই দিন বৈকালে মেজবধূ রামচরণকে ডাকিয়া তাহার হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল,—"তোমার মেয়েকে কিছু কিনে দিও। আর তাকে একদিন নিয়ে এস, আমার তাকে দেখ্‌তে বড্ড ইচ্ছে করে।" রামচরণ দিবসের প্রহারের সকল কষ্টই বিস্মৃত হইল,— হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাহার দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পাকারে বাহির হইল।

এই গৃহের মেজবাবুর হৃদয় যেমনই পাষাণের ন্যায় কঠিন ছিল, মেজবধূর হৃদয় তেমনই কুসুমের ন্যায় কোমল ছিল।

২।

পরদিন রামচরণ, মেজবধূপ্রদত্ত পাঁচ টাকা হইতে, এক টাকা দিয়া পুঁটুর মাতার জন্য একখানা নূতন ধৌত বস্ত্র ও পুঁটুরাণীর জন্য আট আনা দিয়া একটি নীলরঙ্গের ছিটের জামা কিনিয়া আনিল। পুঁটুরাণী আজ সাজিয়া গুজিয়া বাবুদের বাড়ী বেড়াইতে যাইবে। রামচরণের আজ আনন্দের সীমা নাই! বৈকালে মেজবাবু বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে, রামচরণ অর্দ্ধঘণ্টার ছুটী লইয়া গৃহে আসিল,—পুঁটুরাণী ও তাহার মাতাকে মনীববাড়ী লইয়া যাইবে তাই। দরিদ্রের গৃহের এই অমূল্য রত্ন আজ ধনীর গৃহের সকলকে ম্লান করিয়া দিবে ভাবিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হইতেছিল। বাবুদের বাড়ীতে মা লক্ষ্মীর কৃপা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও, মা ষষ্ঠীর কৃপা অজস্রধারে বর্ষিত ছিল না। বাবুরা পঞ্চ ভ্রাতা, কিন্তু বড় বাবুর দশ বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র ও সেজবাবুর একটি শিশু কন্যা ব্যতীত সে গৃহে আর শিশু সন্তান ছিল না। বড় বাবুর পুত্রটি একেবারেই রূপবান ছিল না, এবং সেজবাবুর কন্যাটি নিতান্ত কুৎসিত না হইলেও পুঁটুর নিকট সে নিতান্তই নিষ্প্রভ। এ কথা মনে করিয়া রামচরণের বুকখানা আনন্দে ও গর্ব্বে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটু ও তাহার মাতা প্রস্তুত হইলে, রামচরণ অগ্রে ও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কন্যাক্রোড়ে তাহার পত্নী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অন্দর মহলে ঢুকিতেই, মেজবধূর দাসী বামার সহিত দেখা হইল। সে রামচরণের সমভিব্যাহারে কন্যাক্রোড়ে অবগুণ্ঠনবতী রমণী দেখিয়াই, দ্রুত অগ্রসর হইয়া বলিল, "কে? রামদাদা মেয়ে এনেছ বুঝি? এই তোমার মেয়ে? এত সোন্দর!" মাতৃক্রোড় হইতে পুঁটুরাণীকে লইবার জন্য সে বাহু প্রসারণ করিল। পুঁটুরাণী কিন্তু তাহাতে বড় রাজী হইল না। সে দুই হস্তে মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া "না" "না" করিয়া উঠিল। হাসিয়া রামচরণ বলিল,—"ওযে তোকে চেনে না বামা! ও বড় দুষ্টু! অচিন্ মানষের

কোলে একেবারেই যায় না।” যেন শিশুর পক্ষে অজানা ক্রোড়ে যাইবার এই বিতৃষ্ণাটা বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক! এরূপ বুদ্ধির পরিচয় একমাত্র পুঁটুরাণী ব্যতীত কোন শিশুই যেন এ পর্য্যন্ত দেয় নাই!

বামা দাসী বলিল—“ও মা তাই নাকি? আচ্ছা বাপু, আমার কোলে এসেও তোমার কাজ নেই, আর ঠোঁট ফুলিয়েও কাজ নেই। চল, বৌ, মেজবৌদির ঘরে চল।” পুঁটুর মাকে লইয়া যখন বামা মেজবধূর গৃহে উপস্থিত হইল, তখন আরশীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সে চুল বাঁধিতেছিল। চুলের গোড়াবাঁধা দড়ীর একাংশ সে দন্তমধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, বিনুনি করিতেছিল। বামা আসিয়া বলিল,—“মেজবৌদি, রামদাদার বৌ মেয়ে নিয়ে এসেছে।” তাড়াতাড়ি চুলের আগায় ফাঁস দিয়া, বেণী ঘুরাইয়া খোঁপাটা বাঁধিতে বাঁধিতে সে বলিল,—“বোস বাছা, আমার এই হ'য়ে গেল ব'লে।”

খোঁপা বাঁধা হইলে, মাথায় কাপড় উঠাইয়া দিয়া, হাস্যবদনা মেজবধূ ফিরিয়া বসিল। তাঁহার সুন্দর মুখখানাতে যেন করুণা উছলিয়া পড়িতেছে। সুমধুর হাসি হাসিয়া সে বলিল, “ও মা, কি সুন্দর মেয়েটি, দেখ্‌লেই কোলে ক'র্ত্তে ইচ্ছে যায়। এসতো, মণি আমার কোলে এস।” আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুঁটুরাণী এবার আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া, তাহার প্রসারিত বাহুমধ্যে নিজেকে সমর্পণ করিল।

বামাদাসী একেবারে গালে হাত দিল,—“ও বাবা, এ মেয়ে ত কম নয়! আমার কোলে আসা হোল না, আর বড় মানুষের কোল দেখে ঝাঁপিয়ে পড়া হোল!”

পুঁটুর মাতা অপ্রতিভ হইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল,—“না দিদি, ও কি অত শত বোঝে? বৌদির গয়না দেখে ওঁর কোলে গ্যাছে।” বামা হাসিয়া কহিল,—“যাও যাও তোমার আর মেয়ের জন্য ওকেলতী ক'রতে হবেনা,”—বামার বাক্যগুলি কর্কশ হইলেও মনটা বড়ই

সাদা ছিল। পুঁটুরাণী মেজবধূর ক্রোড়ে গিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—তারপর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা তাঁহার অলঙ্কারগুলির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাৎ করিয়া কহিতে লাগিল,—"এ্রকি ?" "এ্রকি ?"

মেজবধূ তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, বড়বধূর মহলে প্রবেশ করিল। বড়বধূ তাঁহার শয়নগৃহের সোফার উপর অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় লেস বুনিতেছিলেন। আর অনতিদূরে, কক্ষতলে বসিয়া সেজবধূ এক-খানা ভিজা গামছা দিয়া তাহার কন্যাটির গাত্র মার্জ্জনা করিতেছিল, ও অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেছিল। কথাগুলি বোধহয় মেজবধূ সম্বন্ধেই হইতেছিল,—কেন না সে প্রবেশ করামাত্রই সে বাক্য-স্রোত অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত হইয়া সেজবধূর কণ্ঠেই আটকাইয়া গেল! মেজবধূর উদার সরল হৃদয়টা এই ধনীর অন্দরে সকলেরই একটা বিদ্রূপের বিষয় হইয়াছিল। তাহার গতিবিধি চালচলন যে নিতান্তই দীন দরিদ্রের মত, এবং সে যে এই জমীদার গৃহের নিতান্তই অনুপযুক্ত, তাহা বহু পূর্ব্বেই স্থির হইয়া গিয়াছিল। মেজ-বধূ গৃহে প্রবেশ করিয়া, এক গাল হাসিয়া বলিল, "দেখ দিদি, রাম-চরণের মেয়ে। মেয়েটি খুব সুন্দর, নয় কি ?"

বড়বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"মেজবৌ তুই যেন কি ? কোথাকার একটা চাকর না কে, তার মেয়েটাকে কোলে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ ? তোর কি ঘেন্নাও করে না ? অবাক কল্লি বাপু!"

অপ্রতিভ হইয়া মেজবধূ বলিল,—"কেন দিদি, চাকরের মেয়ে ব'লে কি হ'য়েছে ? এমন সুন্দর মুখখানা দেখ্‌লে কার না কোলে ক'ত্তে ইচ্ছে যায় ? আর ছোট শিশু বড় সুন্দর জিনিস, এদের দেখ্‌লে কি কারুর ঘেন্না আসে দিদি ?" সেজবধূর কন্যার গাত্র মার্জ্জনা শেষ হইয়াছিল। সে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, একটু মুখ বাঁকাইয়া, একটু ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল,—"মেজদির ঐ এক

রকম! রাস্তার মুটে মজুরদের ছেলেগুলি ডেকে নিয়ে এসে কত আদর করে! কে জানে বাপু”—কথা শেষ না করিয়াই সে গৃহ ত্যাগ করিল।

মেজবধূর বক্ষস্থল মথিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস বাহির হইল। ইহাদের নিকট কোন বিষয়ে সহানুভূতির আশা বৃথা!

আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মেজবধূ সিন্ধুক খুলিয়া একটি ছোট বাক্স বাহির করিল। পুঁটুর মা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহা ছোট ছোট বালা চুড়ী হার প্রভৃতি ছোট শিশুর উপযুক্ত বহুবিধ অলঙ্কারে পরিপূর্ণ! বাক্সটি খুলিয়া মেজবধূ, কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় অলঙ্কারগুলির পানে চাহিয়া রহিল। বহু আকাঙ্ক্ষা, বহু আরাধনার ধনের আগমন প্রত্যাশায়, তাহার অভ্যর্থনার জন্য, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই অলঙ্কারগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সে অমূল্য ধন, দিবসত্রয় মাত্র এ পৃথিবীতে থাকিয়া, মাতৃ-বক্ষপঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বুকভরা আদর, প্রাণভরা ভালবাসা কিছুই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না! সেই অবধি মাতৃবক্ষ শূন্যই রহিয়াছে,—আর একটি ক্ষুদ্র শিশু আর মাতার প্রাণের সে মহাশূন্য পূর্ণ করিতে আসে নাই! অলঙ্কারগুলিও আর বাক্স হইতে বাহির হয় নাই। সেজবধূ সূতিকা-গৃহ হইতে বাহির হইলে, তাহার শিশুটিকে গহনাগুলি দিবার মানসে একদিন সে গিয়াছিল। কিন্তু, গহনার বাক্স হস্তে তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, সেজবধূ যখন কন্যাটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি মেজদি, বাছার গায়ে ওসব দিও না, ওগুলো বড় অলুক্ষুণে”—তখন সে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। যে ভাবে আসিয়াছিল সেই ভাবেই ফিরিয়া গেল। অশ্রুজলে তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল,—বাকশক্তিও বুঝি ছিল না।

কিছুক্ষণ বাক্সটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মভেদী নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপর, এক জোড়া ক্ষুদ্র স্বর্ণ বলয় বাহির

করিয়া সে পুঁটুরাণীর হস্তে পরাইয়া দিল। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া নামিল। ত্রস্তে তাহা মার্জ্জনা করিয়া, পুঁটুর মুখ চুম্বন করিয়া তাহার মাতার ক্রোড়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া সে কহিল,—"আজ এস বাছা, সন্ধ্যে হয়ে এল। মাঝে মাঝে এসো।"

পুঁটুর মা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে, সাষ্ঠাঙ্গে প্রণতা হইয়া বিদায় লইল।

৩।

রামচরণের সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিল। একেই দুর্বৎসরে সকল জিনিসপত্র মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে, তার উপর পুঁটুর মনো-রঞ্জনার্থ এটা ওটা কিনিয়া প্রায়ই সে তাহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিতে লাগিল। সে প্রায় প্রত্যহই পুঁটুর জন্য একটা না একটা কিছু হাতে করিয়া আসিত। কোন দিন বা একটা চিনা পুঁতুল, কোন দিন বা কাঠের বাঁশী, কোন দিন বা একটা ঝুমঝুমি। যেদিন অন্য কিছু আনিতে না পারিত, সেদিন "পয়সা জোড়া রসগোল্লার" এক-জোড়া রসগোল্লা হাতে করিয়াই সে আসিত। পুঁটুর মাতা ঘোরতর আপত্তি করিলেও সে শুনিত না। বাপরে! এ প্রলোভন কি ত্যাগ করা যায়? না হয় অন্য কোন বিষয়ে তাহারা একটু কষ্ট করিয়াই চলিবে। পুঁটুরাণী ত আর সাধারণ ছোট শিশুর মত নির্ব্বোধ নহে? তার বুদ্ধি যে বড়ই তীক্ষ্ণ! সে ইহার মধ্যেই বাপের এই দুর্ব্বলতাটুকু বেশ বুঝিয়া লইয়াছে। কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিতে তাহার যতই রাত্রি হউক না কেন, পুঁটু কি কখনও ঘুমায়? সে তেমন পাত্রই নয়! একদিন ভুল হইলে কি আর রক্ষা থাকিবে? তার যে দুর্জ্জয় অভিমান! সেদিন হয় ত সে তাহার কোলেই আসিবে না। রামচরণ কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে? তারপর তাহার আনীত দ্রব্য দেখিয়া পুঁটু যে আনন্দে অধীর হয়, নৃত্য করে, গলা ধরিয়া বার বার চুমা খায়, তাহার কি একটা

সুখ নাই ? এই সুখের আশায় তৃষিত হৃদয়ে সে যে জীবনের অনেককাল কাটাইয়া দিয়াছে ! দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া, নিরাশ চিত্তে সে ত তাহার জীবন ব্যর্থ বলিয়াই মানিয়াছিল। অবশেষে বিধি যদি দয়া করিয়া এ অমূল্য নিধি দিয়াছেন, তবে তাহার উপযুক্ত আদর যত্ন তাহারা না করিবেই বা কেন ? পুঁটু যখন তাহার বালাপরা হাত দুখানা নাড়িয়া, ঝাঁকড়া চুলভরা মাথাটা দোলাইয়া, নাক মুখ চোখ ঘুরাইয়া আধ আধ কথা কয়, তখন ত রামচরণের মনে হয় তাহার মত ভাগ্যবান বুঝি এ সংসারে আর নাই। বিধাতা বুঝি এ জগতের যত সুখ যত আনন্দ তাহার জন্যই সৃজন করিয়াছিলেন। সে এই সুখের প্রলোভন প্রাণান্তেও ত্যাগ করিতে পারিবে না। একথা লইয়া প্রায়ই তাহাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হইত। অবশেষে একদিন যখন সে কাটা কাপ-ড়ের দোকান হইতে একটি সুন্দর গোলাপী রঙ্গের রেশমের জামা কিনিয়া আনিল, তখন স্বামী-স্ত্রীতে রীতিমত কলহ হইয়া গেল। পুঁটুর মা শেষে বলিল,—"সোংসার কি ক'রে চলে তার ঠিক নেই, আর দেড় টাকা দিয়ে একটা জামা কিনে নিয়ে এলে কি ব'লে ? পেটে রইল খিদে আর পিঠে হোল জামার বাহার। মিন্সের জ্বালায় বিবেগী হ'য়ে বেরিয়ে যাব নাকি ? আমরা কাঙ্গাল গরীব নোক, আমাদের ঘরে এত কেন ?"

রামচরণ কিন্তু তাহার বাক্যে কর্ণপাতও করিতেছিল না,—সে পুঁটুকে জামা পরাইতে ব্যস্ত ছিল। তাহাকে জামা পরাইয়া, কোলে লইয়া তাহার মাতার সন্নিকট হইয়া বলিল,—"আরে পাগ্‌লি, রাগ করিস কেন ? দেখ্‌ ত আমার মায়ের রূপ কেমন ফেটে পড়্‌ছে ! আর তুই মাগী রাতদিন গরীব গরীব করিস্‌নি বলছি, দেখিস্‌ আমার মা রাজরাণী হবে।" পুঁটুর মা হাসিয়া ফেলিল। পুঁটুকে কোলে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল,—"রাজরাণী হ'য়ে আর কাজ নি। বেঁচে বত্তে থাক, আমার মত সুখে

ঘরকন্না কত্তে পাল্লেই হয়। তার বাড়া আর কিছু চাই নি।"

৪।

পুঁটুরাণী যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য লইয়া এ সংসারে আসিয়াছিল, সেই পরিমাণ অদৃষ্টের জোর লইয়া আসে নাই। আসিয়া থাকিলেও তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত ছিল, আপাততঃ কিছুই প্রকাশ পাইল না।

পুঁটু এখন দেড় বৎসরের বালিকা। এখন আর সে হাঁটিতে গিয়া টলিয়া পড়ে না, উঠিতে গিয়া বসিয়া পড়ে না। সে এখন সারা উঠানময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়! শ্রাবণ মাস—আকাশ সেদিন বড়ই মেঘাচ্ছন্ন। চারিদিকে গুমট্ ধরিয়া আছে, গাছের একটি পাতাও নড়িতেছে না। প্রকৃতির এই বিরাট নিস্তব্ধতা, বর্ষণের অব্যবহিত পূর্ব্বের লক্ষণ জানিয়া রামচরণ প্রমাদ গণিল। সে অতি সত্বর তাহার কাজগুলি সারিয়া লইতেছিল,—তবু যেন কাজ আর ফুরায় না!

মেজবাবু সেদিন একটু খোস মেজাজে ছিলেন। রাত্রি প্রায় তখন নয়টা। সে আকাশের অবস্থা দেখাইয়া, ও আশু বিরাট ঝড়ের সম্ভাবনা জানাইয়া, কাতরকণ্ঠে একটু শীঘ্র বিদায় চাহিল। মেজবাবু সম্মতি দান করিলে সে রন্ধনগৃহে বামুনঠাকুরকে সেদিন আর আহার করিবে না জানাইয়া, দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু সে ফটক পার হইতে না হইতে, তাহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন, মেদিনী কম্পিত করিয়া ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। সমস্ত আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষলতায় যেন একটা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল। রামচরণ কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না,—দ্বারবানের ঘরের দাওয়ায় সে বসিয়া পড়িল। তার পরেই ঝম্ ঝম্ শব্দে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। গর্জ্জনের উপযুক্ত বর্ষণ না হইলেও, বড় কমও হইল না।

রামচরণ বড়ই বিপদে পড়িল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। প্রায় একঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ঝড় ও বৃষ্টি চলিল। হরিচরণ খানসামা, এই সময়ে, গামছা মাথায় দিয়া ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া কহিল,—"রামচরণ দা, এই ঝড়-বৃষ্টিতে আজ আর বাড়ী যেওনা। এখানেই শুয়ে থাক।"

রামচরণের বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। পুঁটুকে ছাড়িয়া সারাদিন থাকাই দায়, তায় আবার রাত্রে! সে না গেলে ত পুঁটুকে কেহ ঘুম পাড়াইতেই পারিবে না। আর এই ঝড় বৃষ্টি, বজ্রের ডাকে হয় ত পুঁটুও তাহার মাতা ভয় পাইতেছে,—সে কি তাহাদের একাকী ফেলিয়া থাকিতে পারে!

দ্বারবানের নিকট হইতে একটি ছাতা চাহিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। এই দুর্য্যোগে ভিজিয়া তিতিয়া সে যখন উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, পুঁটুর মা রন্ধন-গৃহ হইতে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"একি সর্ব্বনাশ করেছিস! এই দুয্যুগে কি কেউ ঘর থেকে বেরোয়? ভিজে যে সারা হয়ে গেছিস!"

রামচরণ ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বলিল,—"চুপ কর হিমি, চেঁচাস্‌নে, আমায় একখানা শুক্‌নো কাপড় দে। পুঁটু কি ঘুমিয়েছে?" শুষ্ক বস্ত্রখানি স্বামীর হস্তে প্রদান করিয়া পুঁটুর মা বলিল,—"হ্যাঁ, তোর জন্য কেঁদে কেঁদে এই ঘুমিয়ে পড়েছে—ঝড় দেখে বড় ভয় পেয়েছিল।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, হুঁকা হস্তে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে রামচরণ ভাবিতে লাগিল। পুঁটু জাগ্রত না থাকাতে তাহার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগিতে লাগিল। আবার মনে হইল সে দ্বারবানের ঘরে বসিয়া একঘণ্টা সময় নষ্ট করিল কেন? আহা! পুঁটু হয় ত কতই ভয় পাইয়াছিল,—তাহাকে না দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র বুকখানা হয় ত দুঃখ ও অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে! নিজেকে তাহার বড়ই অপরাধী বোধ হইতে লাগিল।

পুঁটুর মা নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"খাওয়া হয়েছে ত ?" রামচরণ প্রভু-গৃহেই নিত্য আহার করিয়া আসিত, কিন্তু তবু সে গৃহে আগমন করিবার পূর্ব্বে, এবং তাহাকে উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী কখনও আহার করিত না। তাহার প্রশ্ন শুনিয়া রামচরণের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—"খাওয়া ? না, খাওয়া আর হোল কই ? মেঘ দেখে তাড়াতাড়ি ক'রে আস্‌ছিলুম, ফটকের কাছে আসৃতেই ঝড় এল। তা তুই খা গিয়ে, আমি আজ আর খাব না।" রামচরণ জানিত যে একজনের অন্য রন্ধন হইয়াছে, সে আহার করিলে তাহার স্ত্রীকে উপবাসী থাকিতে হইবে। তাহার কথায় পুঁটুর মা জিভ কাটিয়া বলিল,—"ওমা, তাও কি হয় ? রাত-উপোসী থাকলে অসুখ হয় যে ? আমি মুড়ী চিঁড়ে টিড়ে একটা কিছু খাব'খন। আর না হয় উনুনে আঁচ আছে দুটি ভাতে ভাত চড়িয়ে দিলেই হবে।"

সে জলছিটা দিয়া স্থান মার্জ্জনা করিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। তারপর, যত্নপূর্ব্বক অন্ন বাড়িয়া আনিয়া স্বামীকে ডাকিল। আহার অতি সামান্য,—মোটা চাউলের অন্ন, কলাইয়ের দাল ও শাকপাতা দিয়া একটা চচ্চড়ী। একটি ছোট বাটিতে করিয়া অল্প একটু ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ ও কয়েকখানি বাতাসা দিয়া সে আহার শেষ করিল। পুঁটুর মা নিকটে বসিয়া বলিল,—"পুঁটু আজ বিকেলে আর দুধ খায়নি, তাই ঐ ছটাকখানেক দুধ রয়েছে। সে আজ দুটি ভাত খাবার জন্য বায়না ধরেছিল। কি করব ? যে মেয়ে, কিছুর জন্য বায়না ধর্‌লে কি আর রক্ষে আছে ?"

রামচরণ কিন্তু এই সামান্য ভোজ্য দিয়া বড় তৃপ্তি করিয়া খাইল। মনীববাড়ীর পাঁচ তরকারী ভাতও বুঝি এত মিঠা লাগে না! তা লাগিবে কেন ? সে যে বেতনভোগী পাচকের অযত্ন-প্রস্তুত খাদ্য, আর এ যে সাধ্বী স্ত্রীর সহস্ত-প্রস্তুত ও সযত্ন-পরিবেশিত অন্ন! তফাৎ অনেক খানি।

পরদিন প্রভাতে, রামচরণ শয্যাত্যাগ করিতে গিয়া দেখিল, মাথা উঠাইতে পারে না, গাত্রে অগ্নিদাহ, বক্ষে বিষম বেদনা। সে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। পুঁটুর মা পুঁটুর সম্মুখে একখানা কুশের ছোট্ট থালায় এক মুষ্টি মুড়ী দিয়া, তাহাকে উঠানের এক পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া, ঘর দ্বার গোময় লিপ্ত করিতেছিল। স্বামীর চীৎকার ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হ'য়েছে?" অতি কষ্টে রামচরণ বলিল,—"মাথা ঘুর্‌ছে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা, আর বুকে বড্ড ব্যথা, শ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছিনা।"

পুঁটুর মাতার দক্ষিণ হস্ত গোবরমাখা, সে বাম হস্তের উল্টা পিঠখানা স্বামীর ললাটে রাখিয়া বলিল,—"ওমা, এ যে বড্ড জ্বর হয়েছে গো! এখন কি হবে?" রামচরণ কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া রহিল। পুঁটুর মাতা সত্বর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া শিবুর বাপকে দিয়া কবিরাজ ডাকাইবার বন্দোবস্ত করিল,—অন্য একজন দ্বারা মনীববাড়া সংবাদ প্রেরণ করিল।

কবিরাজ মহাশয় যখন আসিলেন,—তখন রামচরণ বিষম জ্বরে একেবারে অচৈতন্য। সমস্ত দিন, পুঁটুরাণী কতবার পিতার সংজ্ঞাশূন্য দেহের উপর পড়িয়া "বাবা" "বাবা" বলিয়া ডাকিল,—পুঁটুর মা কতবার তাহাকে ডাকিয়া পথ্য খাওয়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই কোন সাড়া পাইল না।

যে পুঁটু একবার বাবা বলিয়া ডাকিলে রামচরণ আনন্দে অধীর হইত, যে পুঁটুর বিরহ সহ্য হইবে না বলিয়া সে এই দুর্য্যোগেও গৃহে ফিরিল, সেই পুঁটুর ডাকও তাহার কর্ণে পৌঁছিতেছে না দেখিয়া পুঁটুর মাতা প্রমাদ গণিল। তদুপরি, রাত্রিতে সে যখন সেই অজ্ঞানাবস্থায়ও কাশিতে লাগিল, তখন পুঁটুর মাতা, বড়ই ভীত হইয়া পড়িল। তিন দিবস এই ভাবে গেল, কবিরাজী ঔষধে কোন ফল দেখা গেল না। চতুর্থ দিবসে, পুঁটুর মাতা কবিরাজ বিদায় করিয়া

দিয়া ডাক্তার আনাইল। স্ত্রীর প্ররোচনায়, মেজবাবু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া পাঠাইলেন। পুঁটুর মা, মেজবধূপ্রদত্ত পুঁটুর বালাজোড়া বিক্রয় করিয়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিল। তারপর পুঁটুর ভার পাড়ার কৈবর্ত্তবধূর উপর সমর্পণ করিয়া সে রুগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যায় নিজেকে উৎসর্গ করিল। ডাক্তার বলিলেন, রোগ অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় আসিয়াছে,—কিন্তু এখনও চিকিৎসাসাধ্য। তাহা শুনিয়া পুঁটুর মাতা স্থির করিল, তাহার সাধ্যমত কোন চেষ্টারই ক্রটি করিবে না, তারপর ভগবানের হাত। সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দিনরাত্রি কেবল একই প্রার্থনা তাহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"হে ঠাকুর, হে মা কালী, ভাল কর মা, জোড়া পাঁঠা বলি দেব, বুক চিরে তোমায় রক্ত দেব।"

পঞ্চম দিবসে রামচরণ একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—"একটু জল"। ঝিনুকে করিয়া, পুঁটুর মা স্বামীর মুখে জল দিল। রামচরণ উৎসুক নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া পুনরায় বলিল,—"আমার পুঁটু মা ?" সে উঠিয়া পুঁটুকে লইয়া আসিয়া, শয্যার উপর বসাইয়া দিল। পুঁটুরাণী পিতার শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে একবার তাহার দিকে, একবার মাতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। রামচরণ তাহার ক্ষীণ হস্ত তুলিয়া পুঁটুর কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া তাহার উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। তারপর দুইদিন রামচরণ একটু ভাল বোধ করিল। ডাক্তারও একটু ভরসা দিলেন,—পুঁটুর মায়ের প্রাণেও একটু আশার সঞ্চার হইল। সপ্তম দিবস, অবস্থার পুনরায় পরিবর্ত্তন হইল। ডাক্তার বলিলেন নাড়ীর অবস্থা মন্দ। রামচরণ সমস্ত দিন বর্ণনাতীত কষ্ট ভোগ করিল। সে এক মুহূর্ত্ত এক ভাবে থাকিতে পারিতেছেনা,—ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। পুঁটুর মা ধীর ভাবে বসিয়া

তাহার সেবা করিতেছে। তৃষ্ণার সময় মুখে জল দিতেছে, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতেছে,—মধ্যে মধ্যে একটু পথ্য পান করিবার জন্য কাতরে অনুনয় করিতেছে। তাহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সে অধীর হইয়া পড়ে নাই।

সন্ধ্যার সময় রামচরণ আবার একটু সুস্থ বোধ করিল। পত্নীর আগ্রহে একটু পথ্য পান করিল। তারপর কিছুক্ষণ একদৃষ্টে পার্শ্বোপবিষ্টা স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বিজড়িত কণ্ঠে বলিল,—"আমার সঙ্গে সঙ্গে তুইও শেষ হলি রে! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বাঁচবি কি ক'রে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে পুঁটুর মা বলিল—"তুই ভাল হ'য়ে ওঠ,—নাওয়া খাওয়ার সময় তখন ঢের পাব'খন।

মাথাটা পত্নীর কোলের উপর উঠাইয়া দিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল,—"আর কি ভাল হব রে? আর ভাল হ'ব না। অনেক পুণ্যে তোকে আর আমার পুঁটু-মাকে পেয়েছিলুম। তোরা যে অকূল সাগরে ভাস্‌বি তাই ভাব্‌ছি, আর যেতে মন স'র্‌ছে না।" এস্তে দু'ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া, পুঁটুর মা বলিল,—"বালাই, ভাল হবি না কেন?"

এই সময়ে পুঁটুকে কোলে লইয়া কৈবর্ত্ত বধূ সেখানে আসিল। রামচরণকে সুস্থ দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া সে বলিল,—"দাদা, এখন একটু ভাল বোধ ক'রছ কি?"

পুঁটুকে দেখিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া, আর্ত্তস্বরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে রামচরণ বলিল,—"ওরে, তোরা ওকে আর আমার কাছে আনিস্ নি রে,—ওর—দিকে—আমি—আর চাইতে—পারিনি। মাকে —পেয়ে আকাশের—চাঁদ—হাতে—পেয়েছিলুম। আমার—কোন— সাধ আহ্লাদই—পূর্ণ—হোল না রে। ওযে—রাস্তার ভিকিরী— হোল রে—রাস্তার ভিকিরী—হোল।"

হতভাগিনী পুঁটুর মা আর স্থির থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া

লুটাইয়া পড়িল। রামচরণ তাহার পৃষ্ঠে হাতখানা রাখিয়া বলিল,—"আর—মায়া—বাড়াস্‌নে রে মাগি! ওপারের ডাক এসেছে। যেটুকু সময় আছে এপারের দেনাপাওনা চুকিয়ে নিতে দে—কেঁদেকেটে অস্থির করিস্‌নে।"

তারপর রামচরণ আর একটিও কথা কহিল না। সন্ধ্যার পর হইতে তাহার যাতনা আবার বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি অসহ্য যাতনা ভোগ করিয়া, উষার তরুণ আলোক যখন সবেমাত্র আকাশে তাহার অধিকার বিস্তার করিয়াছে, শুকতারার আলো একেবারে মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই রামচরণ এপারের দেনাপাওনা মিটাইয়া, ক্ষুদ্র শিশুর মত ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার বড় সাধের পুঁটুরাণী নিরাশ্রয় হইল।

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

শ্রাবণ মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃপ্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যখন আমরা উভয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ৺ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাটীতে মিলিত হইতাম (আমি তখন রঙ্গপুরে একজন ডিপুটি ছিলাম), ঐ সময় বঙ্কিমপ্রসঙ্গ উঠিত ও আমার পিতৃদেবের কথা আমার মুখে শুনিতেন (ইহার প্রায় আট মাস পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন) এবং তাহা অবলম্বনে আমাদের পিতৃপ্রসঙ্গ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তেজস্বী পুরুষ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সহিত তখন তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল না, তথাচ তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া ডাক্তার ঘোষ গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনিই মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কথা উত্থাপন করিতেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর একদিন বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজের অগ্রণী হইবেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা আসিয়াছিল যে তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অমূলক, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ একটা কথা লইয়া 'নারায়ণ'-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। সে কথাটি এই—"পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গদোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বজীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও, পরে তাহা

সংশোধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে অ্যালবার্ট হলে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহার শ্রোতা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ * * শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষীগণ। ইহাতেও বঙ্কিম-চন্দ্রের উপকার হয়, পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে।"

এই কথা কতদূর অসঙ্গত তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বক্তৃতাসম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বক্তৃতা-সভায় দিন দুই যাইয়া বঙ্কিমবাবু আর যাইলেন না, তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তিনি গত বৈশাখ মাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'বঙ্কিম-স্মৃতি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"দুই তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর আর তাঁহাকে (বঙ্কিমবাবুকে) দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামত তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছি-লাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোন স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক ফোঁটা, ও শিখা রাখায় যে ধর্ম্ম টঁ্যাকে, আর ঐ গুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজ-ধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসি তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।"

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কি বুঝা যায় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্কিমবাবুর উপকার হইয়াছিল ও পিতৃপিতামহের ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছিল ?

আসল কথা এই যে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি "নবজীবনে" ও "প্রচারে" হিন্দু-ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ সভা বসে, তাহাতে অনেক সাহিত্যিক, ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান স্থির হইল, বক্তৃতার একটা দিনও স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে শ্রোতা ছিলেন এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তারপর দুই একদিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।

ইহার বহুপূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ধর্ম্মের উদ্দীপন হয়। আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন ত বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থগুলি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি নূতন খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমারী সাজাইলেন, আলমারী ভরিয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র না ছিল! এমন কি জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল, সেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই

গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে 'মাঘ' 'ভারবী' 'নৈষধ' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার খতম হইত। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তার পর যখন হুগলীতে বদ্‌লি হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন চুঁচুড়ায় থাকিতে হইয়াছিল, তথাপি রবিবারে রবিবারে আসিতেন, এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মশিক্ষা হইল। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার মন কখনও ধর্ম্ম-প্রচারকদের বক্তৃতায় গলিয়া গিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হয় নাই, এই শিক্ষার ফলেই তিনি ধর্ম্ম-তত্ত্ব, কৃষ্ণ-চরিত্র, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, এই শিক্ষার ফলেই তিনি গীতাব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি University Instituteএ বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষ করিতে না পারিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। কোনও ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম শিক্ষা পান নাই, তাঁহার একমাত্র ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব। দেবীচৌধুরাণী গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম্ম ব্রত করিয়াছিলেন—ইত্যাদি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুড়ায় থাকা কালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন তাহাই হিন্দু-ধর্ম্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন, ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন তাহাতেই ঐ উদ্দেশ্য থাকিত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপনার কণ্ঠদ্বারা যে হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা

করিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কলমের দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের ঠিক সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, এমনও বলা যায় না।

১৮৮১ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। উহার মাস কয়েক পরে সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে "Statesman" সংবাদপত্রে হিন্দু-ধর্ম্ম লইয়া Rev. Dr. Hastie সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধ হয়। ১৮৮৩ সালে বঙ্গদর্শনে "দেবীচৌধুরাণী" বাহির হয়। ১৮৮৪ সালে "নবজীবনে"র প্রথম সংখ্যায় "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঐ সনের শ্রাবণের "প্রচারে" প্রথম সংখ্যায় "সীতারাম" বাহির হয়। ইহার পর ১৮৮৫ সালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এখন পাঠক মহাশয়েরা বলুন দেখি, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি?

বঙ্কিম সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ আর একটি কথা লিখিয়াছেন তাহাও অমূলক, যথা:—"সত্য মিথ্যা জানি না, স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, শেষ জীবনে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র জপের মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" আমি যতদূর জানি বঙ্কিমচন্দ্র জাপক ছিলেন বটে, কিন্তু জপের মালা ঘুরাইয়া জপ করিতেন না। আমাদের পিতৃদেবও জাপক ছিলেন, তিনিও কখনও জপের মালা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায় চারি বৎসর আমি আলিপুরে বদ্‌লি হইয়া তাঁহার নিকটেই ছিলাম; কই কখনও ত জপের মালা ঘুরাইতে তাঁহাকে দেখি নাই।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর আমাদের পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা এরূপ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন যে উহা আমি চিরকাল স্মরণ রাখিব। তিনি লিখিয়াছেন, ঐ ঘটনাটি আমার মুখে শুনিয়াছেন, সে আজ অনেকদিনের কথা, প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। ১৮৮১ সালে আমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয়, এই

দীর্ঘকালে যে আমার পিতৃদেবের কথাটি তাঁহার স্মরণ আছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিজের ভিন্ন পরের কথা ভালরূপ স্মরণ থাকা সম্ভব নহে, এজন্য এ ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার দুই একটি ভুল হইয়াছে। আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালের প্রাচীন ও প্রাচীনা-দের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। ঐ গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না; কেননা ঐগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত, তবে এইরূপ রটনাতে বুঝা যায় যে, সাধারণের ধারণা ছিল যে পিতৃদেব বাল্যকাল হইতে দেবভক্ত ছিলেন ও দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বোধ হয় এই ভক্তির জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাঁহার প্রবন্ধে দীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নাই। ঐ মহাপুরুষের দ্বারা পিতৃ-দেবের দীক্ষা হওয়াতে, এই গল্পটি আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে এবং আমিও পণ্ডিতরাজকে ও ডাক্তার কে, ডি ঘোষকে বলিয়া থাকিব। প্রায় চারি বৎসর হইল দীনবন্ধুবাবুর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র এই ঘটনাটি "মানসী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার শুনা কথা। আমিও যাহা নিম্নে লিখিব আমারও তাহা শুনা কথা।

আমাদের জ্যেষ্ঠতাত ৺কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুরের নিমকপোক্তানের দারোগা ছিলেন। সেকালে ওটি একটি লোভনীয় পদ ছিল, কেননা ঐ পদের মর্য্যাদাও খুব ছিল এবং বেতনও ভাল ছিল। জ্যাঠামহাশয় ঐ স্থানে বহুকাল ছিলেন এবং সেদেশের লোকের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি উহা কাশীনাথ-মন্দির বলিয়া খ্যাত। আমাদের দেশের অনেক লোক তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইত, তিনি সকলকেই এক একটি চাকুরিও দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার

পিসতুতো ভাই ৺ভজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারই নিকট নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম।—

পনর ষোল বৎসর বয়সে পিতৃদেব তাঁহার পিতাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, আমাদের ঠাকুরের* প্রধান পূজারির নিকট কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়া একদিন রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন। যাজপুরে তাঁহার অগ্রজের নিকট যাইবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পিতামহ পরদিন প্রত্যূষে উহা জানিতে পারিয়া দুইটি বিশ্বাসী লোক তাঁহার পশ্চাৎ পাঠাইলেন, কিন্তু পথে তাঁহার সহিত তাহাদের দেখা হইল না। পিতৃদেব পদব্রজে কয়দিনে যাজপুরে পৌঁছিলেন, সেইখানে তাহাদের সহিত দেখা হইল। রাস্তায় তাঁহার কাপড় চাদর ও টাকাকড়ি চুরি গিয়াছিল কি না, শুনি নাই। যাজপুরে কিছুদিন থাকিয়া পারসী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। আমার জ্যাঠামহাশয় ঐ ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। পিতৃদেবকে ঐ ভাষা শিখাইবার জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে জ্যাঠামহাশয় অনুজকে একটিন্ দিয়া পিসতুতো ভাই ও দেশের লোকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া মাসকয়েকের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলেন। একজন প্রধান কর্ম্মচারী কাজ চালাইত, পিতাঠাকুর কেবল দস্তখত করিতেন। কিছুদিনের পর তাঁহার জ্বর হইল। তখন তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেস্থানের লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল, অবশেষে নাড়ীত্যাগ হইল এবং তাঁহাকে বৈতরণী তীরস্থ করিতে হইল। প্রাণত্যাগ হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহাকে একখানি চাদরে ঢাকিয়া আত্মীয়েরা সৎকারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভিড় ঠেলিয়া ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজুটধারী, পরিধানে গেরুয়া বসন, পদযুগলে খড়ম—এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার

মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইঁহাকে প্রণাম করিল। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "রক্ষা করুন"। ইঁহাকে দেখিয়া কাহারও সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হইল না। সকলেই বুঝিল ইনি দেবপ্রেরিত। এই মহাপুরুষ পিতৃদেবের নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখ হইতে চাদর তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন,"কি সুন্দর! ছেলেটি কি সুন্দর!"—পরে বলিলেন, "মরে নাই, জীবিত আছে" এবং গরম দুধ আনিতে অনুমতি করিলেন। এইস্থলে পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত জল ছিটাইতে ছিটাইতে পিতৃদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই পিতাঠাকুর পাশমোড়া দিলেন, ক্রমে ঐরূপ করিতে করিতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। পরে কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল। মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় পিতার সঙ্গে বাসায় আসিলেন। পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পিতাঠাকুর শয়নাবস্থাতেই তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি সুস্থ হইয়াছ।" পিতাঠাকুর বলিলেন, "তাহা আমি জানি, তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"।

"কি ভিক্ষা? বল"

"যদি আমার জীবনদান করিলেন, তবে আমায় দীক্ষিত করুন।"

মহাপুরুষ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে অনেকক্ষণ পিতাঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে স্বীকৃত হইয়া একটি দিনস্থির করিয়া বলিয়া গেলেন যে, ঐ দিনের প্রত্যুষে স্নাত হইয়া থাকিবে, তিনি আসিয়া দীক্ষিত করিবেন। ঐ দিনের ঠিক সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেবকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "না ভালরূপ তোমার স্নান করা হয় নাই, এস, আমি বৈতরণী হইতে তোমাকে স্নান করাইয়া আনি।" এই বলিয়া পিতাঠাকুরের হস্তধারণ করিয়া

বৈতরণীর জলে তাঁহাকে অনেকবার ডুব দেওয়াইয়া লইয়া আসি-লেন। আমাদের ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহাদের পশ্চাদানুসরণ করিয়া ইহা দেখিয়াছিলেন। পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি ঘরে তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহা সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হইল, বাসার লোকে অনাহারে ছিল। দীক্ষাকার্য্য শেষ হইলে, পিতার গুরুদেব দ্বার খুলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন, সকলেই লক্ষ্য করিল তাঁহার পায়ে খড়ম নাই, খালি পায়ে চলিয়া গেলেন। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তখন দীক্ষাঘরে পিতাঠাকুরকে দেখিতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর কিশোর বালক পীতাম্বর-পরিধানে একটি আসনে বসিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে গামছাবাঁধা একটি পুঁটলী রহিয়াছে। তিনি পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক্রোড়ে কিসের পুঁটলী দেখি।" যেমন কোন শিশুর হাতের পুঁতুল কেহ দেখিতে চাহিলে সে উহা বুকে করিয়া 'না, না' বলে, আমার পিতৃ-দেব সেইরূপ চমকাইয়া "না, না, উহা দেখাইব না" বলিয়া পুঁটলীটি বুকে টিপিয়া রাখিলেন। এই পুঁটলীতে কি ছিল পাঠকের বোধ হয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহাতে ছিল তাঁহার গুরুদেবের পায়ের খড়ম ও উপবীত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অষ্টাশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কখনও কোন দিন তিনি উহা নিজের কাছছাড়া করেন নাই। যদি সরকারী কার্যোপলক্ষে কোন দিন কোন স্থানে রাত্রি কাটাইবার আবশ্যক হইত, উহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপে সত্তর বৎসর উহা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে উহার পূজা করিতেন এবং সেই সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক জপ ইত্যাদি করিতেন। পরে মৃত্যুশয্যায় উহা ত্যাগ করিয়া আমাদের বলিলেন, "উহাতে আমার গুরুদেবের খড়ম ও উপবীত আছে। দীক্ষার পর তিনি গলা হইতে উপবীত ও আমার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পায়ের খড়ম দিয়াছিলেন।" পিতৃদেব কখনও তাঁহার গুরুদেবের কথা কহিতেন না। আজ ঐ পুঁটলী আমাদের দিয়া আদেশ করিলেন, "উহাতে

পাথর বাঁধিয়া অতলস্পর্শে নিক্ষেপ করিবে।” অতলস্পর্শ অনেক দূর, সেই সাগরসঙ্গমে, ততদূর যাইবার সুবিধা হইল না। হুগলীর নীচে ঘোলঘাট খুব গভীর ছিল, ঐ স্থানে পাথর বাঁধিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইল। পিতাঠাকুরের মৃত্যুর পর আমরা উহা খুলিয়া দেখিলাম,—একজোড়া খড়ম, উহার ‘বৌল’ হাতীর দাঁতের, উহা এত বড় যে, কলিযুগের মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নহে; আর দেখিলাম—উপবীত, সূতার প্রস্তুত নহে, আমার অগ্রজদের বিবেচনায় উহা কোন গাছের ছাল; বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, তিব্বত দেশের গাছের ছাল; উহা তিন-দণ্ডী, মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ। ঐ উপবীতের প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পিঠে কি লেখা ছিল, কি ভাষা বুঝা গেল না; বঙ্কিমচন্দ্রের বোধ হইল উহা তিব্বত্য ভাষা। এই খড়ম ও উপবীত দেখিয়া বুঝা যায় যে, আমাদের পিতৃগুরু একজন সামান্য মানুষ অথবা বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী ছিলেন না—তিব্বত্য পাহাড়ের একজন তাপস ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে একদিন রবিবারে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ও আমি বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সহিত বাটীর সাম্নের গলিতে দেখা হইল। তাহার পরিধানে মালকোচামারা গেরুয়া ধুতি, গাত্রে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দি ভাষায় বলিলেন, “আপনি কি বঙ্কিমবাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।” বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?” তিনি উত্তর করিলেন, “আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি, সেইস্থানের কোন ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।” বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, “সেদেশের কোন ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।” তিনি বলিলেন, “আপনার নাই বটে, কিন্তু আপনার বাবার ছিল।” তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া

শ্রীশ্রী কৃষ্ণ-তত্ত্ব

[৮]

ভগবদ্‌গীতায় কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা (৩)

পুরুষোত্তম-তত্ত্বের ক্রমবিকাশ।

বলিয়াছি যে পুরুষোত্তমই ভগবদ্‌গীতার সাধ্য। আর গীতাতে কেমন করিয়া তিলে তিলে এই তত্ত্বটি ফুটিয়াছে, ইহা তলাইয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণ আপনার অসাধারণ শক্তি ও যুক্তি প্রভাবে এই তত্ত্বটিকে অর্জ্জুনের প্রাণের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন।

অর্জ্জুন প্রিয়জনের বধের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়াই, ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

> কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
> যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং
> প্রপন্নম্॥

কার্পণ্যদোষে আমার স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্ম্মা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছে, অতএব আমার পক্ষে শ্রেয় কি, ইহা বুঝাইয়া বল ; আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত হই-য়াছি, আমাকে শিক্ষা দাও। এই হইতেই গীতোপদেশের উৎপত্তি। যে স্বল্পমপি আত্মক্ষতি সহিতে পারে না, সে'ই কৃপণ। অসারে সারবুদ্ধি, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অনাত্মবস্তু দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই এই কার্পণ্য উৎপন্ন হয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ সকলের আগে অর্জ্জুনকে আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভগবদ্বাক্য সকল এই আত্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

আসন্ন সংগ্রামে প্রিয়জনের মরণ নিশ্চিত দেখিয়াই অর্জ্জুন শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং মৃত্যুতে কেবল নশ্বর দেহেরই বিনাশ হয়, অমর আত্মার বিনাশ হয় না, প্রথমে ভগবান্ তাঁহাকে এইটিই বুঝাইলেন। কঠোপনিষদে যমের সঙ্গে নচিকেতার কথাবার্ত্তাতেও এই তত্ত্বটিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নচিকেতা যে জিজ্ঞাসা লইয়া যমের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ হইতেই অর্জ্জুনের এই শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। জিজ্ঞাসা যখন মূলে এক, তার উত্তরও কাজেই এক হইবে। যম কঠ-শ্রুতিতে নচিকেতাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকেও প্রায় তাহাই বলিলেন। কঠোপনিষদে আছে—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

গীতায় আছে—

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

এখানে গীতা যে কঠ-শ্রুতিরই প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর, কঠোপনিষদে আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

গীতায় আছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

এখানেও গীতা কঠ-শ্রুতির ভাষাতেই আত্মা যে অজ, অমর, নিত্য, শরীরের বিনাশে যে আত্মার বিনাশ হয় না, এসকল কথা বলিয়াছেন।

আর উপনিষদ এবং গীতা উভয়েই এই আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, ফলতঃ ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মৃতদের সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলে তারা আছে, কেহ বলে নাই, আমি তোমার নিকটে এই কথাটির তথ্য জানিতে চাই। যম ইহার উত্তরে বলিলেন—এই তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, ইহা অণুপরিমাণ সূক্ষ্ম, তর্ক-যুক্তির দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না।

তন্দুর্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষলাভ অতিশয় কঠিন, ইহা অত্যন্ত নিগূঢ় ও প্রচ্ছন্ন, হৃদয়ে অবস্থিত, ইন্দ্রিয়াতীত ও সূক্ষ্ম, কেবল জ্ঞানগম্যদেশে ইহার অবস্থিতি। এই পুরাতন দেবতাকে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষশোকের অতীত হয়েন।

নচিকেতা তখন বলিলেন—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥

ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, এই কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ যে জগৎ তাহা হইতে পৃথক্, যাহা হইয়াছে এবং যাহা হইবে তাহা হইতে পৃথক্, এমন যে বস্তু দেখিতেছ, তাহা বল। তখন যম কহিলেন, তুমি যে বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সমুদায় বেদ সেই পূজনীয়কেই কীর্ত্তন করে, সমুদায় তপস্যা তাঁহাকে পাইবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থীগণ তাঁহাকে পাইবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন,—

তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।

সেই বস্তুকে আমি তোমার নিকটে অতি সংক্ষেপে কহিতেছি—তিনি এই ওঁ। আর

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।

এই অক্ষরই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। আর এই কথা বলিয়াই বলিলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

সুতরাং আত্মতত্ত্ব আর ব্রহ্মতত্ত্ব এক, জীবাত্মা আর পরমাত্মা একই বস্তু, এই সিদ্ধান্তের উপরেই কঠ-শ্রুতির পরলোকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মবস্তুর কথা পুনরায় বলিতেছেন—

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥

অনিত্য-শরীরে অবস্থিত, কিন্তু আপনি অশরীরী যে মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা, তাঁহাকে জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কিছুতেই শোক করেন না। এখানে যে কঠ-শ্রুতি জীবাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু বলিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা অসাধ্য।

ভগবদগীতাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঠিক এই তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য—

যে শরীরীকে নিত্য বলা হইয়াছে, যাহা অবিনাশী ও অপ্রমেয়, এই দেহ তারই বটে, কিন্তু ইহার শেষ আছে।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥

তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জান, যাহাদ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই অব্যয় বস্তুর কেহ বিনাশ করিতে পারে না। এখানে গীতা "তৎ"-তাহাকে-বলিতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা দু'ই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিতেছেন—

যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা—

অর্থাৎ "যে সৎ-স্বরূপ বা সদাখ্যাত ব্রহ্মের দ্বারা এই জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে"—তাহাকে অবিনাশী বলিয়া জান।

এই সকল বিচার-আলোচনা করিয়া গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিতে যাইয়া যে উপনিষদের পন্থা অবলম্বনে ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আত্মার অমরত্বাদি ধর্ম্মকে যে তার ব্রহ্ম-সারূপ্য হইতেই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন, উপনিষদ যেমন আত্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, এই যে আমাদের মধ্যে অহং বা অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক বস্তু আছে, তাহাই যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মবস্তু, আর এই জন্যই এই অহং-বস্তুর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, ইহা অব্যয়, শাশ্বত, পুরাণ, "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"—শরীর হত হইলে এই আত্মা হত হয় না,—গীতাও সেইরূপই কহিয়াছেন।

আর এই আত্মতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ। কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই আত্মতত্ত্বের বা ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে এই তত্ত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, তোমাকে ত্রিগুণাতীত অবস্থা-লাভ করিতে হইবে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

সংসার-বীজভূত যে সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ আছে, বেদ-

সকল এই ত্রিগুণকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তুমি এই ত্রিগুণকে অতিক্রম কর। এই ত্রিগুণাতীত অবস্থাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। সে অবস্থা লাভ হইলে সাধক সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-রহিত হন, নিত্যসত্ত্বস্থ হয়েন, আর আত্মবান হইয়া থাকেন। আর এই অবস্থাই ব্রহ্মনির্ব্বাণের অবস্থা।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥

এই ব্রহ্মনির্ব্বাণই সর্ব্বোপনিষদের চরম-সাধ্য।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ (বেদান্তসূত্র—৪-৪-৪)

বেদান্তসূত্র এখানে এই ব্রহ্মনির্ব্বাণকেই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মোক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এই যে, মুক্ত পুরুষ আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অনুভব করেন। গীতা এই বেদান্ত-সম্মত ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই আত্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু পরে, এই তত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ভগবদ্গীতা যে আকারে আমাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে প্রথমে বিষয়ানুসারে ভাগ করিয়া লওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমান গীতাতে সাধনের কথার সঙ্গেই নানা তত্ত্বকথা মিশিয়া আছে। আর কোনও কোনও স্থলে এগুলি এমন ভাবে মিশিয়া আছে যে তাহাদের পূর্ব্বাপরের যোগ থাকে নাই। দৃষ্টান্তস্থলে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমাংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে কামরূপ মহাশত্রুকে কি করিয়া বিনাশ করিতে হইবে, তার উপদেশ রহিয়াছে। তার পরেই, একটা অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়া অবতার-তত্ত্বের কথা আনা হইল। ফলতঃ একথা গোড়ার কথাও নয়, মাঝখানের কথাও নয়, কিন্তু শেষের কথা। পঞ্চদশ অধ্যায়ে যে পুরুষোত্তম-

তত্ত্বের কথা আছে, এই অবতার-তত্ত্ব, প্রকৃতপক্ষে, তার পরের কথা। কারণ, ঐ পুরুষোত্তম-তত্ত্বটি না বুঝিলে এই অবতার-তত্ত্ব বুঝা আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ পুরুষোত্তম কথার পরেই এই অবতার-কথা আনা উচিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান গীতা-পুস্তকে কতকটা অপ্রাসঙ্গিক না হউক, অন্ততঃ নিতান্ত অবান্তর ভাবেই, চতুর্থ অধ্যায়ে এই কথাটা বলা হইয়াছে। আর বলা হইয়াছে মাত্র, প্রতিষ্ঠা ত হয়ই নাই, প্রতিষ্ঠার পথ পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে এই (গীতার ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে) যে যোগের কথা তোমাকে আমি বলিলাম, ইহা অতি পুরাতন বিষয়। আমি প্রথমে বিবস্বতকে এই যোগসম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলাম। বিবস্বত আপনার পুত্র মনুকে এই যোগের উপদেশ দেন। এইরূপে গুরু-পরম্পরায় এই যোগবিদ্যা রাজর্ষিগণ প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি। ইহাতে অর্জ্জুনের এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক—

অপরং ভবতোজন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥

বিবস্বত আপনার আগে আর আপনি বিবস্বতের পরে জন্মিয়াছেন। অতএব সর্ব্বাদৌ আপনিই যে বিবস্বতকে এই যোগবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন, ইহা কেমন করিয়া জানিব?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!
তান্যহং বেদ সর্ব্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!

তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে; আমি সে-সকল জানি, তুমি সে-সকল জান না। এই উত্তরই ত এখানে পর্য্যাপ্ত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মাদিব্যাপার জানি, একথা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক। কারণ জাতিস্মর যে হইতে

পারা যায়, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি যে লাভ করা জীবের পক্ষেও সম্ভব, একথা ত সকলেই জানে। সুতরাং কেবল এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অত বড় অবতার-তত্ত্বের কথা এখানে তুলার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আর এখানে তুলিয়াও তার কোনও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কিন্তু গীতার পদ্ধতি ত তাহা নয়। গীতা যে কথা যখন তুলিয়াছেন, তার একটা প্রমাণের, একটা মীমাংসার পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। এখানে তার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। এই জন্যই মনে হয় যে, আমরা যে আকারে পুস্তকখানি পাইয়াছি, কোন্ কথার পর কোন্ কথা স্বভাবতঃ আসা উচিত ছিল, কিন্তু আসে নাই বলিয়া তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই। আর এই কারণেই গীতার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে, তাহার তত্ত্বাঙ্গকে সাধনাঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

বিবেকবৈরাগ্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানের বিশিষ্ট সাধন। বেদান্ত এই সাধন-চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার হইতে অনিত্যকে অনিত্য ও নিত্যকে নিত্য বলিয়া যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, তাহাই বিবেক। আমরা দেহকেই আত্মা বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এই দেহ যে আত্মা নহে, এই জ্ঞানই নিত্যানিত্য-বিচারের মূল কথা। ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে এই বিবেক-শিক্ষাই দিয়াছিলেন।

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥

আমি, তুমি এবং এই সকল জনাধিপ কখনও ছিলাম না যে তাহা নহে; আমরা সকলে ভবিষ্যতে যে কোনও দিন থাকিব না, তাহাও নহে।

নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ

যাহা অসৎ তার অস্তিত্ব কখনও সম্ভবে না, যাহা সৎ তার নাস্তিত্বও কদাপি সম্ভবে না।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ

এই শরীর অন্ত বা বিনাশ-শীল, কিন্তু যার এই শরীর, সেই আত্মার বিনাশ নাই, তাহা নিত্য। এই সকল উপদেশই নিত্যানিত্য-বিবেক জাগাইবার উদ্দেশে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কেবল নিত্যানিত্য-বিচারের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয় না। তর্ক-যুক্তির দ্বারা ইহা বুঝিলেও, তাহাতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না। তার জন্য বৈরাগ্য-অভ্যাস করিতে হয়। "ইহামুত্রফলভোগত্যাগঃ বৈরাগ্যঃ"—ইহ-লোকে ধনমানাদি লাভের বাসনা ও পরলোকে স্বর্গাদিপ্রাপ্তির লোভ একান্তভাবে পরিত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য। আসক্তি হইতেই বন্ধন। এই আসক্তি হইতেই আমাদের অনাত্মবস্তুতে আত্ম-বোধ, অনিত্যতে নিত্যবোধ, অসারে-অসত্যে সার-ও-সত্য-বোধ জন্মে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

পুরুষেরা বিষয়ের ধ্যান করে, এই বিষয়-ধ্যান হইতে বিষয়াসক্তি জন্মে, এই আসক্তি হইতে তাহাকে লাভ করিবার জন্য কামনার উদয় হয়, কামনার ব্যাঘাতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মভ্রম) উৎপন্ন হয়, স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে জীব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব,

জহি শত্রুং মহাবাহো! কামরূপং দুরাসদম্

হে মহাবাহো! এই কামরূপ যে দুর্দ্দমনীয় শত্রু তাহাকে জয় কর। কি করিয়া এই কামরূপ মহাশত্রুকে জয় করিতে পারা যায়, গীতা

তার উপায় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, প্রথমে জ্ঞানযোগের পথ দেখাইয়াছেন। ইহাই উপনিষদের পথ। এই পথে গেলে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। এই সাধন উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কোনও তত্ত্বের আশ্রয়-গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন। তারপর ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের পথ দেখাইলেন। এখানেও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল তাহাতেই কুলায় না। কর্ম্মযোগের মূল কথা নিষ্কাম কর্ম্ম। কোনও কামনা না করিয়া, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিয়ত অর্থাৎ নিত্য কর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি, কিম্বা নৈমিত্তিক কর্ম্ম যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই কর্ম্মযোগের কথা। ব্রহ্মজ্ঞানীরাও এরূপভাবে কর্ম্ম করেন। করেন এই জন্য, যে না করিলে লোকস্থিতি রক্ষা হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোনও প্রকারের কর্ম্মের অপেক্ষা নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কোনও ফল পাইবার জন্যই লোকে কর্ম্ম করে। কিন্তু আত্মারাম মুনিগণ, যাঁহারা ব্রহ্মকে পাইয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বসংসারে কোনও প্রকারের কিছুর সঙ্গে প্রয়োজন-সম্বন্ধ নাই। অতএব কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের পুণ্য হয় না, না করিলেও প্রত্যবায় হয় না। তবে যে তাঁরা কর্ম্ম করেন, তাহা কেবল এইজন্য যে শ্রেষ্ঠজনেরা যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাদের দেখাদেখি, কর্ম্মের অপেক্ষা যাঁহাদের রহিয়াছে তাঁরাও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম লোপ পাইবে। তাহা হইলে, সমাজে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া লোকসকল উৎসন্ন যাইবে।

কিন্তু এই কর্ম্মযোগও শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ নহে। ইহা অভাবাত্মক, negative; ভাবাত্মক নহে। ইহাতে জীবকে অসাড়, জড়বৎ করিয়া তুলে; যন্ত্রেতে পরিণত করে। এভাবে কর্ম্মযোগ সাধন

করিয়া কৈবল্য লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভগবানের প্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগ। এই যোগের পথ দেখাইতে যাইয়াই, গীতা উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বকে ছাড়াইয়া উঠিলেন। জনকাদি ব্রহ্মবাদীগণ যেভাবে কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহা শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্রেষ্ঠতম পথ সে নয়।

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংনস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা—

নিত্যানিত্য বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, আমাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, কামনা ও মমতাশূন্য হইয়া, যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মযোগ। যাঁহারা জীব ও জগতকে ব্রহ্মভাবে দেখেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এই জ্ঞান যাঁহাদের ফুটিয়াছে, তাঁরাও যোগী। যাঁরা এই বিশ্বকে আপনার আত্মাতে দর্শন করেন, সর্ব্বভূতেতে যাঁহাদের আত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, পরমাত্মার উপাসক এই সকল সাধকও যোগী। কিন্তু

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

এই সকল নানা প্রকারের যোগীর মধ্যে যে সাধক দেহ, মন, প্রাণ, অন্তকরণ সমুদায় একান্তভাবে আমাকে অর্পণ করিয়া, আমার ভজনা করেন, তিনিই আমার মতে শ্রেষ্ঠতম যোগী।

আর এইখানেই গীতা উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্রের, পূর্ব্বতন জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে ছাড়াইয়া, একটা নূতন তত্ত্বের ও নূতন পন্থার নির্দ্দেশ করিলেন। এখানেই প্রশ্ন উঠে—ব্রহ্মাত্মৈকত্ববুদ্ধিতে যে যোগ লাভ হয় না, পরমাত্মার উপাসনাতে যে যোগ লাভ হয় না, তোমার ভজনাতে তাহা লাভ হয়,—এই তুমি কে?

আর ব্রহ্মযোগে ও পরমাত্মা-উপাসনাতে দেহাদিকে অবিদ্যা-বহির্বিষয়ানি বলিয়া উপেক্ষাই করিতে হয়। ইন্দ্রিয়াদির সংযমই সে পথের উপদেশ। এখানে সংযমের উপরেও যে আর একটা উন্নত-তর সাধন ও সিদ্ধি আছে, তার কথা বলিতেছ। তোমাতে ইন্দ্রি-য়াদি অর্পণ করিব, এই দেহ তোমাকে বিকাইয়া দিব, এই মন, বুদ্ধি সকলই তোমার করিয়া দিব, এও ত এক নূতন, এক অদ্ভুত কথা। কিন্তু এই বস্তুই ত আমি সজ্ঞানে অজ্ঞানে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া খুঁজিতেছি। এই তুমি কে?

এই প্রশ্নই গীতার মূল কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসা। পুরুষোত্তম তত্ত্বেতে এই জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইয়াছে। আর গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতেই, তিলে তিলে এই তত্ত্বটিকে গড়িয়া তুলা হইয়াছে,—পর-বর্ত্তী প্রবন্ধে ইহা দেখিব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

গান

মেঘের মাঝে অই যে ভাসে,
নীল-সাগরে নীলমণি !
আমার প্রাণের মাঝে কেমন করে,
আমি ঝাঁপ দিব তবে এখনি।
ওরে, অই যে হাসে,—অই যে ভাসে,
নীল-সাগরে নীলমণি !
এত দিনের সাধের ধন,
অই যে ডাকে ভয় কিরে মন !
ওরে তোরা ধরিস্ না মোরে,
আমি ঝাঁপ দিব আজ এখনি !
অই যে ডাকে, অই যে হাসে,
নীল-সাগরে নীলমণি !

নাটুকে রামনারায়ণ

[বাঙ্গালা সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য]

মধ্যযুগ।

রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুন্তীর জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছুপূর্ব্বে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন যে, বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য প্রথাতে সমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা দেখাইয়া যিনি একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি পতিব্রতোপাখ্যান নামক প্রবন্ধের রচয়িতাকে ঐরূপ পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই পুরস্কার রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় লাভ করিয়াছিলেন। এবারের পুরস্কারও তিনিই পাইলেন। চৌধুরী মহাশয় পঞ্চাশৎ মুদ্রাব্যয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক অফলা গাছে ফল ধরাইয়াছিলেন, তাহার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার নাম চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিবে। কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় শুধু যে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, পরবর্ত্তীকালের বাঙ্গলা সাহিত্যের কর্ণধারগণও শিক্ষানবিশী অবস্থায় তাঁহারই নিকটে বিশেষ উৎসাহ ও পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের "প্রভাকরের" যখন পূর্ণ প্রভাব তখন কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রভাকরে কবিতার কুস্তি লড়িয়া হাত পাকাইতেছিলেন। প্রভাকরে সেই কবিতার লড়াই অনেকদিন ধরিয়া "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে প্রকাশিত হয়। কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যুযুধান বালকবীরগণকে ৫০৲ পুরস্কার দিয়া সেই কবিতা-যুদ্ধের অবসান করেন। রঙ্গলালের

কালীচন্দ্র চৌধুরী।

পদ্মিনী উপাখ্যান রচনায়ও কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহ কার্য্যকরী হইয়াছিল। বস্তুতঃ বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই নবজাগরণোৎ-সবে কমলার বরপুত্রগণের সহিত বাগ্দেবীর চির-দরিদ্র উপাসকগণের এমন আশ্চর্য্য মিলন সংঘটিত হইয়াছিল যে, সাহিত্যের ইতিহাস লেখ-কের নিকট তাহা অনুকূল দৈবঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হয়।

কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার দক্ষিণস্থ হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

তাঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। গ্রামস্থ চতুষ্পাঠীতেই তাঁহার বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। যৌবনে তিনি সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালাভ করেন এবং তথায়ই পাঠ সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইবার দুই বৎসর পরে ঐ কলেজেই তিনি এক অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন এবং সেই পদেই জীবন অতিবাহিত করিয়া যান। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখনই তিনি বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখকরূপে অবতীর্ণ হইয়া পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক রচনা করিয়া পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি উপাধি লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ লাভ করিবার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কুলীনকুলসর্ব্বস্ব রচনা করিয়া পুরস্কৃত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার অল্পকাল মধ্যে তিনি শকুন্তলা, রত্না-বলী ও বেণীসংহার, এই তিনখানা সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনু-দিত করেন। স্বনামখ্যাত আশুতোষ দেবের বাটীতে শকুন্তলা, কালী-প্রসন্ন সিংহের বাটীতে বেণীসংহার, এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রত্না-বলীর অভিনয় হয়। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চড়কডাঙ্গাস্থ জয়রাম বসাক মহাশয়ের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহে গঠিত যোড়াসাঁকো নাট্য-

সমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার নবনাটক রচিত করেন এবং তাহার জন্য পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পান। রুক্মিণী-হরণ নামক আর একখানা নাটকও তর্করত্ন মহাশয় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত অমুদ্রিত কয়েকখানি নাটকও নাকি আছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকে গমন করেন।

পরিশিষ্ট।

এই অমুদ্রিত নাটকগুলি কোথায় কি অবস্থায় আছে জানি না। যদি নষ্ট হইয়া না গিয়া থাকে তবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য এই-গুলি উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করা। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের জীবনের বেশী কিছু বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ৺রামগতি ন্যায়-রত্ন মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব (১ম সংস্করণ—১২৮০ সন) এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মাইকেলের জীবনচরিত হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ভিন্ন তর্করত্ন মহাশয়ের আর কোনও মুদ্রিত নাটক সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। তাঁহার নাট্য গ্রন্থাবলীর ভাল এক সংস্করণ কোন প্রকাশক বাহির করেন না কেন? আমরা শুধু কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকখানার আলোচনা করিয়াই তর্করত্ন মহাশয়ের নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিব। বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের আলোচনায় হাত দিয়া বুঝিতেছি যে, মফঃস্বলে বসিয়া একাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠা কঠিন। লেখকই যখন লিখিয়া তৃপ্তি পাইতেছে না, তখন পাঠকের তৃপ্তি ত সুদূরপরাহত। রামনারায়ণের জীবন-কাহিনী, রামনারায়ণের নাট্যাবলীর ধারাবাহিক ইতিহাস ও বিবরণ এখনও কলিকাতায় বসিয়া একটু চেষ্টা করিলেই উদ্ধার করা যায়। কলিকাতায় এমন উৎসাহী লেখক কি কেহই নাই যিনি একটু খাটিয়া রামনারায়ণের নাট্যজীবনের কাহিনী উদ্ধার করিয়া অন্ততঃ একটা মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও ধরিয়া রাখিয়া বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের ভাবী ইতিহাস লেখকের পথ একটু কম বন্ধুর করিয়া রাখেন?

নবনাটকের উৎপত্তির ইতিহাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ১৩২১, ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনস্মৃতি হইতে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাঁহার ঝোঁক ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার গুণু দাদারও খুব অনুরাগ ছিল। তাঁহারা দু'জনে মিলিয়া বাড়ীতেই একটি নাটকীয় দলের সৃষ্টি করিলেন। সমিতির নাম হইল Committee of Five। কৃষ্ণবিহারী সেন (কেশব সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিবাবু, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—এই পাঁচজনে এই নাট্য-সমিতির সভ্য হইলেন। * * * ইঁহারা দেখিলেন বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনয়োপযোগী নাটকমাত্র দুই তিন খানি। কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষার মত কোন জিনিসই নাই। আমোদের পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া যাহাতে শিক্ষায় হয় তজ্জন্য ইঁহারা একটু চঞ্চল হইলেন। * * কাগজে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে, যিনি একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন এবং যাঁহার রচনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাঁহাকে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকখানি নাটক পাওয়া গেল; কিন্তু পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত বলিয়া একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতিযোগীতায় আশানুরূপ সুফল ফলিল না দেখিয়া Committee of Five স্থির করিলেন যে, একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকারের উপর ভার অর্পণ করাই সুবিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক অতি অল্পই ছিল। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এ সময়ে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামে একখানি নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই শেষে এই ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামাজিক নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন। গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে তখন তাঁহারাই এ কার্য্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন এবং পুরস্কারের পরিমাণও পাঁচশত করিয়া দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিষ্কৃতি পাইলেন তেমন অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া উঠিলেন। নাটক রচিত হইল। নাটকের নাম ছিল নবনাটক। যেদিন এই উপলক্ষ্যে তর্করত্ন মহাশয়কে পুরস্কার দেওয়া হয়, সে একটি স্মরণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সভার মধ্যস্থলে একটি রূপার থালায় নগদ ৫০০৲

সাজাইয়া রাখা হইল এবং সভাস্থলে নাটকখানি আগাগোড়া পঠিত হইল। শুনিয়া সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন ঐ পাঁচশত টাকা তর্করত্ন মহাশয়াকে প্রদান করা হইল। তিনিও ইহাতে খুব খুসী হইলেন। * * অভিনয়ের উদ্যোগ আয়োজনে কিছুকাল খুব আমোদে কাটিয়া গেল। * * অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কখনও বা হাসির ফোয়ারা ছুটিত কখনও বা অশ্রুজলের ধারা বর্ষিত হইত। প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া "শা—রা পলাট্ (plot) নাই পলাট্ নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক্"। সমালোচকদিগের উপর এইরূপ মধুবর্ষণ করিয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। এ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে, তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী নবনাটক অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম, তাহা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেন না নবনাটক তখন দেশে বেশ একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল। (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতী, ভাদ্র ১৩২১)

ক্রমশঃ।

নারায়ণ

২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা] [আশ্বিন, ১৩২২

কিশোর-কিশোরী

কেন হাস ? মিথ্যা একি ? অলীক ঘটনা ?
আমি কি করেছি শুধু স্বপন রচনা ?
তবে কেন চিত্ত মাঝে আজো কেঁপে উঠে ?
পরাণের কুঞ্জে কুঞ্জে কেন পুষ্প ফুটে ?

এই যে দিবস নিশি মোর চারি পাশে
হৃদয়ের অন্তস্তলে, আকাশে বাতাসে,
সকল বিশ্বের মাঝে ফুলের সৌরভ !
মিথ্যা এ আনন্দ ভাস ? মিথ্যা এ গৌরব ?

সকল পরাণে মোর সারা দেহময়
এই যে দিবস নিশি কি যে কথা কয়,
কত না জীবন্ত ভাবে কত শত সুরে,
বাজিছে গানের মত এই প্রাণ পুরে !—

কভুবা গভীর কভু মধুর সরল,
কভুবা কঠিন কভু করুণা তরল!
নিমেষে নিমেষে মোরে হাসায় কাঁদায়
নিমেষে নিমেষে মোরে মরায় বাঁচায়!

এও মিথ্যা! আমি আছি, তাও মিথ্যা তবে?
আমি নাই! তুমি নাই কিছু নাই ভবে!
মিথ্যা তবে সেদিনের ধূসর গগন!
তুমি মায়া, আমি মায়া! মোদের মিলন

মিথ্যা সে মায়ার খেলা! সেই মধু হাসি?
সেই যে অধরে তব উঠেছিল ভাসি?
তাও ভুল? তাও স্বপ্ন? তাও মিথ্যা তবে?
চোখের চাহনি সেই? তাও মিথ্যা হবে!

সেই যে কি জানি কেন বক্ষের দোলনি!
অবাক বিভোর সেই চক্ষের চাহনি!
যেন কোন দূরাগত সঙ্গীতের বাণী
সচকিত করেছিল সব দেহখানি!

স্রোতে ভাসা দেহ মন তরঙ্গ মূরতি!
সকল চাঞ্চল্যভরা, অচঞ্চল গতি
ফুটিয়া উঠিল সেই—চিরদিন তরে
আমার বক্ষের মাঝে পঞ্জরে পঞ্জরে!

এও তবে মিথ্যা কথা! শুধু স্বপ্ন বুঝি?
আমি তো হেরিছি সদা দুটি চক্ষু বুজি!
হারাইয়া যায় ব'লে বক্ষ চেপে রাখি
আমি যে হেরিছি সদা—তাও মিথ্যা নাকি?

তবে মিথ্যা মিথ্যা সেই আনন্দের ভাস
আমি মিথ্যা, মিথ্যা সেই, মায়া সন্ধ্যাকাশ!
মিথ্যা সেই মধুভরা শ্যাম দূর্ব্বাদল
মিথ্যা সেই প্রাণভরা আঁখি ছল ছল!

মিথ্যা সেই সত্য-রূপী মূরতি তোমার
আমি মিথ্যা তুমি মিথ্যা সবি মিথ্যাকার!
জগৎসংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা!
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা?

মিথ্যা সেই কোমলতা করুণা-রূপিনী!
বুঝিবা চোখের দোষে দেখিতে পারিনি
ভাল করে' সন্ধ্যালোকে, সেই সে তোমারে
মায়া-মন্ত্রালোক-ঘেরা, সন্ধ্যার আঁধারে!

কে দিল নয়নে মায়া-অঞ্জন বুলায়ে?
সকল অন্তর মোর কে দিল ভুলায়ে?
ওগো আমি কারে বলি কারে হেরিলাম
নয়ন-পুত্তলি—মম আঁখি অভিরাম!

তবে কি হেরেছি যাহা তুমি তাহা নহ?
ওগো মায়া! ওগো মিথ্যা! সত্য ক'রে কহ!
কোন্ দানবের সৃষ্টি দেবীর আকারে
কেন এলে সেই দিন মোরে ছলিবারে?

তবে কোন ছদ্মবেশী রূপসী রাক্ষসী
আমার এ অন্তরের অন্তঃপুরে বসি
যত না মাধুরী ছিল, ছিল যত প্রাণ,
একই নিশ্বাসে যেন করেছিল পান,

চিরস্মরণীয় সেই সন্ধ্যাকাশতলে ?
আনন্দ-আবেশ-ভরে নয়নের জলে
আমি যে হেরিনু তব নিত্য মধুরূপ ;—
প্রাণ-স্রোতে টলমল পদ্ম অপরূপ !

আজো হেরিতেছি তাই সেই সে তোমারে
দিবালোক-মহিমায় নিশীথ আঁধারে !
সকল জীবন ভরি প্রত্যেক নিমেষে
সকল কর্ম্মের মাঝে সব কর্ম্ম শেষে !

সেই সেই তরঙ্গিত পরাণ মূরতি
সকল চাঞ্চল্যভরা অচঞ্চল গতি
সকল লাবণ্য-গড়া রূপে ঢল ঢল
পরাণ-তরঙ্গে সেই স্থির শতদল !

সঘন গগনে থির চপলার মত
উজলি জীবন মোর জ্বলে অবিরত !
সকল করম মাঝে সব কামনায়
সকল ভাবের মাঝে সব ভাবনায় !

সকল ঘুমের মাঝে সব চেতনায়
সকল সুখের মাঝে সব বেদনায়
সকল স্বপন মাঝে সব সাধনায়
সকল ধ্যানের মাঝে সব ধারণায় !

মিলনের মন্ত্রপড়া সেই সন্ধ্যাতলে
সেই মধু জল জল শ্যামদূর্ব্বাদলে
অবাক নয়নে তুমি দাঁড়ালে যখন
অন্তহীন মহিমায় ! সেই সে তখন—

অনিত্য কালের মাঝে একটি নিমেষ
চমকি' থমকি' যেন আনন্দে অশেষ
ফুটিল গৌরবভরে চির-নিত্য হয়ে ;
ঘিরি তারে কালস্রোত যেতেছিল বয়ে

অফুরন্ত চির-সত্য অনন্ত অশেষ
অনিত্য কালের মাঝে সেই সে নিমেষ !
চিরদিন জাগিবে সে আপন গৌরবে !
তুমি আমি যত দিন তত দিন রবে !

সেই সে নিমেষ মাঝে তুমি দেখা দিলে
তুমি কিগো চিরকাল তারি মাঝে ছিলে ?
কোন্ মহা-পরাণের বাঁশরী শুনিলে
আপনার আবরণ খুলে ফেলে দিলে !

সেই যে মুহূর্ত্ত মোর, তুমি মূর্ত্তি তার !
নহ মিথ্যা ! সত্য তুমি, সত্য রূপাধার !
সত্যই সেদিন আমি নয়নে হেরেছি,—
সত্যই পরাণ ভ'রে পরাণে তুলেছি !

অখণ্ড সুন্দর তনু মধুর গম্ভীর
রূপ রস গন্ধ ভরা আত্মার মন্দির ।
পদতলে কলকলে কাল ঊর্ম্মিমালা
শিরে কোন দেবতার নিত্য দীপ জ্বালা ।

এই যে প্রত্যক্ষ মোর প্রাণ মাঝে জাগে
তোমারে বুঝাতে নারি তাই ব্যথা লাগে !
কেমনে বুঝাব তোমা ! ওগো বক্ষবাসি,
আমি সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি !

মনে হয় চিরকাল ভেসে ভেসে যাই!
কত জনমের সাধ বুকে লয়ে তাই
সেই সে মুরতি-স্রোতে দিবানিশি ভাসি!
এখনো সন্দেহ তব? ফের ওই হাসি?

আরে আরে অবিশ্বাসি! আরে রে নির্দ্দয়!
ওই তব বক্ষতলে নাহি কি হৃদয়?
সেদিন কি প্রাণে প্রাণে ডাকে নাই বান?
ফুলে ফুলে উঠে নাই সকল পরাণ?

ভেসে বহে যায় নাই সকল মরম,
ডুবাইয়া সব কর্ম্ম, সকল ধরম,
ওই কোথাকার সুধা সাগরের পানে,—
পেতে পেতে নাহি পাওয়া কাহার সন্ধানে?

আমার পরাণ ভ'রে কি গীত গুঞ্জরে!
মরমের প্রতি পত্রে কি ফুল মুঞ্জরে!
বুঝাতে পারি না তোরে তাই কাঁদে প্রাণ,
পরাণ ছাপায়ে তাই ভাসে দুনয়ান!

ওগো মর্ম্মলতা! মরমে জড়ায়ে থাক!
আমার বক্ষের মাঝে রাখ মুখ রাখ!
তবে যদি নীরবে গো পারি বুঝাইতে
আজো যাহা পাই নাই হেরিতে শুনিতে!

রাখি বুকে বুক, করগো হৃদয়ঙ্গম
প্রাণ-গঙ্গা মোর কোন সাগর-সঙ্গম
পানে বহে চলিয়াছে, দিবসরজনী
কার পিছে পিছে, শুনি কার শঙ্খধ্বনি!

বুঝিতে পার না কিছু? থাক তবু থাক
আমার বক্ষের মাঝে লতাইয়া থাক!
তোমারে হৃদয়ে রাখি মোর মনে হয়
কে যেন আমার মাঝে সদা কথা কয়!

কে যেন ডাকিছে কত মধুর মন্তরে
আমাদের দুজনের অন্তরে অন্তরে!
কে যেন গো এসে এসে ফিরে চলে যায়
হেসে হেসে জীবনের বিজন তলায়!

ওগো মর্ম্মলতা! থাক তবু থাক
আমার মর্ম্মের মাঝে জড়াইয়া থাক!
তুমিও শুনিবে প্রাণ! আমি যদি শুনি!
সেই তার নূপুরের মধু রুণু রুণী!

তুমিও হেরিবে প্রাণ! আমি হেরি যদি!
চিত্তমাঝে রবে বাঁধা নিত্য নিরবধি!
দেখিব দেখাবো তোরে মরমে মরমে
জীবন মরণ ভ'রে জনমে জনমে!

নাটকে রামনারায়ণ

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত ছয় অঙ্কে সমাপ্ত নাটক। প্রথমে নাট্যারম্ভে নান্দী, তাহাতে উমা মহেশ্বরের স্তব করা হইয়াছে। নান্দ্যান্তে সূত্রধার ও নটী প্রবেশ করিয়া নাটকের বিষয়টি সূচিত করিয়া দিয়া প্রস্থিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের যেমন গদ্যাংশের মধ্যে মধ্যে পদ্য সন্নিবিষ্ট, কুলীনকুলসর্ব্বস্বেও সেই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। আদিযুগের নাট্য-চেষ্টা ও মধ্যযুগের নাট্য চেষ্টায় যে হঠাৎ কত বড় একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে, কুলীনকুলসর্ব্বস্ব পাঠমাত্র তাহা বোধগম্য হয়। কৃষ্ণযাত্রা এবং রামযাত্রাগুলি যেপথে চলিতেছিল, এ সে ধারাই নহে, একেবারে ভিন্ন। বাঙ্গলা ঘর-গৃহস্থালীর অশ্রুময়ী-ভাব-বিগলিত-হৃদয়া বিপর্য্যস্তবেশবাসা, স্বর্গস্বপন বিভোরা অবগুণ্ঠনবতী বধূটি যেন হঠাৎ সমস্ত ভাবের আবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অধিকাংশ অলঙ্কার ছুড়িয়া ফেলিয়া স্বর্গের স্বপ্নকে একান্ত অলীক বলিয়া সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া একখানা সামান্য শাড়ী পরিধান করিয়া নুণ তৈলের হিসাব লইয়া বসিয়া গেলেন। কবিত্ব হিসাবে, শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হিসাবে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য যাহা হারাইল তাহা আজিও সম্যক ফিরিয়া পায় নাই। গভীরতা ফিরিয়া পায় নাই বটে, কিন্তু বিস্তৃতিতে বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য বিশ্বসাহিত্য স্পর্শ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। দৃশ্যকাব্য সামাজিক জীবনের পরিচালক, পরিমাপক এবং চিত্র—সমস্ত দেশে সমস্ত যুগেই দৃশ্যকাব্যের ইহাই কার্য্য। কিন্তু চৈতন্যের জন্মস্থান এই বাঙ্গলা

আদিযুগ ও মধ্যযুগের বিভিন্নতা

দেশে, বাউলগান ভাটিয়াল গানের জন্মস্থান এই বাঙ্গলাদেশে, দৃশ্যকাব্য দৃশ্য অংশকে হীন করিয়া কাব্য অংশকে আশ্চর্য্য প্রাধান্য প্রদান করিয়া এক নূতন হ্রস্ব পথ অবলম্বন করিয়া সহজে যাইয়া আনন্দ-সমুদ্রে লান হইয়াছিল। মধ্যযুগের নাট্যকারগণ দৃশ্যকাব্যের স্রোতকে সর্ব্বজনপরিচিত পথে ফিরাইয়া আনিয়া সমাজকে আবেষ্টিত করিয়া তাহা বহাইয়া দিলেন। লক্ষযোজন দূরের তারকার রহস্যময় আলোকবিন্দু সহসা গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত ধূমোদগারী দীর্ঘ কেরাসিন শিখায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন হইতে আর দৃশ্যকাব্যে লোকাতীত প্রেমোন্মাদের স্থান নাই—এখন সমস্ত সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ ফিটফাট ও হিসাবী। বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্য যেন কেঁচে গণ্ডূষ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশ্য হইয়া দাঁড়াইল।*

কুলীনকুলসর্ব্বস্বকে প্রাণবান্ সাহিত্যের আদর্শে বিচার করিতে

---

* সঞ্জীববাবু পুরাতন বঙ্গদর্শনে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন—"বিদ্যাসুন্দরের ভক্তগণ বোধ হয় এই তুলনায় বুঝিতে পারিবেন পূর্ব্বকালের কীর্ত্তন কি যাত্রা এখনকার অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। উহার প্রণেতৃগণ কবি ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। সচরাচর যেরূপ চিত্তবৃত্তির বেগ দেখা যায় তাহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাধারণ চাই। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ স্বর্গীয় সুখসৌরভমাখা অকৃত্রিম পবিত্র চিত্তের পরিচয় পাইলেও সুখ হয়। * * * বাঙ্গলায় আর পূর্ব্ব সুর নাই। যে সুর শুনিলে যেন জন্মান্তরীণ সুখ চকিতের ন্যায় স্মরণপথে আসিয়া হৃদয় কম্পিত করিয়া যাইত, আর সে সুর নাই। যে সুর ধীরে ধীরে তোমার রক্ত স্তম্ভিত করিয়া তোমায় অবশ করিয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে সামান্য প্রদীপ হইতে নয়ন ফিরাইয়া চন্দ্রালোক প্রতি চাহিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। যে সুর শুনিলে আতর দূরে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মগন্ধ আকাঙ্ক্ষা করিতে, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গলার সুর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

গেলে, এমন কি সম্পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যকাব্য হিসাবে দেখিতে গেলেও তাহার মূল্য খুব বেশী হইবে না। দৃশ্যকাব্যের একটা নূতন ধারার আদি নাটক বলিয়াই ইহার প্রধান গৌরব। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব পাঠ করিয়াই বুঝা যায় যে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় ভাষার আসরে নামিয়া কালিদাস ভবভূতিকে স্মরণে রাখিতে পারেন নাই। ছয়টি অঙ্ক কোনরকমে একত্র গাঁথিয়া তিনি যে একখানি নাটক গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ছয় অঙ্কব্যাপী সামাজিক বিতর্কসঙ্কুল কথোপকথনেই পর্য্যবসিত হইয়াছে,—তাহাতে "পলাট্" (plot) তো নাই-ই, চরিত্র-চিত্রণের কোন চেষ্টাও দেখা যায় না। এই নাটকে কৌলীন্য প্রথার এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের যে একখানা অবিকল ছায়াচিত্র দেখিতে পাই তাহা উপভোগ্য বটে এবং সাহিত্যিক হিসাবে তাহাই এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ দান; কিন্তু যে রসের স্পর্শে কথোপকথন সাহিত্য হইয়া উঠে, সেই প্রাণরসের বিকাশ পুস্তকে কোথাও বিশেষ নাই। তাই পরবর্ত্তীকালে সামাজিক নাটক অনেক রচিত হইয়া থাকিলেও এমন কঠিন ভাবে নিঃসঙ্কোচে সমাজের দুর্ব্বলতাগুলি আক্রমণ করিতে আর কাহাকেও দেখি না। সামাজিক দিকটা কুলীনকুলসর্ব্বস্বের এখনও এমন তাজা রহিয়াছে যে কয়েক সহস্র কুলীনকুলসর্ব্বস্ব মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বাঙ্গলার কুলীনপ্রধান গ্রামগুলিতে বিতরিত হইলে প্রভূত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

দৃশ্যকাব্য হিসাবে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

কিন্তু সামাজিক নাটক হিসাবে এই গ্রন্থের যে একটি বিশেষ গৌরব আছে, বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসলেখক তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। শিশু যেমন শৈশবের সরলতায় ভয় বা সঙ্কোচ কাহাকে বলে তাহা জানে না, বাঙ্গলা দৃশ্যকাব্যের অতি শৈশবাবস্থায় রচিত এই নাটকখানিতে সেইরূপ শিশুসুলভ একটা

সামাজিক নাটক হিসাবে কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব।

সরলতা, নির্ভীকতা ও সঙ্কোচহীনতা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ সমাজের বিশেষতঃ কুলীন সমাজের গলদগুলিকে এমন নির্দ্দয়ভাবে উলঙ্গ করিয়া দেখান হইয়াছে, এমন নির্ভীকভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে যে, পরবর্ত্তী বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার তুলনা মিলা কঠিন,—এক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গানগুলির কথা মনে হয়। বিংশ শতাব্দীর কুটিল সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে বাসকারী আমরা, এই সরলতা, এই সঙ্কোচহীনতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যের মধ্যে, বক্তব্য ও অবক্তব্যের মধ্যে আমরা দৃঢ় রেখা টানিয়া দিয়াছি, "হিতং মনোহারী চ" আমাদের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে।

এই পুস্তকের সেকেলে রসিকতাগুলি সেকালে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই কিন্তু একালে তাহারা বিশেষ আদৃত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অসাধারণ প্রতিভাবান্ ভিন্ন কালের এবং বেষ্টনীর প্রভাব কেহ বড় অতিক্রম করিতে পারেন্ না; তর্করত্ন মহাশয়ের নাটকাবলী তাহার এক বড় প্রমাণ। শকুন্তলা রত্নাবলী উত্তররামচরিত মৃচ্ছকটিক পাঠ করিয়াও তর্করত্নমহাশয় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দরাদি হীন ধরণের নাট্য-চেষ্টার পাতনামির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই এবং সমাজের চিত্র আঁকিতে তাঁহার পাঁক ঘাঁটাই সার হইয়াছে; এমন কিছু আমাদের সম্মুখে তিনি ধরিতে পারেন নাই যাহা দেখিবামাত্রই হৃদয়ে আনন্দের আবির্ভাব হয়—মন উন্নত ও পবিত্র হয়।

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব হাস্যরসপ্রধান গ্রন্থ—কিন্তু সে হাস্য সাময়িক হাস্য—কালক্রমে তাহা এখন পচিয়া গিয়াছে। শুভ্র শাশ্বত কৌতুকরস কুলীনকুলসর্ব্বস্বে বেশী নাই। কিন্তু হাস্যরস ছাড়া এই গ্রন্থে আর এক রস আছে—তাহা স্বাভাবিকতা। তর্করত্ন মহাশয়ের হাস্যরস কালক্রমে বাতিল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যকে অনুপ্রাস যমক সমাসের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি যে তাহাতে স্বাভাবিক

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের স্বাভাবিকতা।

কথাবার্ত্তা চালচলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, দৃশ্যকাব্য এখনও সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। অভিধান-সম্বল মাইকেল নাট্য-সাহিত্যে ইংরেজী রীতির প্রচলন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার ইংরেজী রীতির নাটক সংস্কৃত-পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয়ের নাটকের চেয়ে বেশী সংস্কৃত ঘেঁষা। দীনবন্ধু মিত্র তর্করত্ন মহাশয়ের স্বাভাবিকতার প্রধান উত্তরাধিকারী এবং তিনিই নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতার জন্য স্থায়ী আসন নির্ম্মিত করিয়া যান। দীর্ঘকালস্থায়ী গৈরিশ ছন্দের বজ্রনাদেও তাহা যে স্থানচ্যুত হয় নাই—"বলিদান" ইত্যাদি নাটকই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গলা নাটকে এখনও অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাসময় দীর্ঘ বক্তৃতার (Declamation) প্রাধান্য রহিয়াছে কিন্তু বাঙ্গলা নাটকে নূতন যুগের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে এবং স্বাভাবিকতা ক্রমেই জয়লাভ করিতেছে।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের গল্পাংশ অতি হ্রস্ব, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কুলপালক নামক রূপক নামধারী এক প্রধান কুলীন ব্রাহ্মণ লোকনিন্দায় অস্থির হইয়া অদিনে অক্ষণে তাঁহার ৩২, ২৬, ১৫ ও ৮ বৎসর বয়স্কা চারি কন্যাকে একই দিনে একই বৃদ্ধ মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করিলেন—ইহাই কুলীনকুলসর্ব্বস্বের বর্ণিতব্য বিষয়। ইহার সঙ্গে নানা বাজে কথা জুড়িয়া দিয়া নাটকখানিকে বড় করা হইয়াছে।

প্রথম অঙ্কে নট ও নটী নাটক সূচিত করিয়া দিয়া প্রস্থিত হইলে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুলধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় প্রবিষ্ট হন। কুলপালক মহাশয় দুঃখ করিতে থাকেন যে, তাঁহার ৩২,২৬,১৫,৮ বৎসর বয়স্কা চারি কন্যার বিবাহ হইতেছে না বলিয়া লোকে অন্যায়মত তাঁহার নিন্দা করিতেছে। কুলধন মহাশয় সায় দিয়া বলিলেন যে কন্যাদের কিছুই বয়স হয় নাই, এত অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া কোন কাজের কথা নহে—লোকের নিন্দায় কি আসে যায়?

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের গল্পাংশ।

তথাপি লোকনিন্দায় ও ব্রাহ্মণীর আদেশে কুলপালক মহাশয় নিজে এবং শুভাচার্য্য ও অমৃতাচার্য্য নামক দুই জন ঘটক নিযুক্ত করিয়া পাত্রের খোঁজ করিতেছেন—জানাইয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

শুভাচার্য্য ও সুধীর নামক দুই ঘটকের কথোপকথনে দ্বিতীয় অঙ্ক আরব্ধ হইয়াছে। শুভাচার্য্য কুলশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সুধীর শুনিতেছিলেন, এমন সময় অমৃতাচার্য্য প্রবেশ করিল। ইহার পরে ঘটকদের কলহের একটি কৌতুকাবহ পরম উপভোগ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেমন স্বভাবানুযায়ী তেমনি তীব্র শ্লেষপূর্ণ। গণ্ডমূর্খ, অথচ দাম্ভিক ও মুখসর্ব্বস্ব অমৃতাচার্য্যের নিকট বাগ্‌যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মানে মানে সুধীর ও শুভাচার্য্য প্রস্থান করিলে, কন্যা-বিবাহ বিলম্বে খেদ করিতে করিতে কুলপালক প্রবেশ করিলেন। অমৃতাচার্য্য তাঁহাকে জানাইল যে তাঁহার কন্যাদের জন্য ষষ্ঠীবৎসর বয়স্ক এক পাত্র বহু পরিশ্রমে সে ঠিক করিয়া আসিয়াছে, বিলম্ব করিলে এমন সুপাত্র হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তখনি গ্রহাচার্য্য ডাকিয়া বিবাহের দিন দেখান হইল, কিন্তু শীঘ্র বিবাহের দিন ছিলনা। এবং অদিনকে গ্রহাচার্য্য অমৃতাচার্য্যের অশেষ বাক্‌চাতুরীতেও কিছুতেই সুদিন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেনা দেখিয়া, তাহাকে বিদায় দিয়া দিনক্ষণ না দেখিয়া তাহার পরদিনই বিবাহ ধার্য্য হইয়া গেল। পাত্র হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে কুলপালক মহাশয়ও আপত্তি করিলেন না।

তৃতীয় অঙ্কে কুলপালকের স্ত্রী আসন্ন কন্যাবিবাহের আনন্দে হৃষ্টা। চারি কন্যা জাহ্নবী শাম্ভবী কামিনী ও কিশোরীকে ডাকিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে আজই তাহাদের বিবাহ—

"এতকালে প্রজাপতি হলো অনুকূল।
ফুটিল তোদের বুঝি বিবাহের ফুল॥"

শুনিয়া জাহ্নবী বিষণ্ণা ও শাম্ভবী আশ্চর্য্যান্বিতা হইল এবং কামিনী বরের বাসা কোথায়, দেখিতে কেমন, কত বয়স ইত্যাদি জানিবার

জন্য অত্যন্ত উৎসুকা হইয়া পড়িল। আর কিশোরী বিবাহ যে কি তাহা বুঝিতেই পারিল না। তাহাদিগকে শাস্ত করিয়া কুলপালকের স্ত্রী নিজ কাজে চলিয়া গেলেন, কন্যাগণও চলিয়া গেল। ইহার পরে রসিকা নাম্নী এক নাপ্তিনী এবং দেবল নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণকে অনর্থক আনিয়া তাহাদের মুখে কতকগুলি ছন্ন অশ্লীল কথা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা প্রস্থিত হইলে, কুলপালকের বাটীতে এয়োগণের আগমন হইল। ব্রাহ্মণী তাহাদের জলসৈতে যাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। এয়োগণ বরের সমালোচনা করিতে করিতে নিজেদের দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া নিজ নিজ শোচনীয় দাম্পত্যাবস্থার বিবরণ বলিতে লাগিলেন এবং যেমন তেমন করিয়া উপকরণ সাজাইয়া জলসৈতে চলিয়া গেলেন। কেবল যশোদা নাম্নী একটি বিধবা সদার্ঘ নিশ্বাসে আপনার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিল; কারণ তাহার কোন শুভকার্য্যে যোগদান করিবার অধিকার পর্য্যন্ত নাই। এমন সময় ফুলকুমারী নাম্নী তাহার নাতিনী সম্পর্কীয়া এক কুলীন কুমারীর প্রবেশ। ফুলকুমারীর চক্ষু লাল দেখিয়া একটু পরিহাস করিতেই ফুলকুমারী সবিষাদে নিজের দুঃখকাহিনী বলিতে লাগিল।—ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়া সে সমাচার পাইল যে স্বামী আসিয়াছে। চিরপতিবিরহিণী কুলীনকন্যা—বহুদিন পরে স্বামী আসিয়াছে—কত সাধ কত সোহাগ ফুলকুমারীর মনে উঠিতে লাগিল। আহ্লাদে, গর্ব্বে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ী আসিয়াই স্বামীর "রঙ্গ দেখিয়া হরিভক্তি উড়িয়া গেল।" জামাই দেখিয়া সকলে শশব্যস্ত হইয়া বসিবার জন্য গালিচা পাতিয়া দিল, কিন্তু জামাইয়ের ধনুর্ভঙ্গপণ,, ব্যাভার না পাইলে সেই বাড়ীতে পাও ধুইবে না। ফুলকুমারীর দুঃখিনী মাতা খাড়ু বাঁধা দিয়া কিছু টাকা প্রতিবাসীর নিকট হইতে লইয়া আসিলেন,—সেই টাকা জামাইয়ের হাতে দেওয়া হইল, তার পরে জামাই পা ধুইলেন—তাও অল্প হইল বলিয়া তীক্ষ্ণ দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। জামাইয়ের জন্য যথাসাধ্য খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন

হইতে লাগিল, ফুলকুমারীর ভাই গিয়া নিজে হাতে ধরিয়া জামাইকে নিয়া আসিল। জামাই বড় পীড়ির উপর বসিয়া এটা ফেলিয়া ওটা ছড়াইয়া নবাবী করিয়া খাইয়া উঠিলেন।

ইহার পরের বিবরণ হৃদয়বিদারক, কিন্তু এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কুলীন-প্রধান গ্রামসকলে ইহার সতত পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ফুলকুমারী একাকিনী পতির অপেক্ষা করিয়া শয্যায় শুইয়া পতির নিকট কত অভিমান করিবে, কত আদর পাইবে তাহাই কল্পনা করিতেছে ও নিদ্রার ভাণ করিয়া চুপ করিয়া আছে। জামাই আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাকে জাগাইয়া বলিল—"শীঘ্র করিয়া আমাকে টাকা আনিয়া দাও।" মুহূর্ত্তে ফুলকুমারীর সমস্ত স্বপ্নের প্রাসাদ ভূমি-সাৎ হইয়া গেল। ফুলকুমারী স্বামীকে অনেক স্তবস্তুতি করিল, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। অবশেষে স্বামীর দুর্ব্বাক্যে অস্থির হইয়া এবং পাছে স্বামী রাগ করিয়া চলিয়া যান এই ভয়ে তাহার নিজের পরিশ্রমলব্ধ যাহা কিছু ছিল তাহা সে স্বামীকে আনিয়া দিল। কিন্তু স্বামীপ্রভু আরও অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ইহাতে ফুলকুমারী দুই এক কথা বলিতেই পুরুষ-প্রবর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কি! নারী হইয়া তুমি আমাকে উপদেশ দিতে আস।" রাগ করিয়া স্বামী যাইয়া বাহিরের ঘরে শয়ন করিলেন, ফুলকুমারী কাঁদিয়া রাত্রি পোহাইল!

যশোদা ফুলকুমারীকে সজলনয়নে প্রবোধ দিয়া চলিয়া গেল—ফুলকুমারী জলসৈতে চলিয়া গেল।

চতুর্থ অঙ্কে কুলপালকের ভৃত্য ভোলা পুরোহিত ধর্ম্মশীলকে কুল-পালকের কন্যাগণের বিবাহের বার্ত্তা দিতে আসিয়াছে। ধর্ম্মশীল খবর পাইয়া ছাত্র তর্কবাগীশকে লইয়া কুলপালকের বাড়ীতে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে দৃষ্টরজস্কা কন্যার বিবা-হের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় অধর্ম্মরুচি নামক বিবাহব্যবসায়ী কুলীন সন্তানের প্রবেশ। ধর্ম্মশীল

তাহার সহিত আলোচনা করিয়া কুলীনগণের বিবাহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি বিস্ময়কর সমস্ত জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন। অধর্ম্মরুচি তাহাদের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়া নিজ পিতার তল্লাসে চলিয়া গেল—তর্কবাগীশের সহিত ধর্ম্মশীল কুলীন কন্যাগণের অদৃষ্টের বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজ পিতা বিবাহবণিককে সঙ্গে লইয়া অধর্ম্মরুচির পুনঃ প্রবেশ। উভয়ের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে অধর্ম্মরুচি কিছু বিষাদগ্রস্ত। একখানা পত্র আসিয়া তাহার হাতে পৌঁছিয়াছে এই মর্ম্মে যে, নকুলপুরে তাহার স্ত্রীর এক কন্যা হইয়াছে, কিন্তু সে তিন বৎসর হয় সেই দিকে পদার্পণ করে নাই। বিবাহবণিক তাহাকে নিম্নলিখিত বাক্য বলিয়া প্রবোধ দিয়া বিদায় দিল;—

"বাপু হে তাতে ক্ষতি কি? আমি তোমার জননীকে বিবাহ করিয়া তথায় একবারও যাই নাই, একেবারে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তা বাপু আমরা কুলীনের ছেলে, আমাদের ও-রকম হয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি কি? যাও বাপু, তারা আমোদ করে লিখেছে, যাও, লজ্জা কি?"

অধোমুখে অধর্ম্মরুচি প্রস্থান করিলেন। বিবাহবণিক কোথা হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করা যায় কি না সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময় উত্তম মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ। পরিচয় হইলে জানা গেল যে উত্তম বিবাহবণিকেরই পুত্র;—জন্মাবধি পিতার শ্রীচরণ দর্শন পুত্রের ঘটে নাই। বিবাহবণিককে মৃত মনে করিয়া উত্তমের মাতা বৈধব্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাই উত্তম বিবাহবণিককে সশরীরে বাড়ী লইয়া যাইয়া মার সধবা দশা ফিরাইয়া আনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা বিবাহবণিককে স্বীকৃত হইতে হইল। উভয়ে চলিয়া গেল!

ধর্ম্মশীল ও তর্কবাগীশ স্তম্ভিত মূক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময় এক রোদনশীলা গর্ভবতী রমণী যাইয়া ধর্ম্মশীলকে প্রণাম করিল

এবং অশ্রুবিগলদ্ নয়নে এবার যেন তাহার মেয়ে হয় এই উদ্দেশ্যে স্বস্ত্যয়ন করিতে পুরোহিত ঠাকুরকে অনুরোধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রশ্ন করিয়া জানা গেল যে কন্যাবিক্রয় তাহাদের কুলের প্রথা,—তাহার ভাশুর কন্যাবিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইয়া গিয়াছে, তাই তাহার কেবলি পুত্র হইতেছে দেখিয়া স্বামী তাহাকে মারিয়াছে, আর শাসাইয়াছে যে এবারও পুত্র হইলে তাহাকে দূর করিয়া দিবে। সমাজের এই এক নূতনতর দৃশ্য দেখিয়া কন্যাবিক্রয়ের দোষসম্বন্ধে ধর্ম্মশীল ক্ষুব্ধচিত্তে শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন এবং স্বস্ত্যয়ন ভিন্নই তাহার কন্যা হইবে বলিয়া গর্ভবতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে কন্যা বিক্রয় ও ক্রয় উভয়ই যে মহাপাতক এই বিষয়ে অনেক শাস্ত্রীয় আলোচনা করিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম অঙ্কে উদরপরায়ণের স্ত্রী তাহার শিশুকে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছে, উদরপরায়ণকে কুলপালকের বাড়ীর বিবাহের ফলারের নিমন্ত্রণের খবর দিবে। উদরপরায়ণ আসিয়া রাস্তায় স্ত্রীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভারী চটিয়া গেল, কিন্তু ফলারের কথা শুনিবামাত্র একেবারে জল! দুর্গা দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিয়াছে, এমন সময় শিশুটি সঙ্গে যাইবার জন্য চীৎকার আরম্ভ করিল। শুভ যাত্রায় বাধা পড়াতে উদরপরায়ণ বিষম চটিয়া গেল। পরে যখন শিশুকে জেরা করিয়া বুঝিতে পারিল যে, ফলারতত্ত্বে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই, পিতার সে একান্ত অযোগ্য পুত্র, তখন লেখাপড়া শিখিতে দিয়া সুমতি ছেলেটাকে মাটি করিতেছে বলিয়া সুমতির উপর রাগ করিয়া শিশুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক সে প্রস্থান করিল। পথে তর্কালঙ্কারের সহিত দেখা, সেও বিবাহ দেখিতে চলিল।

উভয়ে প্রস্থিত হইলে, জলের কলসকক্ষে মাধবী ও মহিলা নাম্নী দুই কুলীন কন্যা প্রবেশ করিল। মাধবী কিছু অতিরিক্ত রসিকা, কিন্তু শুদ্ধচরিত্রা। মহিলা অত রসের ধার ধারে না, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার নিয়া বিশেষ ব্যস্ত নহে। পূর্ব্বকালে কুলীন কন্যাগণ কিরূপে

ধীরে ধীরে অধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিত, উভয়ের কথোপকথনে তাহার একখানি পরিষ্কার আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ষষ্ঠ অঙ্কের প্রারম্ভে জাহ্নবী ও শাম্ভবী কিছুতেই তাহাদের বিবাহের বিবরণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিতেছে। এমন সময় কামিনী ও কিশোরী চুপি করিয়া বর দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বরের যে বর্ণনা দিল তাহাতে তিন বোনে পরিষ্কার বুঝিতে পারিল যে—

"এ বিয়ে হইলে মাত্র একাদশী ফল।"

চারি বোন প্রস্থিত হইলে, মৃতপত্নীক বংশজ বিরহী পঞ্চানন প্রবেশ করিল। পূর্ব্বকালে বংশজের একবার বিবাহ করাই কষ্টকর ছিল, কাজেই প্রথম বারের স্ত্রী মরিয়া গেলে আবার বিবাহ করিবার বড় বিশেষ আশা থাকিত না। কন্যার অভাবে বংশজ সমাজে "ভরার মেয়ের" প্রচলন হইয়াছিল। তাই মৃতপত্নীক বিরহী পঞ্চানন আসিয়া শকুন্তলার দুষ্মন্তের অনুকরণে অতি কঠিন বিদ্যাসাগরীয় সাধু ভাষায় হা হুতাশ করিতে লাগিলেন। অবিবাহিত বংশজ "বিবাহ-বাতুল' আসিয়া তাহাকে কুলপালকের বাড়ী বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল, কারণ বিবাহ-বাতুলের তো বিবাহ করিবার সম্ভাবনা জীবনে বিশেষ নাই, অন্যের বিবাহ দেখিয়া যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সে ছাড়িবে কেন? কিন্তু "সর্ব্বস্ব বিক্রয়-পূর্ব্বক বিবাহ-বিষ ক্রয় করিয়া যাতনাক্লিষ্ট" বিরহী পঞ্চানন কিছুতেই যাইতে স্বীকৃত হইল না এবং বিবাহ-বাতুল একাই চলিয়া গেল। অতঃপর কুলপালক ও ধর্ম্মশীলের প্রবেশ। ধর্ম্মশীলকে সম্বর্দ্ধনাদির ভার দিয়া কুলপালক চলিয়া গেলেন। এমন সময় বর, ঘটক অমৃতাচার্য্য ও অভব্যচন্দ্র নামক এক নূতন পুরোহিত প্রবেশ করিলেন। অভব্যচন্দ্র অসহ্য জেঠামি করিয়া কুলপালককে যাজনের অধিকার লইয়া ধর্ম্মশীলের সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধাইয়া দিল। অবশেষে গমনোদ্যত হইলে উভয়কেই দক্ষিণা দেওয়া হইবে বলিয়া কুলপালক

ধর্ম্মশীলকে শান্ত করিলেন। কুলপালক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-শীল যখন বরের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তখন বর চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু অমৃতাচার্য্য তাহার হইয়া আগুবাড়াইয়া সমস্ত কথার উত্তর দিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মশীল বেশী প্রশ্ন করিলে বরের গুণাবলি সমস্তই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় গোপনে ধর্ম্ম-শীলকে ডবল দক্ষিণা দিবার প্রস্তাব করিয়া তাহার মুখবন্ধ করিয়া দিল এবং—

"বিবাহ নির্ব্বাহ হ'লো হরি হরি বলো।"

এইখানেই কুলীনকুলসর্ব্বস্ব সমাপ্ত।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের ভাষা।

পূর্ব্বে আমরা কুলীনকুলসর্ব্বস্বের স্বাভাবিকতার প্রশংসা করিয়াছি। বস্তুতঃ যেখানে নাটকীয় চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তা চালচলন স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে, সেই সেই স্থলে নাটকখানি পরম উপভোগ্য, কিন্তু এই স্বাভাবিকতার স্রোত নাটকের সর্ব্বত্র অব্যাহত নহে। তোত্‌লা যেমন মধ্যে মধ্যে বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে, আবার মধ্যে মধ্যে কথা বাধিয়া যাইয়া তাহার চোখ মুখ উল্টাইয়া প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হয়, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের ভাষাও কতকটা সেই রকমের। বেশ দিব্য স্বাভাবিক ভাবের কথাবার্ত্তা চলিতেছে—সহসা উৎকট বিদ্যাসাগরীয় ভাষার বিষম উচ্ছ্বাসে পাঠকের দংষ্ট্রা স্বস্থানচ্যুত হইবার উপক্রম করে—আরামে ভাত খাইতে খাইতে সহসা কঙ্কর দাঁতের নীচে পড়িলে যে রকম হয়, কতকটা সেই রকম আর কি! কুলীনকুলসর্ব্বস্বের কট্‌মটে ভাষার নমুনা—কুলপালক বেলা দুপুর হইয়াছে দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছেন—

কুলপালক। (উর্দ্ধাবলোকন করিয়া,) একি মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত! সহস্রকিরণ সূর্য্য প্রচুর কিরণ প্রদানে আপনার সহস্রকিরণ নামই কি সার্থক করিতে উদ্যত হইয়াছেন? এক্ষণ অনবরত পথপরিশ্রান্ত ও দিনকর-কিরণে নিতান্ত

ক্লান্ত পান্থলোকেরা সন্তাপ শান্তি নিমিত্ত ছায়াপ্রধান পাদপতলে পল্লবশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার ভজনা করিতেছে। মহারুহচয় একান্ত পবন-পতি-বিরহে সজ্জন-মানসের ন্যায় চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। বরাহগণ পল্বল পঙ্কে সর্ব্বাঙ্গ নিলীন করিয়া রহিয়াছে। কুররীকুল তরুমূলে শয়ন করিয়া আমীলিত নয়নে রোমন্থ করিতেছে! * * * অতএব এতাদৃশ সময়েও আমি পরিশ্রম স্বীকার করিতেছি! গৃহে গমন করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম্ম সম্পন্ন করি।

সহজ ও সরল ভাষার নমুনা—ব্রাহ্মণী কন্যাগণকে জানাইতেছেন যে আজ তাহাদের বিবাহ হইবে।

ব্রাহ্মণী। তোদের ছোট বোন আদরিণী কিশোরী কোথায় রে?

কামিনী। সে রঙ্গিণী সঙ্গিনীগণসঙ্গে পূব পাড়ায় খেল্‌তে গেছে এখনো আসে নাই।

ব্রাহ্মণী। একবার ডাক দেখি বাছা তাকে?

কামিনী। ও-ও-ও কিশোরী ই-ই-ই—কিশোরীরে-এ-এ-এ

কিশোরী। (নেপথ্যে) যাই গো যাই।

কিশোরীর প্রবেশ।

কিশোরী। কেগা আমায় ডাক্‌লে।

কামিনী। মা ডাক্‌চে।

কিশোরী। কেন মা আমায় ডাক্‌লে?

ব্রাহ্মণী। তুই কোথায় গেছ্‌লি? দেখ্‌তে পাইনে কেন?

কিশোরী। ওমা, ওমা, আমি ওপাড়াতে ঘোষেদের বাড়ী লুকোচুরি খেল্‌তে গিছিলাম।

ব্রাহ্মণী। না বাছা আর এমন যেয়োনা, ডাগর ডোগর হচো.

আর অমন কি যেতে আছে? লোকে নিন্দে করবে, ছিঃ।

কিশোরী। ওমা, কেন নিন্দে করবে মা? করবে না। হে মা, আবার আমি যাই।

ব্রাহ্মণী। না বাছা যেয়োনা, আজি এক কর্ম্ম আছে।

কিশোরী। কি কর্ম্ম মা?

ব্রাহ্মণী। বাছা আজ আমাদের বাড়ীতে এক শুভকর্ম্ম হবে।

কিশোরী। ওমা কি শুভ কর্ম্ম বলনা মা। হে মা বল্ কি শুভ কর্ম্ম বলনা। বল্‌বিনে, বল্‌বিনে?

ব্রাহ্মণী। কেন গো, বল্‌বো না কেন? আজি তোদের 'বে' হবে।

কিশোরী। (সবিস্ময়ে) 'বে' কাকে বলে মা?

ব্রাহ্মণী। বে কাকে বলে তাও জানিস্‌নে বাছা? প্রধান সংস্কার।

কিশোরী। ওমা, তাকি আমি খাব?

ব্রাহ্মণী। বাছা, 'বে' কি খেতে হয়? রাঙ্গা বর আস্‌বে, তোদের বে কর্ব্বে, কত ঘটাঘটি হবে, সেকি বাছা কিছুই জানিস্‌নে?

কিশোরী। হাঁ সেই বে ত, আমি জানি, তা কার হবে মা?

ব্রাহ্মণী। তোমার হবে আর তোমার তিন বোনের হবে।

কিশোরী। ওমা! তবে তোর হবে না?

ব্রাহ্মণী। (হাস্য করিয়া) বাছা তুই অবোধ, তোর জ্ঞান হয় নেই, তাকি বল্‌তে আছে? আমি মা হই।

কিশোরী। হাঁ হাঁ, হুঁ, বুঝেছি, তোর হয়ে গেছে; ওমা কার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছে বলনা মা?

ব্রাহ্মণী। (সক্রোধে) দূর হ, আমাকে ব্যস্ত করিস্‌নে, মচ্চি নানান জ্বালায়, তোরা সকলে এখন বাড়ীতে যা।

কন্যাগণের প্রস্থান।

তর্করত্ন মহাশয় যেখানে এইরূপ সহজ সরল ভাবে "ভাষায়"

লিখিয়াছেন সেখানে সহজেই প্রাণের রং ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দেবভাষাগ্রস্ত স্থানগুলি পূর্ব্বে সাধারণ মানবের সম্ভ্রম উৎপাদন করিত এখন ভয়ের উদ্রেক করে।

তর্করত্ন মহাশয়ের নবনাটকও এক সময়ে খুব সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বহুবিবাহের দোষ প্রদর্শনই এই নাটকখানির উদ্দেশ্য। এই নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। "নরেশ-বাবু নামক একজন জমীদার স্ত্রীপুত্র সত্বেও অধিক বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, তাহার নব প্রণয়িণীর উৎপীড়নে প্রথমা পত্নীর গর্ভস্থ পুত্র দেশত্যাগী হয়, বিষয় বিভব নষ্ট হয়, পূর্ব্ব পত্নী যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন এবং তিনি নিজেও নবপত্নীদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের গুণে অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হন—এই সামান্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে।" কুলীনকুলসর্ব্বস্বে হাস্যরস-সৃষ্টি-চেষ্টা বেশী বিকশিত, মধ্যে করুণ রসের একটা ক্ষীণ প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু নবনাটকে করুণ রসেরই প্রাধান্য। দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাটকাবলীতে এই নবনাটকের প্রভাব পরিদৃশ্যমান—দীনবন্ধুর নাটকাবলীর আলোচনার সময় আমরা তাহা দেখাইব। বিয়োগান্ত কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বড় নাই, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিষেধে তাহার সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় ভাষার আসরে নামিয়া এই নিষেধ মানেন নাই—বিয়োগেই নবনাটকের সমাপ্তি। নব-নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

মুসলমান অদ্বৈতবাদী মনসুর

"কহে মনসুর সুন্ কাজী
গয়ের কা পেয়ালা মৎ পী।
আনল্‌হক্ পর্ হো তু সাবিদ্
ওহি কল্‌মা পঢ়াতা যা॥"

—মনসুর বলেন শুন কাজী
অপরের পেয়ালা পান করিও না।
সোঽহম্ বাদের উপর দাঁড়াইয়া
সেই কল্‌মা পড়াইতে থাক।

অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে তুরস্ক, পারস্য, তাতার, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশে অনেক অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ঐ সকল দেশের আপামর সাধারণে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা আপনাদের অদ্বৈতমত ত্যাগ করেন নাই। ক্রমে তাঁহারা উহা ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোককে "সুফী" বলে। সুফী শব্দের অর্থ তত্ত্বদর্শী। উহা সম্ভবত গ্রীক সোফিয়া (sophia—wisdom) শব্দ হইতে আরবী ভাষায় গৃহীত। যদিও অনেক গোঁড়া মুসলমান ইঁহাদিগকে কোরাণের বিরুদ্ধবাদী মনে করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মোস্‌লেম উন্নত জ্ঞানী বোধে উঁহাদের সম্মান করিয়া থাকেন। বোধ হয় অনেকে জানেন যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বাহ্য ও অন্তর দুইটি বিভাগ আছে যাহাকে ইংরাজীতে exoteric ও esoteric বলিয়া থাকে। সুফীগণকে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ বা গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী বলিতে হইবে। উক্ত অন্তরঙ্গ মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ করিতে অধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক হউন

না কেন, সকলেই একমত, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ ভিন্নতা লক্ষিত হয় না। ব্যোমযানাবলম্বনে খুব উচ্চ আকাশে উঠিলে যেমন দৃষ্টির সীমা প্রসারিত হয়, এবং নিম্নস্থ বাড়ী ঘর, গাছ পালা, ক্ষেত খোলা, পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী, হ্রদ সরোবরাদি সমস্ত এক ভাবাপন্ন দেখায়, কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য অনুভব করা যায় না, এস্থলেও ঠিক তাই ঘটে;—যাঁহারা নীচে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহারাই জড়জগতের সম্পত্তির মত এটা আমার, ওটা তোমার, সেটা তাহার, এবম্বিধ পার্থক্যবাচক বাক্য দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপনে প্রয়াস পান; আর যাঁহারা উচ্চে উঠিয়া অন্তরঙ্গের প্রাপ্য গূঢ় সত্যসমূহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ভেদ জ্ঞান একেবারে তিরোহিত। এরূপ অবস্থায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মহাবাক্য "সোঽহম্" এবং সুফীশ্রেষ্ঠ মহর্ষি মন্‌সুর প্রচারিত "আনল্ হক্" যে এক সুরের গান হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?

হোসেন মন্‌সুর কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠিক বলা সহজ নয়। তবে অনেকের মতে ইহা একপ্রকার স্থির হইয়াছে যে হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পরে খলিফাদের রাজধানী প্রাচীন বোগ্‌দাদ নগরে কোনও সুফী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা একজন পরম ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, সচ্চরিত্রতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদিতে তিনি সকলের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসিতকে জল, নগ্নকে বস্ত্র, রোগীকে ঔষধ পথ্য দেওয়া তাঁহার দৈনিক কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। মন্‌সুরের মাতাও সতী সাধ্বী পুণ্যবতী ছিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মন্‌সুর সৈয়দ জুনেদ শাহ ফকিরের অলৌকিক জ্ঞান-ধর্ম্মোন্নতির বার্ত্তা শ্রবণান্তর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার চিত্তের এমন একটা পরিবর্ত্তন হয় যে তাহা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি

এই অভাবনীয় ব্যাপার দর্শনে এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে অনেককেই তাঁহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইয়াছিল। ধন-কুবের বা পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মনসুরকে দেখিলে সমুচিত সম্মান দিতে যেন উপর হইতে কোন শক্তি দ্বারা বাধ্য হইতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মনসুর মক্কা যাত্রা করেন। এরূপ শুনা যায় যে তথায় তিনি এক বৎসর-কাল কঠোর তপস্যা করেন;—ধর্ম্মমন্দির কাবা মস্‌জিদের সম্মুখে দিবাভাগের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রজনীর শিশিরে বিনা আচ্ছাদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। আহার ছিল দিনান্তে সামান্য এক টুক্‌রা রুটীমাত্র। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া আবার মক্কায় যান।

অতঃপর তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করতঃ অবশেষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এখানে আসিয়া কোথায় কি কি কার্য্য করেন সে বিষয়ে সকল কথা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতীয় উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি কবিতামাত্র আমরা জানি। একটি সঙ্গীতাকারে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের বাইজীদের মুখে গীত হইয়া থাকে, * অপরটি একটু দীর্ঘ, তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যারূপে মৌলভীদের মুখে শুনা যায়; † উহারই শেষাংশ প্রবন্ধের শিরোদেশে দেওয়া গেল।

দেশ পর্য্যটন হইতে বোগ্‌দাদে ফিরিয়া আসিবার পর মনসুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার মাত্রা কিছু বেশী পরিমাণে প্রকাশ পাইল। একদা তিনি গুরু জুনেদকে অদ্বৈতবাদসম্বন্ধীয় এমন এক কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

---

* "মোকদ্দর আপ্‌না আপ না,
অজমা লে যিস্‌কা জী চাহে। ইত্যাদি"।

† "অগর্ হয় শওক মিল্‌নেকা
তো হর্‌দম্ লও লাগাতা যা। ইত্যাদি"।

করিলেন যে তদুত্তরে গুরুকে বলিতে হইল, "মন্সুর সাবধান, রস-নাকে শাসনে রাখিও। নতুবা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি রাজাজ্ঞায় প্রাণ হারাইবে।" অবশেষে তাহাই ঘটিল।

গুরুর নিকট উৎসাহ না পাইয়া মন্সুর নির্জ্জন প্রদেশে যোগা-বলম্বন করতঃ সমাধিস্থ হইলেন। কয়েক বৎসর তিনি যোগাসনে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে নীরব নিস্পন্দভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় অতি-বাহিত করিয়া হঠাৎ একদিন প্রেমের পূর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আনল্ হক্" (আমিই ঈশ্বর)। এই সংবাদ বোগ্দাদের চতুর্দ্দিকে বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে এক মুখে বলিতে লাগিল, "কি স্পর্দ্ধার কথা! ক্ষুদ্র মানুষ হইয়া ঈশ্বরত্ব অধিকার! ভক্তের কি এই উক্তি? ইহা নিশ্চয় বাতুলের প্রলাপ; মন্সুর নিঃসন্দেহ পাগল হইয়াছে।"

মন্সুরের হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্রে তাঁহাকে কত রকম বুঝাইতে লাগি-লেন। মন্সুর কিন্তু কাহারও কথায় মন দেন না, কেবল উর্দ্ধনেত্রে "আনল্ হক্" মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। একদিন বহুসংখ্যক বন্ধু একত্রিত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া নিষেধব্যঞ্জক উপদেশ দিতে লাগিল। তদুত্তরে তিনি বলি-লেন, "আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি ত বহুদিন হইল জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি। মৃত-ব্যক্তির কিসের ভয়? যদি তোমরা বল, আমার দেহ ও প্রাণ আছে, নতুবা কথা কহিতেছি কি প্রকারে? সে দেহ ও প্রাণ অতি তুচ্ছ জিনিস! যাহা এই আছে, এই নাই, তাহার মূল্য কি? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও ত তাহা কেনা উচিত নয়। তাহার জন্য ভয় কি? তাহার মমতা যত্নই বা কি নিমিত্ত?" এবম্বিধ নির্ভী-কতা দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-বেগে বহির্গমনান্তর আবার সেই প্রাণপ্রিয় মহাবাক্য "আনল্ হক্" প্রচার করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

মন্‌সুরের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী একজন তপস্বিনী ছিলেন। তিনিও এই মহাসত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় প্রেমে পাগলিনী হয়েন নাই। তিনি মন্‌সুরের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করতঃ ভ্রাতাকে একদা বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমি ত বেগ ধারণ করিয়া আছি; তুমি কেন এরূপে ক্ষেপিলে? আমি বিশ বৎসর এই তত্ত্বসুধা পান করিতেছি, কিন্তু মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ত কখন বিচলিত হই নাই।" কে কাহার কথা শুনে? মন্‌সুর অনবরত একধ্যানে "আনল্‌ হক্‌" প্রচার করিতে থাকিলেন।

সিন্ধুতে বিন্দু মিশাইয়া গেলে একরূপ হয়, পরন্তু বিন্দুমধ্যে সিন্ধু প্রবেশ করিলে বিন্দু আপনাকে স্থির রাখিতে পারে কি না, ইহা ভাবুক জনের ভাবিবার বিষয়। এই জন্যই কোন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন :—

"বুঁদ্‌ সম্‌হানা সমন্দরমে
সো মানে সব কোই।
সমন্দর সম্‌হানা বুঁদ্‌মে
পঁহুছে বিরলা কোই॥"

যাহা হউক মন্‌সুরের এই ব্যবহারে সাধারণ মুসলমানগণ একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে খোদাতালা হফ্‌ৎ তবক্‌ আসমানের উপর সদর্‌তোলুনেসাতে রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন, মন্‌সুর কি প্রকারে তাঁহার পদে বসিতে পারে? অতএব মন্‌সুর ঈশ্বরদ্রোহী, সুতরাং প্রাণদণ্ডার্হ। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা মহান, জীবাত্মা অণুবৎ; জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, পরমাত্মার অধীনে তাহাকে চিরকালই থাকিতে হইবে। ইহাই ইস্‌লামী সাধারণের শিক্ষা। এরূপস্থলে যদি কেহ "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে ঘোর অপরাধী মহাপাপী মনে করিয়া রাজদ্বারে

অভিযুক্ত করিতে বাধ্য। মনসুরের অদৃষ্টে তাহাই ঘটে। সাধারণ প্রকৃতিবর্গ বারম্বার খলিফার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল। মনসুরের ন্যায় বৈরাগী ফকিরের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি সর্ব্বজনপূজ্য মনসুর-গুরু শাহ জুনেদের নিকট দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করেন। জুনেদ্ অনেকবার ফিরাইয়া দিয়া, এবং মনসুরকে বুঝাইয়া বিফলমনোরথ হওয়ার পর অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মনসুরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বিধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

মনসুর রাজাজ্ঞায় কারারুদ্ধ হইলেন। কয়েকবার অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগে তথা হইতে বাহিরে আসিয়া আবার কারাগারে প্রবেশ করিলেন। অবশেষে বধ্যভূমিতে নীত হইয়া সহাস্যবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

মনসুরের ইচ্ছামত তাঁহার প্রিয় বন্ধু শিরাজনগরের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক এবং গুপ্ততত্ত্বাভিজ্ঞ মহাত্মা শেখ কবির তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কবির মনসুরকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আপনার মহান্ বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনুগৃহীত সাধক পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে অশক্ত। যাহা সংসারে কেহ বুঝে না, যাহা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, সত্য হইলেও তাহা মিথ্যা, অভ্রান্ত জানিলেও ভ্রান্ত বলিয়া তাহার পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মনুষ্যসমাজে সেই কঠিন জটিল সমস্যার মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে নিরস্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। যে তত্ত্ব গুপ্ত, তাহা চিরকাল গুপ্তই থাকুক।"

মনসুর যাহা প্রচার করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন তাহা সকলে কি প্রকারে বুঝিবে? অত বড় গভীর দার্শনিক সত্য জনসাধারণের পক্ষে অবোধ্য বলিলে দোষ হয় না। তখনকার বোগ্দাদী লোকের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক কয়জন শিক্ষিত লোক "অহং ব্রহ্মাস্মি" বুঝিয়া উঠিতে পারেন? সাধারণ ভাবে পরমাত্মার ও জীবাত্মার

প্রভেদ ও সেব্য-সেচকত্ব উপাস্য-উপাসকত্ব সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রচার করিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদেব গূঢ় রহস্য অত্যুন্নত দার্শনিক ব্যতীত আর কাহারও বোধগম্য হইতেই পারে না। যদি সাধারণ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করা যায়, তাহার ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া অনর্থ পাতেরই সম্ভাবনা। এই জন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা বারম্বার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, "মূর্থকে ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।" মনসুরের জ্ঞানী সুহৃদগণও তাহাই বলিযাছিলেন, পরন্তু সরল সাধু মনসুর হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বাধা মানিতে পারিলেন না, 'ইহাই আমার পক্ষে বিধিলিপি" এই শেষ কথা বলিযা জল্লাদের হস্তে দেহান্ত হইলেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

গিন্নী

গিন্নি, তুমি হে আমার সর্ব্ব;
উদ্যত ফণা জাগ্রত সদা নাশিতে সকল গর্ব্ব।
তুমি হে আমার ভবের পাড়ির অতি পুরাতন নৌকা,
তুমি হে আমার ভোগ-রন্ধনে ইন্ধন ছাড়া চৌকা।
তুমি হে আমার গ্রীষ্মের দিনে গরম জলের টব্,
স্নানে কিবা পানে লাগ যেইখানে, তীব্র সে অনুভব।
তুমি হে আমার শীতের দিনের ঠাণ্ডা বরফ জল,
দাঁতের ঝাঁকুনি মুখের বাঁকুনি দেহের কাঁপুনি-কল।
তুমি হে আমার দিবসের মেঘ, সদা ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ,
সূর্য্য তোমার বজ্র-নিনাদে আড়ালে থাকিয়া জব্দ।
তুমি হে আমার সান্ধ্য-ভ্রমণে ছড়ীর আকারে ছাতা,
দুপুরের ধুপে বরষার ঝুপে খুঁজে ত মিলে না কোথা।
তুমি হে আমার নিশীথ-প্রদীপে বাঁকা-করে-কাটা পল্‌তে,
ধোঁয়ার আঁধারে চিম্‌নি ফাঁফরে, বেশীক্ষণ নারে জ্বল্‌তে।
তুমি হে আমার আয়েসের কালে রবি ঠাকুরের কাব্য,
কত যে হেঁয়ালী কিছুই বুঝি না, পড়িয়া যেতেছি দিব্য।
বঙ্কিম তব বঙ্কিম রসে শঙ্কিত হয়ে অতি,
আস্‌মান-ছাকা আস্‌মানি-রূপে করেছে তোমারে নতি।
তব হাসিমুখ, যখন আমার বাক্সেতে ঝন্ ঝন্
প্রলয়মূর্ত্তি তখনি তোমার, যবে করে ঠন্ ঠন্।
তোমায় আমায় ভীষণ একতা, বাঁধা যে শক্ত ছাঁদে,
দেখে আমাদের ক্ষিপ্ত মিলন, বিধাতাপুরুষ কাঁদে।
বিধাতা এখন হয়েছে ফাঁফর, তোমার আমার চোটে,
এত টানাটানি ছাড়াতে পারেনি', এমনি গিয়েছি এঁটে।
এস এস প্রিয়ে, ভুবন কাঁপায়ে, এস হে সন্নিকট,
তুমি-আমি দুই, সংসারে সঙ্, মন্ত্রশ্লেষের ফট্।

দরবেশ।

সীতার স্বপ্ন

উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কটিকেই একখানি পূরা নাটক বলিলে হয়। কারণ ভবভূতি মহাবীরচরিতে রামায়ণের যে কয় কাণ্ড লইয়াছেন এক চিত্রদর্শনে প্রায় সেগুলি সব লওয়া হইয়াছে তবে এই চিত্রদর্শনের দরকার কি—একথার জবাব দিবার জন্য আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতেছিন না। চিত্রদর্শনের পর সীতার নিদ্রা—সীতার স্বপ্ন, রামের সীতাপরিত্যাগ, সীতার নিদ্রাভঙ্গ এই সব লইয়া প্রথম অঙ্ক। প্রথম অঙ্কেরও সব কথা আমরা বলিব না। কবি কেমন কৌশলে সীতাকে ঘুম পাড়াইয়াছেন ও কেমন সময়ে কি অবস্থায় তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন শুদ্ধ তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

চিত্র খুব লম্বা। বিশ্বামিত্রের নিকট রামের অস্ত্রলাভ হইতে আরম্ভ হইয়া সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্য্যন্ত। চিত্র সব দেখান হয় নাই। সব দেখাইবার ভবভূতির ইচ্ছাও ছিল না। যাহাতে রামের চরিত্র ফুটে, যাহাতে সীতার চরিত্র ফুটে, যাহাতে রামসীতার অকৃত্রিম দাম্পত্যপ্রেম ফুটে, ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া সেইগুলিই দেখাই-য়াছেন। তাহারও মাঝে মাঝে রামচন্দ্র ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন, পরশুরামের ব্যাপারটা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কৈকে-যার কীর্ত্তি একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং খুব সং-ক্ষেপই করা হইয়াছে। চিত্রটা বোধ হয় একালকার ম্যাপের মত গুটান ছিল। লক্ষ্মণ একটু একটু খুলিতেছিলেন, ও দেখা হইলেই অমনি গুটাইতেছিলেন। রাম যেখানটা দেখাইতে বারণ করিলেন সেখানটা লক্ষ্মণ না দেখাইয়াই গুটাইয়া ফেলিলেন। ক্রমে পঞ্চবটী আসিল; সূর্পণখা আসিল; অমনি সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, এই তোমায় আমায় শেষ দেখা"। রাম বলিলেন, "ভয় কি! এ ত

ছবি বই কিছু নয়"। সীতা বলিলেন, "যাহাই হউক, দুর্জ্জনের ছবি দেখিলেও কষ্ট হয়"।

সীতাহরণের পর রামের যে দুঃখ, কান্না, হা হুতাশ, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া দেখান হইল। রাম আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। সীতা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। লক্ষ্মণ অন্যরস আনিবার চেষ্টা করিলেন—জটায়ুর বৃত্তান্ত আনিলেন, হনূমানের চিত্র দেখাইলেন—রামের দুঃখ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সীতা একে পূর্ণগর্ব্ভা, নড়িতে চড়িতে, ভাবিতে চিন্তিতে, সকল অবস্থাতেই তিনি ক্লান্তি বোধ করেন। চিত্র দেখিতে দেখিতে, অনেক পুরাণ কথা ভাবিতে ভাবিতে, তিনি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই। শেষ রাম আর সহিতে না পারিয়া বলিলেন,—

"বৎসৈতস্মাৎ বিরম বিরমাতঃ পরং ন ক্ষমোঽস্মি
"প্রত্যাবৃত্তঃ পুনরিব স মে জানকীবিপ্রয়োগঃ।"

লক্ষ্মণ দাদা ও বড়বৌএর এইরূপ ভাব দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ছবি গুটাইয়া বলিলেন, "এর পর আরও ছিল; এর পর আরও ছিল। বানর ও রাক্ষসদের অদ্ভুত যুদ্ধ ইত্যাদি অনেক ছিল। তা, আর্য্যা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন —আপনারা বিশ্রাম করুন।"

লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে রাম সীতাকে বলিলেন, "চল আমরা জানালার ধারে একটু বসি"। সীতা অমনি বলিলেন, "বড় ক্লান্ত হইয়াছি —ঘুমে আমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে"। রাম বলিলেন, "আমারই গায়ের উপর গা দিয়া শয়ন কর, তোমার হাত আমার গলায় জড়াইয়া দাও। আমার মৃত শরীরে জীবন আসুক"। এই বলিয়া তিনি সীতার হাতদুখানি আপনার গলায় জড়াইয়া লইলেন। সীতা যতই নিদ্রায় কাতর হইতে লাগিলেন, তাঁহার হাত ক্রমেই রামের শরীরে বসিতে লাগিল এবং সীতার করস্পর্শে রাম আনন্দে অভিভূত হইয়া

পড়িতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "একি! সুখ বা দুঃখ কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না, আমি জাগিয়া আছি না ঘুমাইয়া আছি; বিষে আমায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে, না নেশায় আমায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে? তোমার সঙ্গ যতই আমার অঙ্গে গাঢ় হইয়া বসিতেছে ততই আমার ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আমার মনের ভাব আর এক রকম হইয়া গিয়াছে—আমার চেতনা লোপ হইতেছে, ভ্রম উপস্থিত হইতেছে।"

সীতার ঘুমের ঘোরে, অধিক কথা কহিবার ইচ্ছা নাই—তাই তিনি গোটাকতক কথা কহিলেন,—"থিরপ্পসাদা তুহ্মে, ইদোদানিং কিমবরং" একটি কথার বাঙ্গলা করা বড়ই কঠিন। ইহার সব ভাবগুলি ফুটাইয়া বাঙ্গলা করিতে গেলে লম্বা হইয়া পড়ে। ঘুমের ঘোরে তত কথা কেহ কয় না, তাই মোটামুটি বাঙ্গলা করিতেছি "তুমি বড় ভালবাস—তা ছাড়া আর কি?" তখন সীতার চোখদুটি ঘুমে গোল হইয়া আসিতেছে তাই রাম বলিলেন, "হে সরোরুহাক্ষি! জাগিয়া থাকিলে যে চোখ পদ্মের পাপ্‌ড়ীর ন্যায় বা চেরা পটলের মত হয়—ঘুম আসে আসে এমন সময়ে সেইটি গুটাইয়া একটু গোল হইয়া আসে।" তাই রাম এখানে "সরোরুহাক্ষি" বলিয়া সীতাকে সম্বোধন করিয়াছেন। সম্বোধন করিয়া রাম বলিলেন, "জীবনের ফুল যখন মলিন হইয়া আসে, তোমার এই মধুর কথা শুনিলে তাহাকে আবার ফুটাইয়া দেয়—আত্মা, শরীর ও মন সকলের তৃপ্তি করিয়া দেয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে মুগ্ধ ও শিথিল করিয়া দেয়, কাণে অমৃতের ধারা ঢালিয়া দেয় এবং মনের বল আনিয়া দেয়।"

সীতার ঘুমের ঘোর ক্রমে অধিক হইয়াছে—তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না,—বলিলেন, "পিঅংবদ! এহি সংবিসহ্ম"—আমি শোব বলিয়া চারিদিকে কি খুঁজিতে লাগিলেন। রাম বলিলেন, "কি খুঁজিতেছ?—বালিশ!—এই ত আমার হাত আছে, শোও। যে-দিন বিবাহ হইয়াছে সেইদিন হইতে ঘরে বল, বনে বল, বাল্যে বল,

যৌবনে বল, এইখানেই তুমি শয়ন করিয়াছ—এই তোমার বালিশ—আর কেহ কখনও এ বালিশে শোয় নাই।" ঘুমে সীতার কথা আরও জড়াইয়া আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—"একথা ঠিক, একথা ঠিক"—তখনই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাম বলিলেন, "সীতা সত্যসত্যই আমার বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়িল?" তিনি স্নেহের চক্ষে সীতাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী, চক্ষে অমৃতের বাতি, ইঁহার স্পর্শ যেন আমার শরীরের ঘন চন্দন। এই যে আমার গলায় ইঁহার হাত রহিয়াছে, ইহা মুক্তার মালা, সরস, শীতল, এবং সুখস্পর্শ। ইঁহার কোন্ জিনিসটি আমার প্রিয় নহে? কেবল একমাত্র আমার পক্ষে অসহ্য—ইঁহার বিরহ।

রামের মুখে এই "বিরহ" শব্দটি বাহির হইবার পরক্ষণে দ্বারী আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেব উপস্থিত"। 'বিরহ' শব্দটি উচ্চারণ হইবার পরই 'উপস্থিত' শব্দটি শুনিয়া রামের মনটা ছাৎ করিয়া উঠিল। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে! কে উপস্থিত?" দ্বারী বলিল, "দুর্ম্মুখ—আপনার খানসামা"। রাম মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "দুর্ম্মুখ আমার ভিতর বাড়ীর চাকর, আমি তাহাকে চর করিয়া পাঠাইয়াছি। নগরের লোক ও দেশের লোক আমার সম্বন্ধে কে কি বলে সে আমায় তাহাই জানাইয়া যাইবে"। বলিলেন, "তাহাকে লইয়া আইস।"

দুর্ম্মুখ আসিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিল আমি কেমন করিয়া রামের কাছে সীতার সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত অপবাদের কথা বলিব' অথবা আমি বড় হতভাগা! আমার চাকরিই এই।

দুর্ম্মুখ এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় সীতা স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "হা আর্য্যপুত্র! তুমি কোথায়?" রাম বলিলেন, "ছবি দেখিতে দেখিতেই বিরহের একটা উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তিনি সেই বিরহই স্বপ্নে দেখিতেছেন। বলিয়া সীতার গায়ে হাত বুলাইতে

বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সুমানুষের এমন প্রেম অতি কষ্টেই পাওয়া যায়। ইহা এক, এক ছাড়া দুই নহে; ইহা সুখে ও দুঃখে একরূপ; সকল অবস্থাতেই অনুকূল কখনও প্রতিকূল হয় না—ইহাতে হৃদয়ের বিশ্রাম হয়; বৃদ্ধবয়সেও ইহার আনন্দ হ্রাস হয় না বরং যত কাল যাইতে থাকে, উভয়ের মধ্যে যে আবরণ ছিল তাহা সরিতে থাকে, তখন ঘন ও নিবিড় স্নেহে গিয়া দাঁড়ায়।"

গর্ব্ভাবস্থায় বিশেষ পূর্ণগর্ব্ভ অবস্থায় স্ত্রীলোকের মনে কোনরূপ ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ না হয়—এটি সকলেই দেখিয়া থাকেন। লোকের মনের ধারণা ওরূপ অবস্থায় ভয়, উৎকণ্ঠা বা দুঃখ হইলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে, সেইজন্য জনক বাড়ী যাইবেন শুনিয়া পাছে সীতার মনে উৎকণ্ঠা হয় তাই রামচন্দ্র ধর্ম্মাসন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপস্থিত হইবার পরই সীতার মনে স্ফূর্ত্তি হইবে বলিয়া ভবভূতি অষ্টাবক্রকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। অষ্টাবক্র আসিয়া উঁহাকে তাঁহার গুরু গুরু-পত্নী শ্বাশুড়ী ও ননদ সকলে ভাল আছেন একথা বলিলেন। সীতা ব্যস্ত হইয়া প্রত্যেকের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহারা আমাদের মনে করেন কি?" অষ্টাবক্র বলি-লেন, "শুধু কি মনে করেন—সর্ব্বদাই কামনা করেন তোমার যাহাতে একটি বীরপুত্র হয়।" অষ্টাবক্র বেশ চতুর লোক—সীতার যাহাতে স্ফূর্ত্তি হয় এমন কথাই কহিয়া গেলেন। তিনি যাইতে না যাইতেই ভবভূতি লক্ষ্মণকে ছবি লইয়া উপস্থিত করিলেন। রামের তাহাতে বড়ই আনন্দ—আপনাদের পুরাণ বৃত্তান্তের ছবি দেখিলে, বাপ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সীতা আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না—বলিলেন, "দেবীর উৎকণ্ঠা হইলে কেমন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে হয়, ভাই লক্ষ্মণ, তুমিই তাহা জান"। প্রথমেই ব্রহ্মাস্ত্রের ছবি। রাম বলি-লেন, এসব অস্ত্র এখন তোমার ছেলেদেরই হইবে। সীতা মা হইতে যাইতেছেন, ছেলেদের ভাল হইবে শুনিলে কোন্ মায়ের না আনন্দ

হয় ? সীতারও তাহাই হইল। তাহার পর বিবাহের ছবি। বিবাহের দিনের কথা মানুষের যত মনে থাকে বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন কথাই তাহার তত মনে থাকে না। মনে থাকে কেন ?—সেদিন বড় আনন্দের দিন,—সেকথা যতবার স্মরণ হয় ততবারই আনন্দ হয়। সীতারও তাহাই হইল। সীতার বিবাহের সময় একটা ভয়ের কারণ হইয়াছিল—পরশুরামের আসা। রাম সে ছবি দেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। সীতার মনে পাছে ভয় হয়, সেটা তিনি বন্ধ করিলেন আর আপনারও যেটা গরিমার কথা সেটা লইয়াও আলোচনা করিতে দিলেন না। এইরূপে চলিতে লাগিল। পাছে কৈকেয়ীর দুর্ব্যবহার মনে পড়িলে সীতার দুঃখ হয়,—সে ছবিও রাম দেখিতে দিলেন না—আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষ লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাম করিলেন। দুঃখেও যেমন লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—আনন্দেও সেইরূপ লোকে ক্লান্ত হইয়া পড়ে—বিশেষ সীতার মত অবস্থায়। সূর্পণখা দেখাইবার আগেই যদি সীতা ক্লান্তি বোধ করিতেন, বোধ হয় এতটা ঘটিত না—বিরহ বিরহ বলিয়া মনে একটা ত্রাস জন্মিত না। কিন্তু নিষ্ঠুর কবি সেকথা শুনিবেন কেন ? তিনি তাঁহার কলাকৌশল দেখাইতেই ব্যস্ত। ঐ সময়ে সূর্পণখাকে না আনিলে যে ভবভূতির নাটক লেখা হয় না, সুতরাং তিনি লক্ষ্মণের মুখে সূর্পণখার নামটি করাইলেন—ছবিও দেখাইলেন। এতক্ষণে বাপের জন্য সীতার যে উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা ত দূর হইয়াছিল; নিকটে রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া কেহ ছিল না—তিনজনে আনন্দে ভোর হইয়া যাইতেছিলেন। তখন যে সূর্পণখার নাম উপস্থিত করিলেই সীতার একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইবে লক্ষ্মণের তাহা মনেই ছিল না। তিনি পঞ্চবটীর সঙ্গে সঙ্গেই সূর্পণখার নাম করিলেন ও তাহার ছবি দেখাইলেন—হিতে বিপরীত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। সীতার বিরহে রামের যে কি অবস্থা হইয়াছিল সীতা ত তাহা দেখেন নাই—সেগুলি দেখাইয়া সীতাকে খুসী করিতে গেলেন;

আবার বিপরীত ফল ফলিল—রাম সে সব কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। রামের দুঃখে সীতারও দুঃখ বাড়িয়া উঠিল। রসান্তর উপস্থিত করিয়া রামকে অন্যদিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতেও তত কৃতকার্য্য হইলেন না। শেষ ছবি গুটাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

রাম পুরুষ মানুষ, বিশেষ তিনি একটা প্রকাণ্ড পুরুষ, তিনি সহজেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। সীতা কিন্তু পরিশ্রমে, ভাবনায় ও উৎকণ্ঠায় ঘুমে ঢলিয়া পড়িলেন। রাম আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহাকে কত মিষ্ট কথাই কহিতে লাগিলেন। রাম একটি একটি কবিতা বলিতে লাগিলেন। সীতা ছয়টি কথায় প্রথম কবিতাটির উত্তর দিলেন, দ্বিতীয়টির তিনটি কথায়। রাম যখন তৃতীয়টি বলিলেন,—তখনও সীতা দুইটি ছোট ছোট কথায় জবাব দিলেন, কিন্তু সে দুটি দুবার করিয়া বলিলেন। নিদ্রার আগে লোকে এইরূপ এক-কথা দুইবারই বলে—তাহার পরই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দুর্ম্মুখ প্রবেশ করিয়া যখন সীতার সর্ব্বনাশের কথা ভাবিতেছিল, তখনই সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র তুমি কোথায়?" সূর্পণখার নাম শুনিয়া অবধি সীতার মনে যে বিরহের উৎকণ্ঠা হইয়াছিল সেটা নিদ্রায়ও যায় নাই। তাই এই স্বপ্ন। এই স্বপ্নই তাঁহার ভবিষ্যৎ বিপদের ছায়া। কিন্তু আমরা সীতার নিদ্রার ও স্বপ্নের কথাই কহিতেছি—ভবিষ্যৎ বিপদের কথা এখন তুলিব না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ধর্ম্ম, নীতি ও "আর্ট"

গত জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের "নারায়ণে" তিনটি "কথা-নাট্য" প্রকাশিত হইয়াছে। চারিদিকে এগুলির অত্যন্ত নিন্দা হই তেছে। আবার কেহ কেহ এগুলির খুবই প্রশংসাও করিতেছেন। যাঁরা নিন্দা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই ধর্ম্মের ও নীতির দোহাই দেন। যাঁরা প্রশংসা করেন, তাঁরা ইংরাজিতে যাহাকে "আর্ট" বলে, তার দোহাই দিয়া থাকেন। তাঁরাও "আর্টে"র বাঙ্গলা করেন না, আপাততঃ আমিও সে চেষ্টা করিলাম না। ✓

ধর্ম্মের ও নীতির বিচারে সত্য সত্যই এগুলি কতটা, কিভাবে, নিন্দনীয় এবং আর্টের হিসাবেই বা কতটা প্রশংসাযোগ্য, এই কথাটা একবার পরখ করিয়া দেখা মন্দ নয়। আর লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম ও নীতি বলে, তার দ্বারা আর্টের বিচার করা আদৌ সঙ্গত কি না, সে কথাটার মীমাংসা হওয়া আরও আবশ্যক। এই কথানাট্যগুলির নিজের দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন, এগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া, নীতি ও আর্টের পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া যে কথাটা উঠিয়াছে, সাহিত্যসমালোচনায় তাহা কোনও মতেই উপেক্ষণীয় নহে। এই জন্যই আমি এই কথানাট্যগুলির একটা বিস্তৃত সমালোচনা করিতে রাজী হইয়াছি।

ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এগুলির অমন নিন্দা, কিম্বা আর্টের দোহাই দিয়া অত প্রশংসা না করিলে, আমি এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম না। কারণ, সাহিত্য-সমালোচনার একটা আদর্শ আছে। সে সমালোচনার একটা ক্ষেত্র চাই। তাহার একটা বিশেষ মর্য্যাদাও

আছে। এই কথা-নাট্যগুলিতে সমালোচনার সেই ভূমি গড়িয়া উঠে নাই। এগুলি এই মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য নহে।

সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ।

যে যাহা লিখে ও ছাপায়, তাহাই সমালোচনার যোগ্য হয় না। সরাসরিভাবে যে-সে'ই যে-কোনও বিষয়ে একটা মতামত প্রকাশ করিতে পারে। এক্ষেত্রে লোকে শুদ্ধ নিজ নিজ রুচি বা প্রবৃত্তির দ্বারা অপরের কর্ম্মাকর্ম্মের ভালমন্দের বিচার করে। কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা কেবল স্তুতিবাদ বা নিন্দাবাদ নহে। আর এসকল সরাসরি রায় খুব জাঁকাল ও ঝাঁঝাল ভাষায় প্রকাশিত হইলেও শ্রেষ্ঠ বা সত্য সমালোচনা হয় না।

কোনও বস্তুর ওজন করিতে একটা পাল্লাবাট্‌খারার আবশ্যক হয়। আর এই পাল্লাবাটখারা আমরা সকলে আপন আপন মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না ও তুলিতে যাই না। সে ওজন বাজারে চলিবে না। আমাদের ব্যক্তিগত রুচি, শক্তি, বা স্বার্থের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নাই, যাহা আমরা নিজেদের মনোমত করিয়া গড়িয়া তুলি নাই, যাহা সমাজের সমষ্টিভূত শাসন-শক্তির প্রতিনিধি রাজা সকলের উপর হইতে, সমানভাবে সকলের উপরে, জারী করিয়া দেন, অমন পাল্লাবাট্‌খারা দিয়াই আমরা পণ্য বিনিময়কালে বস্তুর ওজন করিয়া থাকি। এ ওজন তোমারও নয় আমারও নয়, ইহা সকলের। সেইরূপ কেবল তোমার বা আমার নিজের রুচির, প্রবৃত্তির, বা খেয়ালের দ্বারা সাহিত্য-সৃষ্টির সত্য ওজনও করিতে পারি না। এরূপ সমালোচনার কোনও প্রকারের সার্ব্বজনীনতা বা প্রামাণ্য-অধিকার থাকিতে পারে না। দুই জনের মতের অমিল হইলে, এক্ষেত্রে তার কোনও মীমাংসার পথ থাকে না।

সাহিত্য-সমালোচনার একটা মাপকাঠি চাই। সে মাপকাঠি সরকারী মাপকাঠি হওয়া চাই; দশজনে তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মানিবে বা মানিতে বাধ্য হইবে, এমন মাপকাঠি চাই। না হইলে

এসকল সমালোচনা কেবল বাক্‌বিতণ্ডাতেই যাইয়া শেষ হইবে। এখানে, এইজন্য প্রথম প্রশ্ন এই—এই মাপকাঠি কোথায় পাইব?

এই মাপকাঠিটি খুঁজিতে যাইয়া, প্রথমে সাহিত্য-সৃষ্টির কথা ছাড়িয়া, একবার প্রাকৃত সৃষ্টির দিকে চাহিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। এক বাগানে বহুতর গোলাপ ফুটিয়া আছে, সে-গোলাপগুলির মধ্যে কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তার বিচার করিব কিসে? সচরাচর সকলেই সে বিচার করে কি দিয়া? ঐ গোলাপ-বাগানের দিকে তাকাইলেই দেখি সকল গোলাপই যেন প্রাণপণ করিয়া এমন একটা আকারে ফুটিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা সকলের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোনওটিতেই নিঃশেষিত হয় নাই। প্রত্যেক গোলাপের আড়ালে একটা আদর্শ-গোলাপ রহিয়াছে, আর প্রত্যেক গোলাপই সেই আদর্শ-গোলাপটিকে নিজেদের আকার ও আয়তন, বর্ণ ও গন্ধের ভিতর দিয়া ফুটাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই যে আদর্শ-গোলাপটি যার আভাস প্রত্যেক স্বতন্ত্র গোলাপটি একদিকে ও সকল গোলাপ মিলিয়া অন্যদিকে আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দেয়, তাহাই গোলাপের বাজারের বাট্‌খারা। ঐ আদর্শের ওজনেই কোন্ গোলাপ ভাল আর কোন্ গোলাপ মন্দ, তার বিচার করিয়া থাকি; আমার বা তোমার একটা স্বকপোল-কল্পিত আদর্শের দ্বারা এবিচার করি না। এই আদর্শটিই গোলাপ-জাতির নিজের স্বরূপ। ঐটিকে ফুটাইয়া তোলাই গোলাপ-জীবনের স্থির লক্ষ্য। গোলাপের অভিব্যক্তি-গতির ঐটিই চরম গন্তব্য। গোলাপ-সমাজের নীতির ঐটিই পরম নিয়তি। গোলাপের বেলায় আমরা সকলেই এটি বুঝি ও মানি। তারই জন্য শতদলপদ্মের মতন গোলাপ কেন অত বড় হয় না, এ দুঃখ করি না। শতদলের দ্বারা গোলাপের ভালমন্দের বিচার করিতে যাই না। গোলাপের দ্বারাও অপরাজিতার বা রজনীগন্ধার বিচারে প্রবৃত্ত হই না।

এইরূপে প্রাকৃত সৃষ্টির মধ্যে আমরা প্রত্যেক বস্তুরই এক

একটা নিজস্ব স্বরূপ উপলব্ধি করি। জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তাদের এই নিজস্ব স্বরূপটিকেই ফুটাইবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। কোনওটি বা আপনার স্বরূপকে আপনার রূপের ভিতরে একটু বেশী ফুটাইয়া তোলে, কোনওটি বা একটু কম ফোটায়; কিন্তু কোনও বস্তুই আপনার এই স্বরূপকে নিঃশেষে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। এই সৃষ্টি-ধারাতে পারে না; তবে সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে যাহা এরূপভাবে নিয়তই ফুটিয়া উঠিতেছে, দেখিতে পাই, তাহা যে কোথাও নিঃশেষে নিত্যভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া আছে, তাহাও মানিতেই হয়। ঐটি না মানিলে এই সৃষ্টির মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা, কোনও নিয়ম, কোনও অপরিহার্য্য কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ কিম্বা পৌর্ব্বাপর্য্য কল্পনাও করিতে পারা যায় না। আর এই কল্পনার কোনও আশ্রয় না থাকিলে, আমরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত স্পর্দ্ধা করি, সকলই তাসের ঘরের মতন গড়িতে গড়িতে ক্ষণে ক্ষণে নিজেদের নিঃশ্বাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। যে গোলাপ-রূপ ভিন্ন ভিন্ন গোলাপের অসংখ্য আকার বর্ণাদির ভিতরে, কোথাও বা কম, আর কোথাও বা বেশী ফুটিয়াছে, তাহা যদি কোথাও নিঃশেষে নিত্যকাল ফুটিয়া না থাকে, তবে এই প্রত্যক্ষ গোলাপের অভিব্যক্তির কোনও অর্থ হয় না। যে কোকিল-রূপ অসংখ্য-কোকিলের ভিতরে, কোথাও বা কম, আর কোথাও বা বেশী ফুটিয়াছে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা যদি নিঃশেষে কোথাও নিত্যকাল প্রস্ফুট না থাকে, তবে কোকিল-জীবনের সার্থকতা থাকে কৈ? জীব-সমাজে প্রত্যেক জীবের এই নিজস্ব স্বরূপটি কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়া আছে বলিয়াই জীবের ক্রমবিকাশ বা ইভোলিউশন সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের, এবং জন-সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা পরিপূর্ণ, নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ কোথাও আছে বলিয়াই ব্যক্তিগত জীবনের এবং সমাজ-জীবনের বিবিধ সম্বন্ধসকলের একটা অর্থ আছে। আর এই যে নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ-বস্তু তারই দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন

ব্যক্তির ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বিভিন্ন সম্বন্ধ সকলের সত্যাসত্যের ও ভাল-মন্দের বিচার করিয়া থাকি। এটি না থাকিলে, আমাদের এসকল বিচার-আলোচনার, এসকল শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টভেদের কোনও ভিত্তি, কোনও যুক্তি, কোনও সঙ্গতি থাকিত না। আর এই প্রত্যক্ষ জড়, উদ্ভিদ জীব ও মানব-জগৎই ত সর্ব্বপ্রকারের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল উপাদান। সুতরাং সাহিত্যের সৃষ্টি-বিশেষ যেসকল উপাদান লইয়া যেসকল রস-চিত্র ফুটাইতে চাহে, তার যে নিজস্ব ও নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটি আছে, তাহারই দ্বারা সে সাহিত্য-সৃষ্টির ভাল-মন্দের বিচার করিতে হইব। যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে ফুলের প্রাণ, মলয়ের গান, পতঙ্গের রূপ, আকাশের মহিমা, কিম্বা মানব-সমাজের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ বা প্রয়াসকে ফুটাইতে চায়, সেই ফুলের, মলয়ের, পতঙ্গের, আকাশের, বা বিশিষ্ট মানবীয় সম্বন্ধের নিজস্ব নিত্যসিদ্ধ স্বরূপের দ্বারাই তার সত্যাসত্যের ও ভালমন্দের বিচার করিতে হইবে। অন্য কোনও কিছুর দ্বারা এ বিচার হয় না ও হইতেই পারে না। ভাই-ভগিনার সম্বন্ধের সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ নায়ক-নায়িকার মাধুর্য্যের ওজন দিয়া ঠিক করা যায় না। মায়ের বাৎসল্যকেও পত্নীর অনুরাগের দাঁড়িপাল্লায় চড়ান যায় না। শান্তের দ্বারা কারুণ্যের, কিম্বা বীভৎসের দ্বারা ভয়ানকের, কিম্বা দাস্যের দ্বারা সখ্যের ওজন কখনও সম্ভব হয় কি? প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক রসকে তার নিজের ঐ নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটির দ্বারাই বিচার করিতে হয়।

এই জন্য সাহিত্য-সমালোচনা বলিতে আমি সাহিত্য সৃষ্টি-বিশেষের নিজের আদর্শের দ্বারা তার বাস্তবতার, নিজের লক্ষ্যের দ্বারা তার প্রয়াসের, নিজের গন্তব্যের দ্বারা তার গতির, নিজের নিয়তির দ্বারা তার নীতির, নিজের স্বরূপের দ্বারা তার রূপের—সত্যাসত্যের ও উৎকর্ষা-পকর্ষের বিচার বুঝি ইহাই সাহিত্য-সমালোচনার সত্য আদর্শ।

সাহিত্য-সমালোচনার ভূমি

কিন্তু সকল সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই সমালোচনার ভূমি গড়িয়া উঠে না। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর এই যে স্বরূপের কথা বলিলাম, ইহা প্রগ-

মতঃ সেই বস্তুর মধ্যেই ফুটিয়া উঠে, সে বস্তুর বাহিরে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গোলাপের স্বরূপ অপরাজিতাতে, কিম্বা ফুলের স্বরূপ ভূমিলতাতে, কিম্বা কৃমির স্বরূপ পাখীতে, পশুরাজের স্বরূপ শশকে, অথবা হরিণের স্বরূপ ভল্লুকেতে পাওয়া যায় না। মানুষের স্বরূপ-বস্তু যে কি, তাহা কেবল মানুষের রূপের ভিতরেই দেখিতে পাই। আর দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বস্তুর বিকাশ-ক্রমের একটা বিশেষ অবস্থাতে বা সোপানেই কেবল তার নিজস্ব রূপের প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে, আর তখনই কেবল আমরা তার এই স্বরূপটিরও আভাস পাইয়া থাকি, তার পূর্ব্বে পাই না। যে আদি-কোষাণু বা cell হইতে মানুষের জন্ম হয়, তাহাতে মানুষের এই স্বরূপটির সন্ধান পাওয়া যায় না। এই কোষাণুতে জীবের জীবন-বীজ অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে। ভগবান্ ভাষ্য-কার সৃষ্টির আদিতে যে নাম-রূপের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাহাকে তিনি অব্যাকৃত কিন্তু ব্যাচিকীর্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, জীবের কোষাণু সেই নাম-রূপেরই পর্য্যায়ভুক্ত। জীবের এই আদি কোষাণুগুলি সব একাকার। কুকুরের কোষাণু দেখিতে যেমন, ঘোড়ার বা মানুষের কোষাণুও ঠিক সেইরূপই। এমন কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার আজি পর্য্যন্ত হয় নাই,—কখনও হইবে বলিয়াও বোধ হয় না—যাহার সাহায্যে আমরা কুকুরের বা বানরের কোষাণু হইতে মানুষের কোষাণুকে পৃথক্ করিতে পারি বা পারিব। আর ঐ মানব-কোষাণুর মধ্যে, মানব-দেহের রূপ যে কি, তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। আর যেখানে বস্তুর রূপ ফোটে নাই, সেখানে তার নিজস্ব স্বরূপ যে কি, তাহাও ধরা পড়ে না। বস্তুর গঠনটি কিছু কিছু জমাট বাঁধিতে আরম্ভ না করিলে, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিতে আরম্ভ করে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে আরম্ভ না করিলে, অঙ্গীর রূপ ও স্বরূপ, নীতি ও নিয়তি, কিছুই ধরা পড়ে না। সে অবস্থায়, সেই নির্ব্বিশেষ একাকারত্বের মধ্যে, কিম্বা সেই অসম্বদ্ধ সমষ্টির ভিতরে কোনও

নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব স্বরূপ ও লক্ষ্য যে কি, ইহা তার অভিব্যক্তি ধারার একটা বিশেষ অবস্থাতেই কেবল প্রত্যক্ষগোচর ও জ্ঞানগম্য হয়, তার পূর্ব্বে হয় না।

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একথা খাটে। এমন সকল লেখা ত সর্ব্বদাই চক্ষে পড়ে, যাহার মধ্যে কেবল কতকগুলি স্বল্পবিস্তর সুললিত কিম্বা শ্রবণকটু, সার্থক কিম্বা নিরর্থক শব্দসমষ্টি ব্যতীত আর বড় বেশী কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও মানুষকে দেখিবামাত্রই যেমন তার বৈশিষ্ট্যটুকু আমাদের নেত্রপটে অঙ্কিত হইয়া যায়, সেইরূপ কোনও রচনা পাঠ করিবামাত্রই তার বিশেষত্ব, তার সাধ্য, তার অভিধেয় ও প্রয়োজন আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। আবার এমন রচনাও ত সর্ব্বদাই চক্ষে পড়ে, যাহার কোনও প্রকারের বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই বুঝা যায় না। এমন সকল কাব্য, উপন্যাস, নবন্যাস, নাটকাদি বিস্তর আছে, যাহাতে ঝঙ্কার আছে, ভিন্ন ভিন্ন রসও স্থানে স্থানে আছে, ভিন্ন ভিন্ন চিত্র বা চরিত্রও স্বল্পাধিক ফুটিয়াছে; কিন্তু যাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পরের সঙ্গে কিম্বা এসকল বিভিন্ন অংশের সে রচনার সমগ্রের সঙ্গে কোনওই সুস্পষ্ট অপরিহার্য্য সম্বন্ধের প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই; যাহার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র একে অন্যের প্রয়োজনে সন্নিবিষ্ট হয় নাই এবং যাহার সকল-চরিত্র মিলিয়া কোনও বিশেষ লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করে না। ইট কাঠ, লোহা-লক্কড়, চূণ-সুরকী একত্র করিয়া রাখিলেই যেমন সে স্তূপের মধ্যে কোনও এমারতের রূপ পাওয়া যায় না; এই সকল রস-চিত্র এবং লোক-চরিত্রের গোলাঘরে বা তোষাখানাতেও সেইরূপ কোনও সাহিত্য-সৃষ্টির রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এসকল সাহিত্য-চেষ্টাতে কোনও বিশেষ স্থানে কোনও রস-বিশেষের বা চরিত্র-বিশেষের অবতারণা কেন যে করা হইয়াছে, এই প্রশ্নের কোনই সঙ্গত ও সন্তোষকর উত্তর পাওয়া যায় না। যাহার ভিন্ন

বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ মিলিয়া কোনও বিশিষ্ট চরিত্রকে বা রসের রূপকে গড়িয়া ও ফুটাইয়া তোলে নাই, কিম্বা কোনও বোধগম্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করে নাই, এমন রচনা গদ্যে পদ্যে হাজার হাজার আমাদের মাসিকে ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। এসকল অসম্বদ্ধ, অগঠিত, অপরিণত ও অপরিপক্ক সাহিত্য-চেষ্টার মধ্যে সত্য সাহিত্য-সমালোচনার কোনও ভূমি পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সাহিত্য-সৃষ্টিকে তার নিজের স্বরূপ দিয়াই ত বিচার করিতে হয়। কিন্তু এসকল সাহিত্য-চেষ্টাতে কোনও প্রকারের স্বরূপের সন্ধান মিলে না। এইজন্য এগুলি সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য হয় না।

আমার বিবেচনায় "নারায়ণের" এই কথানাট্যগুলিও এই মর্য্যাদা লাভের যোগ্য নহে। কারণ, এসকলের মধ্যে বিশেষ কোনও রূপের, কোনও লক্ষ্যের, কোনও একটা স্থির ও কেন্দ্রস্থ উদ্দেশ্যের, কোনও আদর্শের সন্ধান পাই না। লেখক কোন্ নাট্যে কোন্ মূল বস্তু বা চরিত্র বা রস-চিত্রকে ফুটাইতে চাহিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। "আঁধার ঘরে"র মধ্যে একটা লক্ষ্যের অতি ক্ষীণ আভাস হয় ত বা পাওয়া যাইতেও পারে; "মরণের জয়ে" কিম্বা "হাসির দামে" তাহা একেবারেই পাওয়া যায় না।

আর্টের অন্তরঙ্গ লক্ষ্য

যাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া এই কথা-নাট্যগুলির অত প্রশংসা করেন, এইখানেই বোধ হয়, তাঁহাদের সঙ্গে আমার বিরোধের প্রথম সূত্রপাত হইবে। আর্টবাদীগণ বলিবেন, আর্টের আবার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নের দ্বারা নীতিবাদী বা ধর্ম্মবাদী বা সংস্কারবাদী বা হিতবাদী সমালোচককে নিরুত্তর করা কঠিন নহে। কিন্তু আমি এখানে যে উদ্দেশ্যের বা লক্ষ্যের কথা তুলিয়াছি তাহা আর্টের বাহিরের নয়, তার ভিতরের কথা। আর্ট ধর্ম্ম-প্রচার করে না, মত

প্রতিষ্ঠা করে না, সমাজ-সংস্কার বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ যাহাতে হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখে না। এসকল মানিলাম। কিন্তু আর্টের নিজের যে একটা লক্ষ্য আছে, এই সকল মামুলী কথা দিয়া, তার বিচার আলোচনার মুখ বন্ধ করা যায় না। আর্ট ত একটা কর্ম্ম। কর্ম্মমাত্রেই ত কতকগুলি উপায় অবলম্বনে একটা উদ্দেশ্য সাধন করে। নিষ্কাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত লক্ষ্যহীন হয় না। কবিতাকে আমরা আর্ট বলি। কিন্তু কবিতা ত শুকদেবের মতন একেবারে শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় না। তাহা ত তিলে তিলে গড়িয়া উঠে। আর যাহা ক্রমে ক্রমে গড়ে, অনেক গুলি বস্তুকে এক করিয়া, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে বস্তুর রূপকে ফুটাইতে হয়, সে বস্তুর এই সকল অঙ্গ-যোজনা বা সম্বন্ধ-গঠনের একটা মূল লক্ষ্য না থাকিলে চলে কি? ইংরাজিতে শব্দ-নির্ম্মাণ ও শব্দ-গ্রহণ (word-making and word taking) নামে একটা ছেলেদের খেলা আছে। অনেকগুলি ছোট ছোট তাসে ইংরাজি বর্ণমালার ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরগুলি মুদ্রিত থাকে, এই তাসগুলিই এই খেলার সাজ-সরঞ্জাম। এই ভিন্ন ভিন্ন অক্ষরাঙ্কিত তাসগুলিকে একটা কৌটায় পুরিয়া কিছুক্ষণ নাড়িলেই ত আর শব্দ নির্ম্মাণ বা word-making হইবে না। প্রত্যেক অক্ষরটিকে এমন ভাবে পর পর সাজাইতে হইবে যেন তারা সকলে মিলিয়া একটা সার্থক শব্দ-রচনা করিতে পারে, তবেই সে সাজান সফল হইবে। এখানে ঐ শব্দটি গড়িয়া তুলাই ঐ বর্ণ-বিন্যাসের লক্ষ্য। ঐ শব্দ শুনিয়া বা পড়িয়া কে কি ভাবিবে বা করিবে, তার সঙ্গে এই লক্ষ্যের সম্বন্ধ নাই। শব্দটি গঠিত হইলেই, এই চেষ্টাটা সফল হইল। আর্ট বা রস-সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। কবির কাব্য বা নাট্য বা উপন্যাস পড়িয়া, কিম্বা চিত্রকরের চিত্র অথবা ভাস্করের ভাস্কর্য্য দেখিয়া কে কি ভাবিবে বা করিবে, তাহার বিচার-বিবেচনা আর্টের নয়। কিন্তু ঐ কাব্য, নাট্য, উপন্যাস, চিত্র, বা ভাস্কর্য্য রচনার

নিজের ত একটা অন্তরঙ্গ লক্ষ্য আছে। কবি যখন একটি শব্দের পর আর একটি শব্দ বসান; নাট্যকার যখন একটি দৃশ্যের পর আর একটি দৃশ্য প্রকাশিত করেন ও সেই দৃশ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকে আনিয়া উপস্থিত করেন; চিত্রকর যখন তুলি ও রং লইয়া একটি রেখার পর আর একটি রেখা টানেন; অথবা ভাস্কর যখন সম্মুখের মর্ম্মরখণ্ডের উপরে বাটালি দিয়া এদিকে ওদিকে আঘাত করেন; তখন এসকলের মধ্যে কি একটা লক্ষ্য থাকে না? কবির প্রত্যেক শব্দ-যোজনার অন্তরালে সমগ্র চরণটির, প্রত্যেক চরণটির সংস্থানের মধ্যে সমগ্র কবিতাটির প্রতি কি লক্ষ্য থাকে না? ঐ সমগ্রতার দ্বারাই কি তাঁর কবিতার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, চরণ প্রভৃতি এক একটি বিশেষ স্থানে যাইয়া বসিতে বাধ্য হয় না? আর ঐ সমগ্র কবিতাটি যে কি, তাহা কি এই শব্দ ও চরণ-বিন্যাসের মধ্যেই প্রকাশ পায় না? নাট্যকার, চিত্রকর, ভাস্কর, সকল-রস-স্রষ্টা বা আর্টিষ্ট সম্বন্ধেই কি একথা খাটে না? এই নিজস্ব, অন্তরঙ্গ লক্ষ্যও কি আর্টের নাই? আর্টবাদীগণ এমন অদ্ভুত কথা কহিবেন বা কহিতে সাহসী হইবেন বলিয়া মনে হয় না।

নাট্যের লক্ষণ

লেখক এগুলিকে কথা-নাট্য বলেন। আমাদের নাট্যকলায় কথা-নাট্যের কোনও বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে কি না, জানি না। সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, কথার দ্বারা যে নাটকের অভিনয় হয়, তাহাকেই কথা-নাট্য বলা যাইতে পারে। গানের দ্বারা যার অভিনয় হয়, তাহাকেই আমরা গীতি-নাট্য বলিয়া থাকি। ইহা ছাড়া এই "কথা" বিশেষণের আর কোনও বিশেষ সার্থকতা আছে কি না, পণ্ডিতেরা জানেন, আমি জানি না। জানাও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। এগুলি যে নাট্য, ইহা জানাই এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত। কারণ, নাট্য কাহাকে বলে, নাট্য কিসে হয়, এজ্ঞান মোটা

মোটি সকলেরই আছে। দেশ-কাল ও কর্ম্ম-বিশেষের যথাযোগ্য সমাবেশের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির আচার-আচরণ ও উক্তি-প্রত্যুক্তির সাহায্যে তাহাদের চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলাই, মোটামোটি নাট্য-সাহিত্যের লক্ষ্য। নাট্যে একাধিক চরিত্রের অবতারণা করা হইলেও, প্রত্যেক নাট্যেই একটি কি দুইটি মূল চরিত্র থাকে। সেই মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়াই অপর সকল চরিত্রগুলি আত্মপ্রকাশ করে। নদীসকল যেমন ঋজু-কুটিল পথে একই সাগরাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ ঐ নাট্যের সকল দৃশ্য, সকল কর্ম্ম, সকল কর্ত্তা, সকল কথাবার্ত্তা, কেন্দ্রস্থিত চরিত্রটিকে বা চরিত্রগুলিকেই ফুটাইতে চেষ্টা করে। সহজ বুদ্ধিতে ইহাই নাট্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। এই লক্ষ্য বাহিরের নয়, ভিতরের; এটি নাট্যের নিজস্ব অন্তরঙ্গ লক্ষ্য। গীতি-নাট্যেরও এই লক্ষ্য। কথা-নাট্যেরও, নাট্য বলিয়াই, এই লক্ষ্য থাকা চাই। যে সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই লক্ষ্যটি ফোটে নাই, তাহা আর যাহাই হউক না কেন, নাট্য নহে, ইহা নিশ্চিত।

তার পর কেবল চরিতচিত্রাঙ্কনই নাট্যের উদ্দেশ্য নহে। নাট্যের চরিত্রসকল সমাজের লোক-চরিত্র হইতেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই সকল লোক-চরিত্র অসংখ্য। কবি কাব্য বা নাট্য রচনাকালে এসকলের মধ্য হইতে দুই চারিটি চরিত্র বাছিয়া লইয়া, তাহাদিগকে আপনার কাব্যে বা নাট্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই বাছুনির সূত্র কি? কবি কোন্ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সমাজের বহুবিধ লোক-চরিত্রের মধ্যে এই দুই চারিটি চরিত্রকে বাছিয়া লন? এ বাছুনির কি কোনও লক্ষ্য নাই? এ কি কেবল একটা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র? কেবল একটা খাম-খেয়াল? তা ত নয়। এই বাছুনির একটি লক্ষ্য থাকে। সে লক্ষ্যটি রস। আর ঐ রসই কাব্যের বা নাট্যের চরিত্রাঙ্কনের মূল কথা। ঐ রসের প্রয়োজনেই কবি চারিদিকের সমাজের অসংখ্য লোক-চরিত্র হইতে দু'চারিটি চরিত্রকে বাছিয়া, তাঁর কাব্যে বা নাট্যে সন্নিবেশিত ও

অঙ্কিত করেন। কবি কোন্ রস ফুটাইতে চান, তাহা ভাবিয়াই তাঁর কাব্যের মূল নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচন করেন। ইহাদিগকে তিনি একটা বিশিষ্ট রসের মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তোলেন। কিন্তু কোনও রসই নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে থাকে না। রস বৈচিত্র্য না হইলে কোনও রসই ফোটে না। এই রস-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার জন্যই কবি আপনার কাব্যের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের, ঘটনার এবং ইতর চরিত্রগুলির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইজন্য সকল কাব্যেই নানা রসের অবতারণা হয়; কিন্তু এসকলের মধ্যে একটি রসই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফোটে। সেইটিই সে কাব্যের বা নাট্যের মূল আশ্রয় হয়। কিন্তু এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে কোনও একটা বিশিষ্ট রসের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। নানা চরিত্রের সমাবেশ হইয়াছে, ইহা দেখিতেছি। ইহাতে নানাবিধ রসের আভাসও পাওয়া যায়, ইহা মানি। কিন্তু মূল রস যে কোন্‌টা, ইহার সন্ধান মিলে না। কোন্ চরিত্র যে মূল চরিত্র, আর কোন্ গুলিই বা সেই মূল চরিত্রকে ফুটাইবার জন্য রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা ঠিক করা কঠিন। আর এই জন্যই বলি, এগুলিতে কোনও রসের বৈশিষ্ট্য, কোনও রূপের বৈশিষ্ট্য, কোনও লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে নাই। যে সকল উপায় ও উপকরণে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কাব্যের বা নাট্যের নিজস্ব স্বরূপ ও লক্ষ্য তার নিজের অঙ্গেই ফুটিয়া উঠে, এগুলিতে তাহা পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই এগুলির মধ্যে সত্য সাহিত্য-সমালোচনার ভূমি প্রস্তুত হয় নাই। এগুলি সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার একেবারেই যোগ্য নহে।*

---

* প্রথমে—জ্যৈষ্ঠের "নারায়ণে" প্রকাশিত "মরণের জয়" নামক কথা-নাট্যের কথাই বলি। এখানি কোন্ রসাশ্রিত নাট্য? অনেকেই হয় ত এক নিঃশ্বাসে এটিকে আদিরসাশ্রিত বলিবেন। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এ রসের আশ্রয় কে? আঙুর? না রমেন্দ্র? না রমেন্দ্রের স্ত্রী? ইহাদের কাহার মধ্যে

নাট্যকলা ও রসসৃষ্টি

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এই কথানাট্যগুলি সকলই আদিরসাশ্রিত। কিন্তু যেখানে কামের ক্রীড়া, সেখানেই যে আদিরস ফোটে, তাহা নয়। আর কাব্যে বা নাট্যে কেবল রস থাকিলেই হয় না, সে রস সাকার, মূর্ত্তিমান হওয়া আবশ্যক। অমূর্ত্ত রসকে মূর্ত্তিমান, নিরাকার ভাবকে সাকার করিয়া তোলাই কাব্যের লক্ষ্য। আর যে কাব্যে বা নাট্যে যে রসকে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলে, তাহাকে সেই রসাশ্রিত-কাব্য বা নাট্য বলা যায়। যাহাতে আদিরসের মূর্ত্তি ফোটে, তাহাকে আদিরসাশ্রিত কহে। কালিদাসের 'শকুন্তলা" আদিরসাশ্রিত। প্রীতি ইহার মূল রস। এইজন্য দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা দুইজনাতেই আদিরসের একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটিয়াছে। ভবভূতির "উত্তররামচরিত" আদি

আদিরসের মূর্ত্তি ফুটিয়াছে? আঙুর রমেন্দ্রকে ভালবাসে না। সে একবারে আর একজনকে ভালবাসিত। সেই অবর্ত্তমান আশ্রয়কে ধরিয়াও তার .. মূর্ত্তিমান হইতে পারিত। কেবল মিলনের আনন্দেই যে আদিরসের মূর্ত্তি ফোটে, তাহা নহে; বিরহের নিরাশা ও নিরানন্দে বোধ হয় আরও বেশী ফুটিয়া উঠে। "মেঘদূতে" যক্ষের অবর্ত্তমানেই যক্ষপত্নীর মধ্যে আদিরসের একটি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটিয়াছে। "উত্তররামচরিতে" ভবভূতি দণ্ডকারণ্যে সীতাবিরহ-ক্লিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে এই রসের একটি অপূর্ব্ব রূপ ফুটাইয়াছেন। কিন্তু একদিন যাহাকে ধরিয়া আঙুরের রস ফুটনোন্মুখ হইয়াছিল, এখানে সে কেবল অবর্ত্তমান নয়, সে অদৃশ্য হইয়া বিরহের দ্বারাও আঙুরকে অধিকার করিতে পারে নাই। এ নাট্যে সে রসের চিহ্নমাত্রও নাই। তার একটা ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র, বহুদিনের পূর্ব্বকার নিশাশেষের সুখ-স্বপ্নের স্মৃতির মতন, মাঝে মাঝে আঙুরের প্রাণে ভাসিয়া উঠে। সে স্মৃতি তাহাকে দখল করিতে পারে নাই। সে রস আঙুরকে গ্রাস করে নাই। আর রসবিশেষ যতক্ষণ আপনার আধারকে একেবারে গ্রাস করিতে না পারে, ততক্ষণ তার মূর্ত্তি গড়ে না। আঙুরের মধ্যে বারবনিতাবৃত্তির একটা মামুলী অতৃপ্তি মাত্র দেখি। এই অতৃপ্তির আশ্রয়েও একটা অপূর্ব্ব করুণ-রস ফুটিয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু লেখকের অক্ষমতা-নিবন্ধন তাহাও ফোটে নাই। আঙুরে কি আদি, কি করুণ, কোনও রসই

রসাশ্রিত, শ্রীরামচন্দ্রেতে এই রস মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। দুষ্মন্ত ও শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে কত বৈষম্য, কত বৈচিত্র্য, দুই যে একই রসমূর্ত্তি সহজে এমনটা নাও বা মনে হইতে পারে। কিন্তু উভয়ের মধ্যেই মাধুর্য্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের, নায়কধর্ম্মের সঙ্গে রাজধর্ম্মের বিরোধ দেখিতে পাই। আর দুইজনে এই বিরোধের মধ্যে মাধুর্য্যের দুইটি মূর্ত্তি ফুটাইয়াছেন। শেক্ষপীয়ারের "রোমিও-জুলিয়েট", "ওথেলো," "হ্যামলেট," প্রভৃতি আদিরসাশ্রিত; আর এই নাটকগুলির প্রত্যেক নায়ক ও নায়িকা এক একটি রসমূর্ত্তি হইয়া, এই অনঙ্গ রসকে পুষ্টাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর", "বিষবৃক্ষ" কৃষ্ণকান্তের উইল", এগুলি আদি-রসাশ্রিত। আর "চন্দ্রশেখরের" শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর নিজে; "বিষবৃক্ষের" নগেন্দ্র. সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, শ্রীশচন্দ্র, কমলমণি, হীরা, দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত—এক একটি রসমূর্ত্তি হইয়া ফুটিয়াছে, ইহারা সকলেই এই উজ্জ্বলোজ্জ্বল রসের বিবিধ বিলাসদেহের সৃষ্টি করিয়াছে। "কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলাল, ভ্রমর, রোহিণী তিনটিই আদি-

ফোটে নাই, দু'য়েরই একটা কল্পিত আবছায়া মাত্র দেখা যায়। ইহাতে রস ফোটে নাই, রসাভাস মাত্র দেখা যায়। ফলতঃ আঙুরে কোন মৌলিকতাও নাই। পোষের "নারায়ণে" "ডালিম" নামে যে ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল, "আঙুর" সেই "ডালিমে"রই একটা ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র। দু'য়ের আকার ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপ এক। আর ঐ ডালিমের আবছায়াটুকুই আঙুরের যা কিছু মিষ্টত্বের ও বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তারপর রমেন্দ্রের কথা। রমেন্দ্রকেই কি আদিরসের মূর্ত্তি বলা যায়? রমেন্দ্রের সে অনুরাগ কৈ? তার মধ্যে কামোন্মাদই বা ফুটিয়াছে কৈ? রমেন্দ্রের মধ্যে একটা নেশার ঝোঁকই কেবল ফুটিয়াছে, কোনও রস আদৌ ফোটে নাই। এই নেশাতে যদি আঙুরকে বা তার নিজের স্ত্রীকে কোনও বিশিষ্ট রসমূর্ত্তিরূপে ফুটাইতে পারিত, তাহা হইলে এই নাট্যে এই মাতাল-চিত্রেরও একটা সার্থকতা থাকিত। কিন্তু তাহাও ত দেখা যায় না। তারপর, রমেন্দ্রের স্ত্রী। তাহার মধ্যেই বা কোন্ রস প্রত্যক্ষ হয়? আঙুর, রমেন্দ্র, রমেন্দ্রের স্ত্রী, তিন জনের মধ্যেই একটা

রসের মূর্ত্তি। চন্দ্রশেখরও যে আদিরসের মূর্ত্তি হঠাৎ তাহা মনে নাও বা হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাচীন রসতত্ত্ববিদেরা যে চতুর্ব্বিধ নায়কের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রেণীবিভাগ দিয়া বিচার করিলে, প্রতাপকে আদিরসের ধীরোদাত্ত এবং চন্দ্রশেখরকে ধীর-শান্ত মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীত হইবে। বারবনিতাকে আশ্রয় করিয়াও যে অতি শ্রেষ্ঠ আদিরস ফুটিতে পারে, গীরিশবাবুর "বিল্বমঙ্গল" তার সাক্ষী। এখানে আমি কৃষ্ণ-ভক্ত বিল্বমঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি না, কিন্তু চিন্তামণি-প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গলের কথাই বলিতেছি। বিল্ব-মঙ্গল যদি ভক্তরূপে ফুটিয়া নাই উঠিতেন, তাহাতেও তাঁর এই অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি অপূর্ণ থাকিত না। হয় ত বা তাহা হইলে, "বিল্বমঙ্গল" নাট্য হিসাবে, রস-চিত্র হিসাবে, বর্ত্তমান "বিল্বমঙ্গল" অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত। পরিণামে ভক্তপ্রধানরূপে পরিণত হইয়া, বিল্ব মঙ্গল, সত্য অনুরাগ ও প্রেমবস্তু যে আধারে বা যে আশ্রয়েই ফুটুক না কেন, তাহা বস্তুতঃ ও স্বরূপতঃ যে এক, ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। এটি

স্বল্লাধিক বলবতী কাম-প্রবৃত্তির বা sex-impulseএর আভাস পাওয়া যায়। ইহা সাধারণ জীব-ধর্ম্ম মাত্র। এই জীব-ধর্ম্ম যখন কোনও জীবকে গ্রাস করিতে পারে, তখনই কামোন্মাদ জন্মে। তাহাও একটা রস-মূর্ত্তি। কিন্তু এই মূর্ত্তিই বা ইহাদের মধ্যে ফুটিয়াছে কৈ? আঙুরের সঙ্গে আর দশজন বারবনিতার কোনও পার্থক্য আছে কি? রমেন্দ্রের সঙ্গে তার সম-সামাজিক অবস্থার আর দশজন মাতালের প্রভেদ আছে কি? আর রমেন্দ্রের স্ত্রীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাতেই বা কোনও বস্তুতন্ত্রতা আছে কি? আঙুর ও রমেন্দ্র চিত্র নহে, ফটোগ্রাফ মাত্র। রমেন্দ্রের স্ত্রী চিত্র বটে, কিন্তু ফ্যান্সী-প্রতিষ্ঠিত, বস্তুতন্ত্রহীন। যে রসের দ্বারা ফটোগ্রাফ চিত্রে পরিণত হয়, সে রস আঙুরে বা রমেন্দ্রে নাই। যে বস্তু দ্বারা রস সত্য হয় সে বস্তুও রমেন্দ্রের স্ত্রীর মধ্যে নাই। এই জন্যই এই তথাকথিত কথা-নাট্যে কোনও রসের রূপ ফোটে নাই। তারপর এই নাট্যের ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যের সঙ্গে সেই সেই দৃশ্যের কর্ম্মের, সেই সকল দৃশ্যের ও কর্ম্মের সঙ্গে তার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের, এবং এ

প্রমাণ না করিলে, মধ্যযুগের মায়াবাদী ভক্তের প্রাণ তৃপ্ত হইত না, ইহা বুঝি। কিন্তু চিন্তামণির ভজনায় বিল্বমঙ্গলের যে অপূর্ব্ব রসমূর্ত্তি ফুটিয়াছিল, ভক্তমূর্ত্তি বিল্বমঙ্গলে তাহাই কেবল শুদ্ধ ও মার্জ্জিত হইয়াছে মাত্র, তার গঠনের বা উপাদানের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু "নারায়ণের" এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিতে কোনও বিশিষ্ট রসমূর্ত্তি ফোটে নাই। এগুলিতে রসের কথা আছে, কিন্তু রস নাই। রসের ঢং আছে, কিন্তু রূপ নাই। রূপের ছায়া আছে, কিন্তু বস্তু নাই। আর ইহাদের মধ্যে কোনও রসের রূপ ফোটে নাই বলিয়াই, ইহাদের স্বরূপেরও কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। স্বরূপের পরিচয় যার নাই, তার সত্য-সমালোচনা করা অসাধ্য।

ধর্ম্ম ও নীতির বিচারে "নারায়ণের" কথানাট্য

তথাপি এই হেয় ও অযোগ্য রচনাগুলির এমন সুদীর্ঘ সমা-

সকল চরিত্রের একের সঙ্গেও অন্যের কোনও অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। প্রথম দৃশ্যে গোলাপগাছ পুড়িয়া গেল। এই গোলাপগাছের ধ্বংসের সঙ্গে নাট্যের কোনও ঘটনার আন্তরিক সম্বন্ধ নাই। বাসন্তী রজনী পূর্ণিমার চাঁদ, চূতগন্ধ, ফুলের বাগান, এ সকল আদিরসের মামুলী অবলম্বন। এ সকলে বিরহিণীর বিরহ-জ্বালা বাড়াইয়া দেয়। রমেন্দ্রের স্ত্রী বিরহিণী। এ সকল বুঝা যায়। কিন্তু গোলাপগাছটি পুড়াইবার কোনও প্রয়োজন ছিল কি? আর রমেন্দ্রের স্ত্রীর যে অবস্থা,—যে পরিবারে সে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তার এই গোলাপগাছ "অমন সাধের"ই বা হইল কিসে? কোন্ চিত্রকে বা ভাবকে ফুটাইবার জন্য লেখক এখানে গোলাপ গাছটি আনিয়াছেন, কেনই বা তাহাকে পুড়াইয়া মারিলেন ইহার মর্ম্মবোধ হয় না। হয় ত তিনি বলিবেন যে একটা প্রতীক বা symbol রূপে এটিকে আনিয়াছেন। রমেন্দ্রের স্ত্রী যে শেষে পুড়িয়া মরিবে, তার পূর্ব্বাভাস দিয়া লেখক খুব একটা কাব্য-কৃতিত্ব ফুটাইয়াছেন, কেহ হয় ত এরূপ মনে করিতে পারেন। কিন্তু কাব্যকলায় প্রতীকের বা symbol-এর প্রতিষ্ঠা হয়, মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনে। এখানে সেরূপ কোনও প্রয়োজন বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধ ফুটিয়াছে কৈ? এই গোলাপগাছের উপরে অত ঝোঁক যে কেন দেওয়া হইল, ইহার এরূপ কোনও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহার অন্য কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে এপর্য্যন্ত প্রায় কেহই শুদ্ধ নাট্য-কলার বা সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্ দিয়া এগুলির কোনও বিচার করেন নাই, কেবল তথা-কথিত ধর্ম্মের ও নীতির দোহাই দিয়াই ইহাদের এমন নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ফলতঃ এগুলি এ নিন্দাবাদেরও যোগ্য নহে। আর যাঁহারা ধর্ম্মের ও নীতির নামে ইহাদের অমন নিন্দা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারাও কোথায়, কি ভাবে যে ইহাদের দ্বারা লোকের ধর্ম্মের হানি বা নীতির ভিত্তি শিথিল হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। অথচ এইরূপ নিন্দাবাদের দ্বারাই সাহিত্য-সমালোচনার সত্য আদর্শকে নষ্ট করা হয়। সেই আদর্শকে রক্ষা ও প্রস্ফুট করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনানুরোধেই এমন অযোগ্য রচনা লইয়া এত কথা বলিতে হইতেছে।

ধরিয়া লইলাম রমেন্দ্রের স্ত্রী গোলাপগাছ ভালবাসিত। কিন্তু তার আরও বহুতর ভালবাসার বস্তুও থাকিতে পারিত, হয় ত নিশ্চয়ই ছিল। সে হয় ত আমচুর ভালবাসিত; মিনি বিড়াল ভালবাসিত; পাড়ার নাপিত-বউয়ের কচি ছেলেটিকে ভালবাসিত। এত সব ভালবাসার বস্তুর সম্ভাবনা থাকিতে, গোলাপটিকে বাছিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? এটি না হইলে নাট্যের আখ্যায়িকার বা কোনও চরিত্রের বিকাশের ব্যাঘাত হইত কি? প্রথম দৃশ্য হইতে এই গোলাপ পুড়ান ব্যাপারটি বাদ দিলে নাট্যের কোনও অঙ্গহানি হয় না। আর এই গোলাপ-পুড়ানতেও লেখক একটা সামান্য সঙ্গতি পর্য্যন্ত রাখিতে পারেন নাই। প্রথম দৃশ্যের বর্ণনায় আছে—"বহ্নি সুন্দর মুকুলবেষ্টিত গোলাপবৃক্ষকে গ্রাস করিতে ধাইয়াছে". আর পরে, রমেন্দ্র যখন হীরার হার লইয়া চলিয়া গেল, তখন তার স্ত্রী বলিতেছে—"শুকন গোলাপের গাছশুদ্ধ ছাই হয়ে গেল।" এ সকল দেখিয়া এই মনে হয় যে লেখক তাঁর নাট্যের কোনও অন্তরঙ্গ প্রয়োজনে এ সকলের সমাবেশ করেন নাই—কোনও অন্তরঙ্গ প্রয়োজনের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁর নাই—কেবল কতকগুলি চুটকি ও চটকদার বোল ঝাড়িবার জন্য, যখন যেখানে যে দৃশ্যের অবতারণা আবশ্যক হইয়াছে, তখনই সেখানে তাহাকে আনিয়া ফেলিয়াছেন। মাতালেরা প্রায়ই বড় অদ্ভুত রসের কথা বলে।

ফলতঃ এগুলি পড়িয়া কাহারও যে অধর্ম্মে মতি জন্মিতে বা বাড়িতে পারে, এমন মনেই হয় না। যে সাহিত্যে পাপের চিত্রকে মোহিনী বেশে লোকসমক্ষে উপস্থিত করে, তাহারই দ্বারা এ অধর্ম্ম হইবার আশঙ্কা থাকে। অতি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেও এসকল বিপদের ভয় থাকতে পারে। কিন্তু এই তথা-কথিত কথা-নাট্যগুলির আর দোষগুণ যাহাই থাকুক বা না থাকুক, এগুলির মধ্যে একটিও পাপের বা দুর্নীতির মোহিনী-মূর্ত্তি ফোটে নাই। "মরণের জয়" পড়িয়া আঙুরের চরিত্রকে যাঁরা বেশ ফুটিয়াছে মনে করিবেন, তাঁদের মনেও বারাঙ্গণাবৃত্তির জ্বালার ভাবই জাগিবে, বারাঙ্গণার মৌখিক প্রীতির হীনতাবোধই প্রবল হইবে, এই চিত্র তার প্রতি কোনও

"বাঃ মাকড়া তুই যে খুব জাল বুনছিস্‌... এই যে তুমিও কি জাল বুন্‌তে এলে নাকি?" রমেন্দ্রের মুখে এই চটক্‌দার কথাটা দিবার জন্য তার বসিবার ঘরের দৃশ্যে—আবর্জ্জনা, ধূলা, জানালার মাকড়সার জাল-বুনা আনিতে হইয়াছে। কিন্তু রমেন্দ্র মদই খায়, টাকারও অভাব তার নাই, বাড়ীতে চাকর-বাকরেরও অভাব নাই। তার প্রতি তার স্ত্রীর অনুরাগের, কিম্বা তার উপরে তার মার স্নেহের অভাব নাই। সে যখন বাড়ীতে থাকে ঐ বাহিরের ঘরেই ত পড়িয়া থাকে। তার দু'পাঁচজন বন্ধুবান্ধবও ত আছে। তার মতন লোক নিঃসঙ্গভাবে থাকে না। এ অবস্থায় তার বসিবার ঘরের এ দৃশ্য কল্পনাতীত। ছেঁচ্‌কা মাতালের খোলার ঘরে এরূপ হওয়া কেবল সম্ভব নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রমেন্দ্র ত সে শ্রেণীর নয়। রমেন্দ্র ত নর্দ্দামায় গড়াগড়ি দেয় না। সে ত নীচশ্রেণীর কামুক বা মাতাল নহে। রমেন্দ্রকে লেখক পশু করিয়া আঁকেন নাই। সে সৌখিন। সে ভাবুক। সে রূপ-পিয়াসু। তার বসিবার ঘরের সঙ্গে এসকলের সঙ্গতি কৈ? ফলতঃ এই তিন-খানি তথা-কথিত কথা-নাট্যেই এই চুট্‌কি ও চটক্‌দার কথা বলিবার ও সাজাইবার প্রয়াসই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ফুটিয়াছে। এই "মরণের জয়ে" এরূপ কতকগুলি কথা ছাড়া আর কিছু ফোটে নাই। আঙুর একটু ফুটিয়াছে রমেন্দ্রের স্ত্রী একটুও ফোটে নাই, আর্টের হিসাবেও ফোটে নাই, আদর্শের হিসাবেও ফোটে নাই। রমেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যুতেও কোনও কিছুই ফোটে নাই।

লোভ জন্মিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। "আঁধার ঘরে" কাদম্বিনীর চরিত্রটি প্রথমে একটু মিষ্ট লাগে, সত্য; কিন্তু ক্রমে তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিও একটা গভীর বিতৃষ্ণার উদয় হয়। "হাসির দামে"ও এমন কিছুই নাই, যাহাতে কাহারও মনে কোনও পাপ-প্রলোভনের উদ্রেক হইতে পারে। ফলতঃ এসকল প্রলোভনের আশঙ্কা অনেক সর্ব্বজনপ্রশংসিত সাহিত্যে যতটা দেখিতে পাওয়া যায়, এসকল নিকৃষ্ট সাহিত্যে প্রায়ই তত থাকে না। আর এই তথাকথিত কথানাট্যগুলির অপর দোষগুণ যাই থাকুক বা না থাকুক, এগুলিতে পাপের মোহিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য কোনও আগ্রহ বা চেষ্টা পর্য্যন্ত আছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং অন্যদিকে লেখক প্রাণপণ করিয়া পাপের প্রতি একটা অপ্রবৃত্তি ও ঘৃণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা তাঁর নিষ্ফল হইয়াছে। সে চেষ্টা না করিলে, আর যাহাই হউক না কেন, সম্ভবতঃ তাঁর চিত্রগুলি বস্তুতন্ত্র হইতে পারিত। কিন্তু এখানে

আর রমেন্দ্রের শ্বশুর বেচারীকে কেন যে আনিয়া পুড়ান হইল, তাহারও কোনও হদিস পাওয়া যায় না। রমেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যুতে "মরণের জয়" কোথায় হইল, তারও কোনও প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেবল কতকগুলি বক্তৃতা করিবার অবসর পাইবার জন্যই যেন এই স্ত্রীলোকটি আত্মহত্যা করিয়াছে। এখানে দৃশ্যের, ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের পরস্পরের সঙ্গে কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের, কোনও ঘাত-প্রতিঘাতের, এবং যে সকল উপকরণে নাট্য-কলা গড়িয়া উঠে তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই যতই চটকদার কথার বুকনি থাকুক না কেন, এই তথাকথিত কথা-নাট্যে সাহিত্য-সমালোচনার ভূমি প্রস্তুত হয় নাই, ইহা সে সমালোচনার মর্য্যাদা পাইবার কোনওরূপ যোগ্যতা লাভ করে নাই।

তারপর "আঁধার ঘরে"। এখানি এই তথাকথিত কথা-নাট্যগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানি পড়িতে যাইয়া, প্রথমেই একটা চটক্ লাগে। প্রথম-দৃশ্যটির সূচনাতে মনে হয় এখানি বুঝি অতি উচ্চ-গ্রামে যাইয়া পৌছিবে

ধর্ম্ম ও নীতির মান রাখিতে যাইয়াই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি আত্মঘাতী পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে। এই জন্যই এগুলি উভয়ভ্রষ্ট হইয়া সাহিত্যে ছিন্নাভ্রের মতন অসম্বন্ধ ও অসংলগ্ন হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আমার মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়িয়া যে পরিমাণ ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিবার আশঙ্কা আছে, এই তথাকথিত কথা-নাট্য-গুলিতে তার শতাংশের একাংশও নাই। অথচ বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মের ও নীতির আদর্শকে সর্ব্বদাই লোকচক্ষে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর 'বিষবৃক্ষে" সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিত্র, নীতি বা ধর্ম্মের হিসাবে নয়, কিন্তু কেবল চিত্রের হিসাবে, কুন্দনন্দিনীও নহে সূর্য্যমুখীও নহেন, কিন্তু হীরা এবং কমলমণি। আর কমলমণির মধ্যে মাধুর্য্য

সূচনায় একটা শ্রেষ্ঠ রস যেন স্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু সেই দৃশ্যের মাঝা-মাঝিও তাহা উভিয়া যাইতে আরম্ভ করে। "আঁধার ঘরে" যে আদি-রসাশ্রিত নাট্য, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কাদম্বিনী ইহার নায়িকা, শেখর নায়ক ও রাজচন্দ্র প্রতি নায়ক। এই তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই এই নাট্যখানি গড়িবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে যে শ্রেষ্ঠ আর্টের আভাস জাগিয়াছে, তাহা ফোটে নাই, সে আদর্শে বিচার করিলে, ইহার গুণের ভাগ অপেক্ষা দোষের ভাগ অতিমাত্রায় বাড়িয়া পড়ে। কাদম্বিনীর চরিত্রের সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই। মানব চরিত্রের জটিলতার অজুহাতেও এ অসঙ্গতির সমর্থন করা যায় না। কারণ এই জটিলতার মধ্যেও একটা একত্ব, পূর্ব্বাপরের মধ্যে একটা গভীর অঙ্গাঙ্গী বা organic যোগ থাকে। সকল সময় লোকে এই যোগটিকে ধরিতে পারে না। আর যাহা আপাতত অত্যন্ত স্ববিরোধী ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যেও যে একটা একত্ব ও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা ফুটাইয়াই শ্রেষ্ঠ আর্টের কৃতিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। লেখক এক্ষেত্রে কাদম্বিনীর চিত্রাঙ্কনে এইটি একেবারেই করিতে পারেন নাই। এইজন্য কাদম্বিনীর চিত্রটি প্রথমে মিষ্ট লাগিলেও, শেষে সে রস থাকে নাই। আর্টের ওজনেও ইহা অত্যন্ত আকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। কাদম্বিনী প্রথমে যে ভাবে

আছে, মিষ্টত্ব আছে, স্নিগ্ধতা আছে; কিন্তু হীরাতে "প্রখরে মধুরে" মিশিয়াছে। এই জন্যই হীরার অমন উৎকৃষ্ট, অমন মোহিনী রূপও ফুটিয়াছে। হীরার মধ্যে খর স্রোতধারের ন্যায় একটা সর্ব্বগ্রাসী প্রবৃত্তি ফুটিয়াছে। তাহার উপেক্ষার মধ্যে একটা passion, কঠোর সংগ্রামের মধ্যেই একটা abandon দেখি, যাহা অপর কাহারও মধ্যে নাই। আর এই বস্তুটিই ত মানুষের প্রাণকে টানে। এই জন্যই হীরার একটা প্রলোভন জাগাইবার শক্তি আছে। "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র মোহিনা রোহিণী; ভ্রমর তার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই জন্য "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র মধ্যেও অধর্ম্মের বা দুর্নীতির প্রলোভন জাগাইবার একটা আশঙ্কা আছে।

আসিয়া দাঁড়াইল, শেখরের প্রবেশে তাহার সত্যতা রক্ষিত হইল না। শূন্য হৃদয়ের হাহাকারে একটি শক্তিশালিনী রসিকা রমণীর যে অবস্থা হয়, প্রথমে কাদম্বিনীতে তাই দেখি। কাদম্বিনীর ঐ সকল হাল্কা রসের ভিতরে একটা গভীর টান আছে, তাহা বেশ বুঝি। এই বৈচিত্র্যটি, এই ভিতরে জ্বালা বাহিরে ক্রীড়াশীলতা, এই দৌর্ভাগ্য এবং অন্তর্জ্বালাকে হাসিয়া উড়াইবার ভাবটা বড় মিষ্টি। এখানে পিপাসা আছে, কিন্তু আত্মস্থতাও আছে। এ আত্মস্থতা ক্রমে থাকিবে না, ইহাও বুঝি। থাকিবে না যে, তার প্রমাণ এই হাসি-কান্নার ভিতরেই লুকাইয়া আছে। কিন্তু যে ভাবে এটি গেল, তাহা অস্বাভাবিক, তাহাতে চরিত্রের একত্ব, চিত্রের পূর্ব্বাপরের সঙ্গতি নষ্ট হইল। কাদম্বিনী একদিকে শেখরকে দুয়ার খুলিয়া দিবে না বলিতেছে। আবার অন্যদিকে তার কামকে প্রদীপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

—"না খুল্‌ব না, তুমি কেমনতর মানুষ গা? না মিন্‌সে বড় বজ্জাত বাপু। কিন্তু তাই ত...আচ্ছা আমি একলা বুকে হাত দিয়ে শুয়ে থাকি তায় তোর মাথায় টন্‌ক নড়ে কেন?"

আবার—"আমি একলা ঘরে, একলা, খালি বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরে শুয়ে থাকি, তোমার কি এই উচিত?"

এ ত সে কাদম্বিনী নয়, যার চিত্র ও চরিত্র প্রথমে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সে দেখা

এমন কি অমন যে বিশুদ্ধ উপন্যাস "আনন্দমঠ" তার মধ্যেও দুই একটি দৃশ্যতে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিতেও বা পারে। জীবানন্দের ও নবীনানন্দের রস-লীলার ছবি এপক্ষে নিতান্ত নিরাপদ নহে। নীতি-বাদীরা বহু বহু দিন পূর্ব্বে এইজন্য "আনন্দমঠে"র তীব্র সমালোচনাও করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই তথাকথিত কথা-নাট্যগুলিতে অমন কিছু নাই, যাহাতে ভালমন্দ কোনও প্রবৃত্তিকে জাগাইতে পারে। এগুলি গ্রাম্য—vulgar মাত্র। ভক্তি-সাধনে এ সকল গ্রাম্যতা বর্জ্জনীয় বটে; কিন্তু তথা-কথিত ধর্ম্মের বা নীতির খাতিরে নহে, শুদ্ধ আর্টের খাতিরে। এ সকল গ্রাম্যতা বা vulgarity মানুষের কল্পনাকে পঙ্গু করে, তার ভাবাঙ্গ-গঠনের শক্তিকে নষ্ট করে, রসাভাস হইতে রসকে পৃথক্ করিবার

দিল একটি পূর্ণ যৌবনভার-ক্লিষ্ট, উদ্দামপিপাসা-জর্জ্জর, নিঃসঙ্গ, দরিদ্র পুরস্ত্রীর বেশে। আর হঠাৎ শেখর আসিবামাত্র সে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, কাদম্বিনী একেবারে বারাঙ্গনা-সুলভ হাবভাব ধারণ করিল! শেখর নূতন নাগর নহে। কাদম্বিনীর বাল্য-সহচর। স্বামী বিদেশে গেলে দীর্ঘকাল এই শেখর কাদম্বিনীর কাছে যাতায়াত করিয়াছে। কিন্তু তার সতীত্ব-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্ম নষ্ট করে নাই। সেই শেখর আসিবামাত্র আজ কাদম্বিনী অমন করে কেন? ঝড়-বাদল কি আর আগে ওদেশে হয় নাই? তার পরে কথায় কথায় এক হাতে শেখরকে বারণ করিতেছে, আবার কেবলি মুখে বলিতেছে—"অ্যাঃ তুমি বড্ড সোন্দর!" "উঃ তুমি যে বড্ড সোন্দর, বড্ড সোন্দর, ওগো! তুমি যাও, যাও, যাও, আমার মাথা কেমন কর্‌ছে, আমি কি কর্‌ব, আমি কি কর্‌ব, শেখর!" গৃহস্থ বধূ, বিশেষ আমাদের দেশে, হঠাৎ অমন বেলেল্লা, অমন নির্লজ্জ হয়, বা হইতে পারে কি? অন্ততঃ প্রথমে কাদম্বিনীকে যাহা দেখি, তার পক্ষে এটি আদৌ সম্ভব কি? মোট কথা এই মনে হয় যে, এই লেখক কেবল বারবনিতার কথাই জানেন, গৃহস্থের ঘরের কথা জানেন না। তাই "মরণের জয়ে" রমেন্দ্রের স্ত্রীকে আঙুরের প্রতিনায়িকারূপে আঁকিতে যাইয়া, বস্তুতঃ—কার্য্যে নয় কিন্তু কথায় বার্ত্তায় ও হাবভাবে—বারবনিতা সাজাইয়াছেন। "আঁধার ঘরে" গরিব কাদম্বিনীকেও সেই সাজই পরাইয়াছেন। তিনি এখানে পল্লীচিত্র আঁকিবার ছল করিয়াছেন; কিন্তু চটি, চুর্ণী, বটগাছ, বড়ের ঘর, এ সকলের মধ্যেও প্রকৃত

বিচারবুদ্ধিকে ফুটিয়া উঠিবার অবসর দেয় না। আর এইরূপ ভাবাঙ্গ স্ফুরণের বা idealisationএর ব্যাঘাত দেয় বলিয়াই, ভক্তি-পথের পথিকের পক্ষে এসকল গ্রাম্যতা বা vulgarity বিষবৎ বর্জ্জন করা এমন প্রয়োজন। কিন্তু ভক্তির এ আপত্তি ও অভিযোগ ফলতঃ আর্টেরই, তথাকথিত ধর্ম্মের বা নীতির নহে। সেরূপ বিচারে সাহিত্যের আদর্শ মলীন হয় না, আরও উজ্জ্বল হইয়াই উঠে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের বা নীতির দিক্ দিয়া এই তথাকথিত কথা নাট্যগুলি কোনও প্রকারে অনিষ্টকর হইয়াছে বা হইতে পারে, এরূপ কল্পনাও করিতে পারি না। (ললিতকলার দ্বারা লোকের সমাজ-দ্রোহী ইন্দ্রিয়-লালসা উত্তেজিত হইতে পারে, ইহা জানি। এমন সকল চিত্র, ভাস্কর্য্য, কাব্য, নাট্য, সংগীত অনেক আছে, যাহার

পক্ষে সহরের বারবনিতা সমাজের পরিচিত দৃশ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাই ঐ চটির অধিকারিণী, চুনীতীরবাসিণী কাদম্বিনী কেবল কলিকাতার কবিতা-আবৃত্তি-পরায়ণা অভিনেত্রীদের কথা কপচায় নাই, কিন্তু রাজচন্দ্রের টাকা দেখিয়া বলিতেছে—"কি আশ্চর্য্য, অত টাকা, অবাক্ করেছে, এ যেন আলাদীনের পিদ্দীম!" "মরণের জয়ে"ও রমেন্দ্রের স্ত্রীর মুখে বিস্তর কাব্য-কলা ফুটিয়াছে। এখানে "কাদী"ও এই কলাভারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর স্থানে স্থানে এ কলার-বোঝা কোথা হইতে সংগৃহীত, তারও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যায়।

তার পর, "হাসির দাম"। এই তথা-কথিত কথা-নাট্যেরও কোনও উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা স্বরূপ ফোটে নাই। ইহা যে কোন্ রসাশ্রিত, তাহাও বলা কঠিন। আপাততঃ মনে হয়, "চন্দনা" ও "মন্মথই" ইহার মূল চরিত্র। কিন্তু অপরাপর চরিত্রগুলি ইহাদের সঙ্গে কেবল বাহিরের সম্বন্ধ বা ঘটনার দ্বারাই যুক্ত হইয়াছে, কোনও রূপেই ইহাদের প্রকৃতির নিগূঢ় ধর্ম্মটিকে ফুটাইয়া তোলে নাই নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইবার জন্যই,—ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্রের ও প্রকৃতির ভিতরে যেসকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া নাট্যবিশেষকে আপনার বৈশিষ্ট্যলাভে সাহায্য করে, সেই সকল পরিবর্ত্তন কেন হইল, তার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই নাট্যের ঘটনা-বৈচিত্র্যের সমাবেশ হয়। কিন্তু এই কথানাট্যের মধ্যে যেসকল ভিন্ন ভিন্ন চিত্রের ও ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তাহার দ্বারা

দ্বারা অতি ধীর ব্যক্তিরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু সে-সকল অতি সুনিপুণ সৃষ্টি। লৌকিক ধর্ম্মের বা নীতির বিচারে যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, রস-সৃষ্টির দিক্ দিয়া তারা জগতের অমূল্য সম্পত্তি। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিলি জোলার প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলি পড়িয়া মুনিজনেরও ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য জন্মিবার আশঙ্কা আছে। আর জোলার রসমূর্ত্তি-রচনার অলোকসামান্য নিপুণতাই এই অমঙ্গলের নিদান। এই জাতীয় বাস্তবতা অন্য হিসাবে যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, চিত্র-নৈপুণ্যের হিসাবে, ললিত-কলার বিচারে, রস-তত্ত্বের আলোচনায় অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে। জোলা রক্তমাংসই কেবল আঁকিয়াছেন। এই রক্তমাংসের যে কত রূপ, কত রস, কত আনন্দ, কত উন্মাদনা, তাহাই দেখাইয়াছেন। এর ভিতরে যে অতীন্দ্রিয় রস আছে, যার গুণে এই রক্ত-মাংস এমন মিষ্ট, জোলা তাহাকে ফুটাইতে যান নাই। তাহা হইলে তাঁর রস-সৃষ্টি পূর্ণতালাভ করিত। কিন্তু ইহ-সর্ব্বস্ব, নাস্তিক্য-বুদ্ধিপ্রবণ, সমসাময়িক ফরাসী সমাজের মতিগতির সঙ্গে যে অতীন্দ্রিয় রসের সঙ্গতি

ইহার বাহিরের ঠাট্টা মাত্র গড়িয়াছে, গল্পাংশটি মাত্র প্রস্তুত হইয়াছে, ঘটনা-বলির পৌর্ব্বাপর্যামাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও চরিত্রের উন্মেষ হয় নাই। চন্দনা, মন্মথ, বিরজা, অন্ধ-বৃদ্ধ, সকলে প্রথমে যেমনটি ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তেমনিই থাকিয়া গিয়াছে। এই জন্যই ইহাতেও কোনও অঙ্গাঙ্গী, কোনও organic সম্বন্ধের প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর রসের হিসাবে, এখানেও কোনও রসই ফোটে নাই। পড়া শেষ হইলে কেবলমাত্র একটা অস্বস্তিকারজনক ভাবের আমেজ মনে থাকিয়া যায়, কিন্তু কি আদি, কি বীভৎস, কোনও রসই জাগে না। পথে চলিবার সময় হঠাৎ একটা পচা জন্তুর বা পুরীষস্তূপের উপরে পা পড়িলে, শরীরে যে ভাব জন্মে, এই "হাসির দামে"ও মনোমধ্যে ঠিক সেই ভাবই জন্মে। ইহাকে যদি কেহ বীভৎস বলিতে চাহেন, বলুন। কিন্তু আমি ইহাকে বীভৎস রসও বলিতে পারি না। কারণ হাস্যোদ্ভূত-করুণ-রুদ্র প্রভৃতি একটা বিশেষ প্রগাঢ় ও গভীর অবস্থালাভ না করা পর্য্যন্ত রস-পদবাচ্য হয় না।

হইত না। লোকে তাহা ধরিতে ও বুঝিতে পারিত না। যে প্রতিক্রিয়া-মুখে ইউরোপে ক্রমে আধুনিক Impressionist-আদর্শের বা ভাব-বাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছে, ঊনবিংশ খৃষ্ট-শতাব্দীর প্রথমে ও মধ্যভাগে তাহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় সাধনা পাপ বলিয়া এই রক্তমাংসকে একেবারে নিষ্পেষণ, এই সংসার ও মানবীয় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফুরণকে বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছিল। মধ্যযুগের খৃষ্টীয়ান্ ঈশ্বরতত্ত্ব নিতান্ত অতীন্দ্রিয় ও নিরাকার; মধ্যযুগের ধর্ম্ম একান্ত সংসার-বিমুখ ও সন্ন্যাস-প্রধান; মধ্যযুগের নীতি অত্যন্ত অন্তর্মুখীন এবং মানব-প্রকৃতির সহজ-স্ফুর্ত্তির বিরোধী হইয়া, জীবনের সকল বিভাগে সর্ব্ববিধ প্রয়াসের বস্তুতন্ত্রতা নষ্ট করিয়াছিল। বিমানচারিণী কল্পনা মানবজীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। কেবল বাধা ও বন্ধনে মানুষের মর্ম্ম নিপাড়িত ও জীবন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক জড়বাদ, সন্দেহ-বাদ, নাস্তিক্য-বাদ, প্রত্যক্ষ-বাদ, অজ্ঞেয়তা-বাদ,—ধর্ম্মেতে ও তত্ত্বেতে; আধুনিক রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রতা—সমাজ-জীবনে; আধুনিক বাস্তবতা বা realism—সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে, —একটা নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটাইয়া তুলিয়া, ইউরোপের মানব-প্রকৃতিকে ধর্ম্মের নামে প্রচারিত মধ্যযুগের মর্ম্মঘাতী বন্ধনজাল হইতে মুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে। এই বিদ্রোহ, এই প্রতিক্রিয়া, এই দেহসর্ব্বস্বতা, এই ইহলোকতন্ত্রতা মুক্তির প্রয়োজনেই ইউরোপে আপাত-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এ ভাঙ্গা ইউরোপের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। আর জোলা, টলষ্টয়, ইব্‌সেন্, বার্ণাড্ শ' প্রভৃতি আধুনিক যুগের ইউরোপীয় সাহিত্য-সেবীগণ এই কাজটি

বিশেষতঃ নাট্যকলায় কেবল রসের আব-হাওয়া প্রস্তুত করে না, রসের মূর্ত্তি গড়িয়া তোলে। অমূর্ত্ত, নিরাকার রস বা রসাভাসের দ্বারা নাট্য রচিত হয় না। এই কারণে এই "হাসির দাম"ও প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার মর্য্যাদা পাইতে পারে না।

করিয়াছেন ও করিতেছেন। মানুষের রক্তমাংস, কেবল রক্তমাংস-রূপেই, কোনও প্রকারের অতীন্দ্রিয় রসাশ্রিত না হইলেও যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর; এগুলি যে, রক্তমাংসরূপেই, মানবজীবনের সার্থকতা সাধনের একটা অতি শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইহারা যে ঘৃণা বা বর্জ্জনীয় নহে; দেহের স্বাস্থ্য, শক্তি, সৌন্দর্য্যসাধন, শারীর উৎকর্ষের যথা-সাধ্য অনুশীলন ও সম্ভোগ যে মানবের একটা অতি উচ্চ অধিকার; জোলা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথমে ইহাই প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পরে মানবীয় বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সকলের অনুশীলনের কোনও ব্যাঘাত জন্মাইবার যে কোনওই অধিকার সমাজের রীতিনীতি ও লৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্মের নাই; এই অনুশীলনের অবসরলাভ ও প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই সকল লৌকিক রীতি-নীতি ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারকে উপেক্ষা করিয়া চলাতে যে কোনও অধর্ম্ম নাই; এইটি টলষ্টয়, ইব্‌সেন, শ' প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ প্রাণপণে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এই সকল প্রতিবাদ ও দ্রোহীতার ফলেই আজ ইউরোপে একটা শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম-নীতি ও সমাজ-নীতির বিকাশের সূত্রপাত হই-য়াছে। জোলা, টলষ্টয়, ইব্‌সেন্, শ' প্রভৃতির সাহিত্য-কলাকে প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির দোহাই দিয়া চাপিয়া রাখিলে, ইউরোপ আজ সত্যানুসারে যে পরমার্থের ও পূর্ণতার দিকে তিলে তিলে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা সম্ভব হইত না।

গতানুগতিক ধর্ম্ম ও আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য

আমাদের দেশেও যে এ ভাঙ্গার প্রয়োজন নাই, এমন কথা কিছুতেই বলিতে পারি না। ধর্ম্মে, নীতিতে, সাহিত্যে, শিল্প-কলায় আমরাও একটা কৃত্রিমতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলাম, এখনও রহিয়াছি। তত্ত্বে—সত্যকে ছাড়িয়া সত্যাভাসের, নীতিতে—নিজের প্রকৃতিকে ছাড়িয়া পরের পুরাতন অনুশাসনের, সাহিত্যে—প্রত্যক্ষ ও সত্য রসকে উপেক্ষা করিয়া, কল্পিত ভাবের দ্বারা আমরা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া আছি। তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারকে, নীতির

প্রতিষ্ঠার জন্য স্মৃতিকে, সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই কল্পিত, বিমানচারী-ভাব ও আদর্শকে নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু ভাঙ্গিতে যাইয়া আমরা ইউরোপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব না। ইউরোপ দিশা-হারা হইয়া ভাঙ্গিতেছে। আমরা দিক ঠিক রাখিয়া ভাঙ্গিব। ইউরোপের বন্ধনের বেদনা-জ্ঞানই কেবল আছে, মুক্তির প্রকৃতি যে কি সে জ্ঞান এখনও ফোটে নাই। যাহা আছে তাহা ভাল নহে, তাহাতে তার চলে না; ইউরোপ এইটুকুমাত্র বুঝিয়াছে; কিন্তু কিসের দ্বারা যে তার চলিবে, ভাল যে কি, তাহা এখনও জানে না। আমরা ত এ অজুহাত দিতে পারি না। ইউরোপ তার আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতা ও সাধনার ভিত্তির উপরে, সে সভ্যতা ও সাধনার উপকরণ দিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ গুলি তার বর্ত্তমান সভ্যতার মূল উপাদান; হিব্রু, গথিক প্রভৃতি সাধনার কিছু কিছু ঐ মূল উপাদানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে মাত্র। আর কি গ্রীসে, কি রোমে, কি ইহুদায়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা ভাল করিয়া ফোটে নাই। এজন্য ইউরোপ এখনও অনিত্যেতে ও নিত্যেতে, অপ্রাকৃতে ও প্রাকৃতে, অতীন্দ্রিয়ে ও ইন্দ্রিয়েতে, স্বরূপে ও রূপে, পরমার্থে ও সংসারেতে, যে একটা অপরিহার্য্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহা ভাল করিয়া ধরিতে পারে নাই। এটি কিন্তু আমাদের প্রাচীন সাধনাতে বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তবে মধ্যযুগের মায়াবাদ তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে উভয়দিকেই এই সনাতন সত্যকে আমাদের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমানে আমরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে আবার তাহারই সন্ধানে চলিয়াছি। এ অবস্থায় জীবনের কোনও ক্ষেত্রে কেবল পুরাতনের বা প্রচলিতের দোহাই দিয়া সহজ মানব-প্রবৃত্তির ও প্রকৃতির সম্প্রসারণের ও বিকাশের পথ আটকাইতে চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? আর এই অনিষ্টপাত নিবারণ করিতে গেলে, সকলের আগে জীবনের প্রত্যেক বিভাগকে তার

নিজস্ব স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এ সময়ে শাস্ত্রের নামে বাহিরের প্রত্যক্ষ ও স্বানুভূতির প্রামাণ্যকে, পুরাতন স্মৃতির নামে সামাজিক জীবনের আধুনিক প্রয়োজনকে, ধর্ম্ম ও নীতির নামে রস-সৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টার মতন আর কিছু এমন আত্মঘাতী হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। আর এইজন্যই একদিকে যেমন এই তথাকথিত কথানাট্যগুলিকে অত্যন্ত হীন, হেয়, ভদ্রসমাজে অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি; অন্যদিকে সেইরূপ, যে কৃত্রিম, কল্পিত, গতানুগতিক ধর্ম্মের, নীতির ও শীলতার দোহাই দিয়া এগুলির অমন নিন্দাবাদ হইতেছে, তাহারও তীব্র প্রতিবাদ হওয়া তদপেক্ষা শতগুণে বেশী প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ

কন্দর্পনারায়ণ রায়।

"Is there such a thing as an impartial history? And what is History? The written representation of past events. But what is an event? Is it a fact of any sort? No! it is a notable fact."

বারভূঁইয়ার ইতিহাস মুসলমান রাজত্বকালীন হিন্দুর তেজোবীর্য্যের অপূর্ব্ব পুণ্য-কথা। 'বারভূঁইয়া' কথাটা মোগল রাজত্বকালে সমধিক প্রচলিত হইলেও উহা নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'দ্বাদশমণ্ডল' বা বারভূঁইয়ার নাম ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। মনুসংহিতা শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থেও দ্বাদশমণ্ডলের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্রাট বা বিজয়ী নৃপতির অধীনে বরাবরই দ্বাদশ জন সামন্ত নৃপতি দ্বাদশ মণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশের দ্বাদশমণ্ডলের কতটা প্রতাপ ছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতেই অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকালে বারভূঁইয়াগণ প্রতাপশালী ছিলেন। তাহাদিগকে একরূপ স্বাধীন নরপতি বলা যাইতে পারে, কারণ উহাদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত কেহই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, এবং সকলেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ অতুল বিক্রমে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পর্তুগীজ পর্য্যটক ফিলিপ ডি ব্রিটো ডি নিকোটি (Philip de Brito de Nicote) বারভূঁইয়ার বীরত্বসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "of the whole of Bengal, of the Boioes, (or twelve lords) each of them a sovereign in his own territory and all of them united against the Mogor king and against the Mogo

(Magh) and of his other enemies. These twelve Boioes of Bengal ruled over all the low lands watered by the Ganges (*eram seahores de todas terras de baixo queregao orio Ganges*") পর্ত্তুগীজ পর্য্যটকগণ এবং যেসব জেসুইট পাদ্রী ঐ সময়ে বাঙ্গলাদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বারভূঁইয়াগণের অপূর্ব্ব বীর্য্যবত্তার কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই বারভূঁইয়াদের মধ্যে প্রায় সকলেই তেজবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে বিক্রমপুরের কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ ও খিজিরপুরের ঈশাখাঁর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ। কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য এই দুই মহাপুরুষের পুণ্য-জীবন-কথা লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি রচিত হওয়ায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরেই ইঁহাদের নাম সুপরিচিত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ইতিহাস এবং তৎসহ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

চন্দ্রদ্বীপ নামোৎপত্তির কারণ।

উপাখ্যানবহুল বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক ব্যাপারের সহিতই কোন না কোন উপাখ্যানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদি ইতি-কথার সঙ্গেও বহুবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত। সে সমুদয় বংশপরম্পরানুগত কিংবদন্তীর মধ্যে কতটুকু সত্য বা মিথ্যা নিহিত আছে তাহা সামান্য অনুসন্ধিৎসার সহিত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রতি শ্রীচন্দ্রদেবের একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এতদিন পর্য্যন্ত যে সকল কিংবদন্তী বা কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়াই যে সকল পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ সম্বন্ধে গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে।

এতকাল চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে যে সমস্ত কিংবদন্তী

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ

কন্দর্পনারায়ণ রায়।

"Is there such a thing as an impartial history? And what is History? The written representation of past events. But what is an event? Is it a fact of any sort? No! it is a notable fact."

বারভূঁইয়ার ইতিহাস মুসলমান রাজত্বকালীন হিন্দুর তেজোবার্য্যের অপূর্ব্ব পুণ্য-কথা। 'বারভূঁইয়া' কথাটা মোগল রাজত্বকালে সমধিক প্রচলিত হইলেও উহা নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই 'দ্বাদশমণ্ডল' বা বারভূঁইয়ার নাম ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত। মনুসংহিতা শুক্রনীতি ইত্যাদি গ্রন্থেও দ্বাদশমণ্ডলের উল্লেখ রহিয়াছে। সম্রাট বা বিজয়ী নৃপতির অধীনে বরাবরই দ্বাদশ জন সামন্ত নৃপতি দ্বাদশ-মণ্ডল নামে অভিহিত হইতেন।

অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশের দ্বাদশমণ্ডলের কতটা প্রতাপ ছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। বাঙ্গলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীতেই অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকালে বারভূঁইয়াগণ প্রতাপশালী ছিলেন। তাহাদিগকে একরূপ স্বাধীন নরপতি বলা যাইতে পারে, কারণ উঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত কেহই মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, বরং সকলেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থ অতুল বিক্রমে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক ফিলিপ ডি ব্রিটো ডি নিকোটি (Philip de Brito de Nicote) বারভূঁইয়ার বীরত্বসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "of the whole of Bengal, of the Boioes, (or twelve lords) each of them a sovereign in his own territory and all of them united against the Mogor king and against the Mogo